বিস্মৃত দর্পণ

বিস্মৃত দর্পণ

নিধুবাবু / বাবু বাংলা / 'গীতরত্ন'

রমাকান্ত চক্রবর্তী

সম্পাদিত
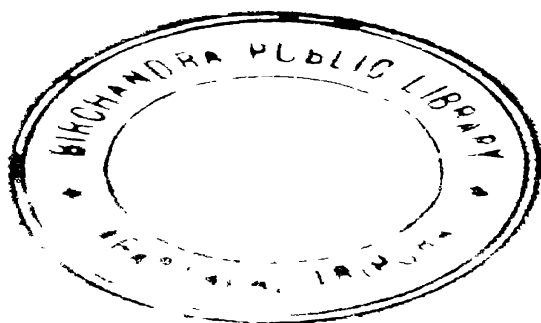
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬

নিধুবাবুর "গীতরত্ন"

অষ্টাদশ শতকের প্রায় প্রথম থেকে শুরু ক'রে উনবিংশ শতকের শেষ অবধি বাঙলাদেশে উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের নতুন করে ব্যাপক চর্চার যে ইতিহাস আমরা পাই তাতে দেখি, পশ্চিম ভারতের বহু বড় বড় ওস্তাদ বাংলাদেশে ঐ-সময়ে এসেছেন ধনী ও জমিদারদের নিমন্ত্রণে। বাঙালীরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের কাছে গান শিখেছেন। অনেকে বাংলাদেশের বাইরেও গেছেন, একই কারণে। তখনকার দিনে হিন্দী সঙ্গীতের চর্চার মূল কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল বাংলার কয়েকটি বিখ্যাত সহরে। তার একটি হোলো বাঁকুড়া জেলার মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুর; দ্বিতীয়টি, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর রাজ দরবার, তৃতীয়টি বর্দ্ধমানের রাজবাটি এবং চতুর্থটি গড়ে উঠেছিল কলকাতার কয়েকজন ধনীদের বাড়ীর বৈঠকখানাকে কেন্দ্র করে। সঙ্গীতের এই কটি কেন্দ্রের সাহায্যে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে অনেক নামকরা গায়কের উদ্ভব হয়। কলকাতা ছিল এই সঙ্গীত আন্দোলনের বড় কেন্দ্র। কিন্তু, হিন্দী ওস্তাদী গান শিখে, তার নিয়মকানুন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেও বাঙালী গায়কেরা খুসী থাকতে পারেননি। নিজের মুখের ভাষায় ওস্তাদী সঙ্গীতকে সাজিয়ে নিয়ে, তাকে সম্পূর্ণ আপনার করে নেবার প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল অষ্টাদশ শতক থেকে তাদের মধ্যে। এ-কাজে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়েছিল বাঙলাদেশের সঙ্গীতের একটি নতুন রূপ। সঙ্গীতে এই নব যুগের প্রবর্তক হলেন রামনিধি গুপ্ত, যাঁকে বাঙলাদেশ চিনতো নিধুবাবু নামে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধে বহু বৎসর ব্যাপী একান্ত সাধনায়, সে-যুগের ওস্তাদের কাছে নানা প্রকার হিন্দী গানের চর্চা ক'রে নিধুবাবু শতাব্দীর শেষ দিকে এবং উনবিংশতকের প্রারম্ভে হিন্দী টপ্পা গানের সাহায্যে বাঙলা ভাষায় নতুন ঢং-এ আখড়াই গানের প্রবর্তন করলেন। সে গান শুনে সে-যুগের বাঙালী-রসিক সমাজ খুবই মুগ্ধ হ'লো। পরে দেখা গেল, উনবিংশ শতকের হাফ্-আখড়াই, শাক্তসঙ্গীত, যাত্রাগান, পাঁচালি গানেও তার প্রভাব। রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও রচনা করেছিলেন ব্রহ্মোপাসনার উপযোগী সঙ্গীত, তখনকার দিনের ঐ-রূপ টপ্পার ঢং-এ। পরবর্ত্তী যুগে থিয়েটারেও টপ্পা অঙ্গের গান প্রচুর গাওয়া হ'তো।

বাঙলা টপ্পাতে হিন্দী রাগরাগিণীর ব্যাপক ব্যবহারের প্রতি নিধুবাবুর বিশেষ ঝোঁক ছিল বলে সে-যুগের প্রচলিত কোন প্রকার দেশী সুরের গান তাঁকে রচনা করতে দেখা যায় না। তিনি সে-যুগে প্রচলিত হিন্দী গানের শুদ্ধ ও মিশ্র রাগিণী যেমন ব্যবহার করতেন, তেমনি নিজে সৃষ্টিও করেছিলেন বেশ কিছু মিশ্র রাগরাগিণী। নিধুবাবুর দ্বারা প্রবর্ত্তিত মিশ্রণের এই ধারাটিই পরবর্ত্তী বাঙালী রচয়িতাদের মিশ্র রাগিণীর বাঙলা গান রচনায় খুবই উৎসাহিত করেছিল।

নিধুবাবু রচিত বাঙলা টপ্পা গান ঊনবিংশ শতকের বাঙালী শিক্ষিত সমাজের মনকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করার একটি বড় কারণ হ'ল, গানের বিষয়-বস্তু। তিনি রচনা করে গেছেন প্রেমের গান। কিন্তু, যে-প্রেমের রূপ তিনি তাঁর গানে এঁকেছিলেন, তাতে ছিল সে-যুগের নগর সমাজের প্রণয়-ঘটিত জীবনের প্রকৃত চিত্র। পূর্ব যুগের কবিদের মত প্রেমের চিত্র তিনি রাধা ও কৃষ্ণের মাধ্যমে আঁকতে চাইলেন না। এ-পথে নিধুবাবু খুবই সাহসের সঙ্গে পা বাড়িয়েছিলেন, এবং বহু যুগের প্রচলিত একটি প্রথার পরিবর্ত্তনে সমর্থও হয়েছিলেন। এদিকে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

বাঙলা গানের বাণী ও রাগিণীর মিলনের ধারাটিকে বিশ্লেষণ ক'রে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমাদের দেশে সঙ্গীতের দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে, বিশুদ্ধ সঙ্গীত আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতি ভেদ অনুসারে সঙ্গীতের এই দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় বাঙলার বাইরে আর বাঙলা দেশে। কোন সন্দেহ নেই যে, বাঙলাদেশে সঙ্গীত কবিতার অনুচর না হোক সহচর বটে। বাঙলাদেশে সঙ্গীতের স্বতন্ত্র পঙক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন। এই জন্যে গানের বাণীকে সুরের খাতিরে কিছু আপোষ করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হতে হয়।

সঙ্গীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজ করে, সেখানে তার নিয়ম-সংযমের শুচিতা প্রকাশ পায়। বাণীর সহযোগে গান রূপে তার শুচিতা তেমন ক'রে বাঁচিয়ে চলা যাবে না বটে, কিন্তু পরম্পরাগত সঙ্গীতের রীতিটিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয় সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে।

গুরুদেব তাঁর এই ক'টি কথার ভিতর দিয়ে নিধুবাবু এবং ঊনবিংশ শতকের

বাঙলা গান ও তার রচয়িতাদের প্রকৃতিটিকেই প্রকাশ করে গেছেন। এ-কথা সত্য যে, উনবিংশ শতকে বাঙলা ভাষার গান রচনা ক'রে যাঁরাই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁরা সকলেই সে-যুগের কোন না কোন খ্যাতনামা ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গের হিন্দী গানের চর্চা করেছিলেন, কিম্বা রচনার সময় তাঁদের সাহায্য নিতেন। তাঁদের ওস্তাদী গানের রাগরাগিণী এবং তাল ও লয়ের উপর সম্পূর্ণ দখল ছিল বলেই বাঙলা গানে রাগিণীর সঙ্গে বাণীকে সহজে সুন্দর ভাবে মিশিয়ে নিতে পেরেছিলেন, বা রাগিণীর মিশ্রণ তাঁদের কাছে এত সহজ হয়েছিল।

নিধুবাবুর টপ্পার ভাষা ছিল বাঙলা। তাই, হিন্দী গানের রাগরাগিণীর নিয়ম ও তার গায়কীটিকে বিশুদ্ধভাবে আয়ত্ত করেও নিজের গানে তাকে তিনি প্রাধান্য দেননি। বাণী ও রাগিণীর সমন্বয় করতে পেরেছিলেন বলেই মূল টপ্পার গীত-পদ্ধতিকে হুবহু তাঁর গানে তিনি ব্যবহার করলেন না। তাই, তাঁর হাতে পড়ে বাঙলা টপ্পায় গীত-পদ্ধতিতে বেশ একটু স্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়েছিল। সে-যুগের প্রচলিত হিন্দী গানের নিয়মকে তিনি সহজেই লঙ্ঘন করেছিলেন, বাণীর সাথে রাগিণীর মিলনের কথা চিন্তা করে। তাহলেও নিধুবাবুর বাঙলা টপ্পা গাইতে হলে বহুদিনের একান্ত পরিশ্রমের বা সাধনার প্রয়োজন হ'তো। রাগ-রাগিণীর যথার্থ রূপ এবং তাল ও লয়ের নিখুঁত বোধ মনে গেঁথে না নেওয়া পর্যন্ত এ গান সকলের পক্ষে গাওয়া সম্ভব হ'তো না। এই কারণে পরবর্তী হাফ আখড়াই গানে, নিধুবাবু প্রবর্তিত টপ্পাকে অপেক্ষাকৃত সহজ করে নিতে হয়েছিল। ক্রমশ নিধুবাবু প্রবর্তিত এই টপ্পা আরো সহজ হয়ে গোপাল উড়ে প্রভৃতির যাত্রাগানে, দাশরথী রায়ের মত পাঁচলীর গানে, কবিগানে এবং উনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধে প্রচলিত থিয়েটারের গানে ব্যাপক ভাবে স্থান গ্রহণ করে। পরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ খ্যাতনামা বাঙালী সঙ্গীত রচয়িতাদের গানে-ও দেখা গেল এই সহজ ধারার টপ্পার প্রভাব। বাঙলার সংগীতের ইতিহাসে নিধুবাবু এই কারণে চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। কিন্তু, তাঁর গানের প্রকৃত মূল্যায়ণ এ পর্যন্ত এখনো তেমন হয়নি। লিরিক কাব্য হিসাবে সাহিত্যিকেরা মাঝে মাঝে আলোচনা করেছেন এ-গান নিয়ে। অনেকেই বলেছেন, গানগুলির কাব্য-মূল্য তেমন কিছু নয়, বা গানগুলি শিক্ষিত সমাজের অনুপযোগী। কিন্তু, উনবিংশ শতকের বাঙালী নগর সমাজের নরনারীর জীবন চর্চা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান যাঁদের আছে, তাঁরা

সহজেই অনুভব করবেন যে, সেই পরিবেশে এইরূপ গানই ছিল একমাত্র সম্ভব। এ-গানে গত শতাব্দীর মানব সমাজের প্রণয় লীলার একটি দিক নিধুবাবুই প্রথম তাঁর গানে অতি দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত ক'রে যেতে পেরেছিলেন। গানগুলি যুগমনের প্রতিচ্ছবি।

নিধুবাবুর গানগুলি গত শতাব্দীতে বাঙালী সঙ্গীত-রসিক সমাজের সুবিধার্থে একত্র সংগ্রহ করে "গীতরত্ন" নামক গ্রন্থে প্রথম প্রকাশ করা হয় ১২৪৪ সালে। নিধুবাবু নিজেই ছিলেন তার প্রকাশক। তাঁর মৃত্যুর পর "গীতরত্নে"র আরো দুটি সংস্করণ হয়। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৭৫ সালে, চিৎপুরের বটতলা থেকে, তাঁর পুত্রের দ্বারা। এইভাবে সে-যুগে ৩০ বছরের মধ্যে "গীতরত্ন" গ্রন্থের এই তিনটি সংস্করণ নিধুবাবুর গানের জনপ্রিয়তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য।

"গীতরত্ন"গ্রন্থটির কথা আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। নিধুবাবুর সঠিক জীবনী এবং তাঁর গানের সম্পূর্ণ তালিকার এ-টিই হ'লো একমাত্র নির্ভর যোগ্য বই। এইরূপ একটি দুষ্প্রাপ্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থের সম্পাদনা করে শ্রীযুক্ত রমাকান্ত চক্রবর্তী বাঙালী সঙ্গীত রসিকদের খুবই উপকার করেছেন। গ্রন্থটির অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

শান্তিদেব ঘোষ

প্রাক্-কথন

রামনিধি গুপ্ত রচিত গীতসমূহ 'গীতরত্ব'-এর তিনটি সংস্করণ (১২৪৪, ১২৬৩, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ) থেকে সঙ্কলিত হয়েছে। সংস্করণগুলিতে পাঠের বিশেষ বিভিন্নতা নেই। নিধুবাবুর নামে প্রচলিত গানগুলি যে-সব গীত-সঙ্কলন থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, তাদের নাম পরিশিষ্টে উল্লিখিত হয়েছে। পূর্বে 'গীতরত্ব'-এর কোন সংস্করণেই গীতসংখ্যা নির্দিষ্ট হয়নি। গানের চরণগুলি গদ্যের ভঙ্গিতে মুদ্রিত হয়েছে। এই সংস্করণে গানের চরণ-বিন্যাস রীতি-সম্মত করা হয়েছে। প্রতিটি গানের সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়েছে। শেষে একটি গীত-সূচি সংযোজিত হলো। 'অবতারণা'য় টপ্পা-গানের কলা-কৌশল সম্পর্কে সম্পাদক পণ্ডিতগণের মতামত উদ্ধৃত করেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গীত-বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্পাদকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সামান্যই। নিধুবাবুর জীবনী ও টপ্পা সমসাময়িক সমাজ ও সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হওয়ার ফলে 'অবতারণা' বিলম্বিত হয়েছে। মুদ্রণ-প্রমাদ এড়ানো যায়নি। এখানেই বলে নেওয়া উচিত, ২৪৮ সংখ্যক গীতের সংখ্যা ('গীতরত্ব', পৃষ্ঠা ৬৫) হবে ২৪৭, তার পর থেকে সংখ্যাগুলিকে ১ বাদ দিয়ে ধরতে হবে। 'অবতারণা'য় কাশীপ্রসাদ ঘোষের *The Shair and other Poems*'-এর মুদ্রণের তারিখ ভ্রম-ক্রমে ১৮২০ ছাপা হয়েছে। ('অবতারণা', পৃষ্ঠা, ৮০)। শুদ্ধ পাঠ হবে ১৮৩০। 'অবতারণায়' ৫৩ পৃষ্ঠায় 'নানা-নিবন্ধ' থেকে সুশীলকুমার দে'র লেখার শেষ উদ্ধৃতির মধ্যে 'বেশি' কথাটি বাদ দিয়ে পড়তে হবে।

প্রখ্যাত সঙ্গীত-সাধক শ্রীযুক্তশান্তিদেব ঘোষ মহাশয় এই বইয়ের জন্য একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর কাছে সম্পাদকের ঋণ অপরিশোধ্য। অধ্যাপক স্বপন মজুমদার, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর অলোক রায়, অধ্যাপক কমলাপ্রসাদ ঘোষ এবং অধ্যাপক রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদককে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। শ্রীমতী ছবি চক্রবর্তী সম্পাদককে লেখার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য এ-বই প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে যে-সাহস দেখিয়েছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়। ছাপার ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য 'সনেট প্রিন্টিং-ওয়ার্কস'-এর সত্ত্বাধিকারী ও কর্মিগণের প্রতি সম্পাদক কৃতজ্ঞ।

সম্পাদক

সূচীপত্র

অবতারণা

অবতারণা

। অবতারণা ।

॥ নিধুবাবুর জীবনী, বঙ্গাব্দ ১১৪৮–১২৪৫ বঙ্গাব্দ ॥

১.

রামনিধি গুপ্তের, অথবা বিখ্যাত টপ্পা-রচয়িতা নিধুবাবুর জীবদ্দশায় ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে যে যুগান্তরের সূচনা হয়, তার পটভূমি ছিল কলকাতা। তাঁর জীবনচরিত আলোচনা করতে গেলে সেই সন্ধিকালীন কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়।

নিধুবাবুর পিতা হরিনারায়ণ গুপ্ত, ও পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণ গুপ্ত ছিলেন কবিরাজ। কলকাতায় কুমারটুলি অঞ্চলে তাঁরা চিকিৎসা-বৃত্তি অবলম্বন করেন। ১৭৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গামার সময় তাঁরা কলকাতা থেকে ত্রিবেণীর কাছে চাপ্‌তা গ্রামে চলে যান। সেখানে তাঁদের মাতুল রামজয় কবিরাজের বাড়ীতে ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে, ১১৪৮ বঙ্গাব্দে রামনিধির জন্ম হয়।

নিধুবাবুর শিক্ষা সম্পন্ন হয় কলকাতাতেই। একাধিক জীবনীকারের মতে তিনি এক পাদ্রি সাহেবের কাছে ইংরেজি শিখেছিলেন। বাংলা ও ফার্সিতে-ও তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।[১] বৈষ্ণব চরণ বসাকের মতে তিনি গান নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ভালো করে লেখাপড়া করেননি। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "…বিদ্যাদেবী প্রকীর্ণ প্রভায় উদিতা হইলে তাঁহার [নিধুবাবুর] আদর সমভাবে থাকা কঠিন হইয়া উঠিবেক।"[২] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, জয়গোপাল গুপ্ত, বরদাপ্রসাদ দে, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ও সুশীলকুমার দে নিধুবাবুর কবিত্ব শক্তির ও ভাষাজ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। সুশীলকুমার দে তাঁর "অধ্যয়নশীলতা"র পরিচয় পেয়েছেন।[৩]

নিধুবাবুর জীবনের ঘটনাবলি ও তার সময় নিয়ে নানা মুনির নানা মত। দীনেশচন্দ্র সেন যে কালপঞ্জি দিয়েছেন, তা অন্যান্য জীবনীকার প্রদত্ত সময়পঞ্জি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।[৪] দীনেশচন্দ্র সেনের কালপঞ্জি এইরূপ, যথা,

নিধুবাবুর জন্ম: ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ; প্রথম বিবাহ: ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ; প্রথম পুত্রের জন্ম: ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ; প্রথম পুত্রের ও প্রথমা পত্নীর মৃত্যু: ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ;

---

১. 'বঙ্গভাষার লেখক', ১, ৩২০, 'নারায়ণ', জ্যৈষ্ঠ (১৩২৩), ৭৬৯, *J.B.A.L.* I. (1894) No. 6. p. 4; 'কবিজীবনী', ৩৯৯

২. 'গীতাবলী' (১৩০৩), ১৮, 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ', ৩৪

৩. 'কবিজীবনী', ১০১; 'গীতরত্ন' (১২৭৫), ।০, ৸০, 'প্রীতিগীতি', ২।৶০, 'নানানিবন্ধ' ১১৫

৪. D. C. Sen, *History of Bengali Language and Literature*, 715.

দ্বিতীয় বিবাহ : ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ ; দ্বিতীয় পত্নীর মৃত্যু : ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ ; ছাপরায় গমন : ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ ; তৃতীয়বার বিবাহ : ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ ; ৮৭ বৎসর বয়সে নিধুবাবুর মৃত্যু : ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

অন্যান্য জীবনীতে প্রথম বিবাহ, পুত্রের জন্ম ও মৃত্যু এবং প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে বিশেষ মতান্তর নেই। কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহের সময় সম্পর্কে মতান্তর দেখা যায়। বিভিন্ন জীবনীলেখক প্রদত্ত কালপঞ্জি ছক কেটে সাজিয়ে দেওয়া হল।

১	২	৩	৪	৫	৬
প্রথম বিবাহ। ১১৬৮ সাল ১. ১১৭০ সাল ২.	প্রথম পুত্রের জন্ম। ১১৭৫ সাল ৩.	প্রথম পুত্রের মৃত্যু। ১১৭৮ সাল ৪.	প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু। ১১৭৮ সাল ৫. তারিখ অজ্ঞাত ৬	দ্বিতীয় বিবাহ। ১১৭৮ সাল ৭. ১১৯৭ সাল ৮. ১১৯৮ সাল ৯,	দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু। ১১৮১ সাল ১০ তারিখ অজ্ঞাত ১১.
৭	৮	৯	১০	১১	
ছাপরায় গমন। ১১৮৩ সাল ১২ তারিখ অজ্ঞাত ১৩.	তৃতীয় বিবাহ। ১২০১ ১২০২ সাল ১৪.	কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ১২০১-১২০২ সাল ১৫.	সংশোধিত আখড়াই দল গঠন। ১২১১ সাল ১৬ ১২১২-১৩ সাল ১৭.	মৃত্যুকাল। ১২৩৪ সাল ১৮. ১২৩৫ সাল ১৯ ১২৪৫ সাল ২০	

১. 'কবিজীবনী', ১০১ ; 'গীতরত্ন', ।৵০ , *J.B A.L.* , I. 1894 No. 6. P. 4. , S. K. De, '*Bengali Literature*', 355 , 'বঙ্গভাষার লেখক', ১, ৩২০ ; 'বাঙ্গালীর গান', ৬৬

২. 'নারায়ণ , (জ্যৈষ্ঠ) (১৩২৩), ৭৩৯

৩. ১-এর অনুরূপ   ৪. 'বাঙ্গালীর গান', ৬৬   ৫. তদেব, ৬৬

৬. 'বাঙ্গালীর গান' বাদে ১-এর অনুরূপ

৭. 'বঙ্গভাষার লেখক' ১, ৩২০ , 'বাঙ্গালীর গান', ৬৬ , 'গীতাবলী', ১৮ , S. K. De, *op. cit.* 355 ; 'কবিজীবনী', ৩৯৫ ।

৮. 'কবিজীবনী', ১০৪ ; 'নানানিবন্ধ', ১১৩, পাদটীকা

৯ 'গীতরত্ন', ।৵০   ১০. 'বাঙ্গালীর গান', ৬৬

১১. 'বাঙ্গালীর গান' বাদে ১-এর অনুরূপ

১২. *J.B.A.L.* I. No. 6, p. 4.

১৩. *J.B.A.L.* ছাড়া ১ এর অনুরূপ

১৪. ১-এর অনুরূপ   ১৫. ১-এর অনুরূপ

১৬. 'কবিজীবনী', ১০৭-১০৮   ১৭. 'গীতরত্ন', ॥/০

১৮. 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', ১৭২

১৯. 'বঙ্গভাষার লেখক' ১, ৩২০ ; হরিহর শেঠ, 'কলিকাতা পরিচয়' (১৩৪১), ১১২

২০. ১ এর অনুরূপ। সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৪০), ১০৪৮।

১১৯৭-৯৮ বঙ্গাব্দে নিধুবাবুর দ্বিতীয় বিবাহের কালনির্ণয় সম্পর্কে আপত্তি বিলক্ষণ। তখন তাঁর বয়স ৪৯ কিম্বা ৫০ বৎসর। সেই বয়সে সুদূর ছাপরা থেকে পায়ে হেঁটে বা গোরুর গাড়িতে কলকাতায় এসে, জোড়াসাঁকোতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তিনি ছাপরায় ফিরে গেলেন। তারপর তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু হয়; তিনি ছাপরার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আবার বিবাহ করলেন কলকাতায় ফিরে এসে, ৫৩ কিম্বা ৫৪ বৎসর বয়সে, ১২০১ অথবা ১২০২ বঙ্গাব্দে। এই ঘটনাপরম্পরা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য ঠেকে না। সুশীলকুমার দে 'নানা নিবন্ধ' গ্রন্থের ১১৩ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় এ-সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেও ঐ তারিখ মেনে নিয়েছেন। কিন্তু *Bengali Literature in the Nineteenth Century*-তে ৩৫৫ পৃষ্ঠায় তিনি দ্বিতীয় বিবাহের সময়রূপে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দই নির্দিষ্ট করেছেন। এই তারিখ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু ১১৯৭-৯৮ বঙ্গাব্দ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার মতো প্রমাণ নেই।

বরদাপ্রসাদ দে'র মতে ৩৫ বৎসর বয়সে, অর্থাৎ ১১৮৩ বঙ্গাব্দে নিধুবাবু ছাপরায় গিয়েছিলেন। দুর্গাদাস লাহিড়ীর মতে ১১৮১ বঙ্গাব্দে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু হয়। বৈষ্ণব চরণ বসাক লিখেছেন: দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুর পর "রামনিধি অনেকদিন পুনশ্চ দারপরিগ্রহ করেন নাই, কেবল ইয়ারকি ও সঙ্গীত লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন"।[১] এই মন্তব্যে স্পষ্টভাবে বলা না হলেও বোঝা যায় যে, দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুর পরেই তিনি ছাপরায় যাননি। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ও দুর্গাদাস লাহিড়ী, এইসব ঘটনা ঘটবার সময় নিধুবাবু কোথায় ছিলেন, তা লেখেননি। 'কবিজীবনী' ও 'গীতরত্ন'তে পাঁচসালা বন্দোবস্তের সময় নিধুবাবুর ছাপরায় যাওয়ার সংবাদ আছে।[২] অতএব, বরদাপ্রসাদ দে'র মত যথেষ্ট প্রামাণ্য।

নিধুবাবুর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে এ-ভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায়: ১১৭৮ বঙ্গাব্দে প্রথম পুত্রের ও প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিধুবাবু জোড়াসাঁকোতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন। দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যু হয় ১১৮১ বঙ্গাব্দে। ১১৮৩ বঙ্গাব্দে চাপ্তা নিবাসী দেওয়ান রামতনু পালিতের সঙ্গে নিধুবাবু ছাপরায় গিয়েছিলেন। বরদাপ্রসাদ দে'র মতে তিনি সেখানে

১. **'গীতাবলী'**, ১৮

২. **'কবিজীবনী'**, ১০১; ৩৯৪-৯৫; **'গীতরত্ন'**, ৵০

১৮ বৎসর কাজ করেছিলেন। ১২০১ কিম্বা ১২০২ বঙ্গাব্দে তিনি তৃতীয় বিবাহ করেছিলেন। ১২১১ কিম্বা ১২১২-১৩ বঙ্গাব্দে তিনি সংশোধিত আখড়াই দল গঠন করেছিলেন। ১২৪৫ বঙ্গাব্দে ২১শে চৈত্র তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকাল সম্পর্কে এখন কোনো মতান্তর নেই।[১]

একটি সন্তান এবং পর পর দুই পত্নীর মৃত্যুতে শোকাভিভূত রামনিধি কার্যক্ষেত্রে অর্থ ও প্রতিপত্তিলাভ বিষয়ে অনীহার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠা দুই ভগ্নীর বিবাহ তাঁর পিতার জীবদ্দশাতেই সম্পন্ন হয়েছিল।[২] অনুমান করা যায়, কোনোরূপ সাংসারিক দায়িত্ব বোধের অভাবে তিনি দেওয়ান হবার চেষ্টা করেননি। টাকা পয়সার লোভ তাঁর ছিল না। কলকাতা ছেড়ে ছাপরায় যাওয়ার কারণ-ও বোধ হয় মৃত্যু শোক। ইচ্ছা থাকলে তিনি কলকাতায় চাকরি পেতেন।

ভবতোষ দত্তের মতে নিধুবাবু ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ছাপরায় যান এবং কলকাতায় ফিরে আসেন ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে এ-সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।[৩]

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নিধুবাবু "দ্বিতীয় কেরানীর" চাকরি পেয়ে ছাপরায় রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী হলেন। তখন মণ্ট্‌গোমারি ছাপরার 'কালেক্টর্' ছিলেন। রামতনু পালিত ছিলেন তাঁর দেওয়ান, আর জনাই গ্রামের জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় বোধ হয় "প্রথম কেরানী" ছিলেন। ভূদেব চৌধুরীর মতে নিধুবাবু দশসালা বন্দোবস্তের সময় ছাপরায় চাকরি পেয়েছিলেন। কিন্তু ভবতোষ দত্ত সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণ করেছেন যে, তিনি পাঁচসালা বন্দোবস্ত চালু থাকার সময় সেখানে গিয়েছিলেন।[৪]

ইতিমধ্যে পাঁচসালা বন্দোবস্তে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। ছ'টি রাজস্ববিভাগ গঠিত হয়েছিল কলকাতা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, ঢাকা ও পাটনায়। কালেক্টরদের খবরদারির অধিকার বিলুপ্ত হয়েছিল। কলকাতা বাদে প্রত্যেকটি রাজস্ব-বিভাগের জন্য পাঁচজন ব্যক্তি নিয়ে একটি

১. 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,' ১৩২৪, ১০৮-১১০

২. 'কবি জীবনী', ১০১, 'গীতরত্ন',/.

৩. 'কবিজীবনী," ৩৯৫

৪. ভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা', ২, ৪২, 'কবিজীবনী,' ১০১, ৩৯৪-৯৫

কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল। পূর্বে কালেক্টরগণের যে ক্ষমতা ছিল, এই কাউন্সিলগুলি সে-ক্ষমতার অধিকারী হলো। কাউন্সিল্‌-নিযুক্ত দেশী নায়েবদের ওপর জেলার রাজস্ব আদায়ের ভার রইল। এসব পরিবর্তন হলো ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। স্থানীয় রাজস্ব আদায়ের ভার রইল দেওয়ানদের ওপর।[১] দেওয়ান রামতনু পালিত "বায়ুরোগে" আক্রান্ত হয়ে অকর্মণ্য হয়ে পড়েন। ঈশ্বর গুপ্তের মতে তখন নিধুবাবুর দেওয়ান হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় "শঠতা ও ছলনা পূর্বক [নিধুবাবুকে] কহিলেন, আপনি কি ব্রহ্মহত্যা করিতে এখানে আসিয়াছেন? .....দেওয়ানী কর্ম্ম সাহেব আমাকে দিতে চাহেন, কিন্তু তোমার বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষতা দেখিলে এ কর্ম্ম তোমাকেই দিবেন, আমাকে কখনই দিবেন না"[২] নিধুবাবুর 'ব্রহ্মহত্যা'র বাসনা ছিল না। তিনি নিজে চেষ্টা করে জগন্মোহনকে দেওয়ান করেন, এবং "তাঁহার কেরাণি গিরি কর্ম্মে স্বয়ং নিযুক্ত" হন।

নিধুবাবুর ঊর্ধ্বতন কর্মচারী ছিলেন জগন্মোহন। রাজস্ববিভাগীয় কর্মে নিধুবাবুর পূর্ব অভিজ্ঞতার কোনোরূপ নজির নেই। দেওয়ানী-পদ-প্রাপ্তি বিষয়ে জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়ের অগ্রাধিকার থাকবার কথা। ঈশ্বর গুপ্তের এই অভিযোগ সত্য হলে সে-কালের সমাজে ব্রাহ্মণ্য প্রতিপত্তি প্রমাণিত হয়।

ছাপরায় নিধুবাবু এক মুসলমান ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখেছিলেন। তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। একসময় তিনি দেখলেন যে, ওস্তাদ তাঁকে ঘরানার রহস্য জানাচ্ছেন না। তখন তিনি "মিঞা সাহেবকে সেলাম করিয়া কহিলেন, আমি তোমারদিগের জাতীয় যাবনিক গীত আর গান করিব না, আপনিই বঙ্গ ভাষায় হিন্দি গীতের অনুবাদ পূর্ব্বক রাগরাগিনী সংযুক্ত করিয়া গান করিব।"[৩] তিনি মুসলমান গায়কটিকে বিদায় দিয়ে নিজেই বাংলাগান রচনা করতে লাগলেন।

এই ঘটনার পর তিনি ছাপরা জেলার "রতনপুরা" গ্রামের ভিখনরামস্বামীর মন্ত্রশিষ্য হন। গুরুর কাছে তিনি প্রতি সপ্তাহে যেতেন।[৪] ভিখনরাম ছিলেন

---

১. *Sixth Report of the select committee*', 1781, Appendix I, Mill and Wilson, *History of British India,* (1858), IV, 2.

২. 'কবি জীবনী', ১০১; 'গীতরত্ন',৶০

৩. তদেব, ১০২; তদেব, ৶০

৪ নারায়ণ,' (১৩২৩), ৮৯৫.

"দক্ষিণাচারী" সন্ন্যাসী। বিশ্বসার তন্ত্রের চতুর্বিংশ পটলে সাত রকম তান্ত্রিক আচার ও তিনরকম তান্ত্রিক ভাবের বর্ণনা আছে। তিন রকম ভাবের মধ্যে পশুভাব প্রথম ভাব। "বেদ, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণ—এই চারিটি আচার [পশুভাবে] প্রতিষ্ঠিত। বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল,—এই তিনটি আচার বীর ও দিব্যভাবে সংস্থিত"।[১] দক্ষিণাচারে পঞ্চ "ম" কার অসিদ্ধ। এ-সময় পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শাক্ত পূজা প্রচলিত ছিল। কামরূপ-বঙ্গদেশ ও মিথিলায় বহু তন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়। মুসলমানি সুফি-বাদ তখন বিশেষ প্রভাবশালী ছিল। রামনিধির সমসাময়িক তিনজন সুফি মতাবলম্বী সাধক পূর্বভারতে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁরা হলেন ভিখা (উত্তরপ্রদেশের আজমগর জেলার খানপুর অঞ্চলে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়), ভিখার শিষ্য গোবিন্দ সাহেব, ও গোবিন্দ সাহেবের শিষ্য পল্‌টু সাহেব।[২] সুফি-সাধক "ভিখা" নিধুবাবুর গুরু "ভিখনরামস্বামী" হওয়া অসম্ভব নয়।

হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নিধুবাবু কলকাতায় চলে আসেন। "এক কিম্বদন্তী আছে যে, নিধুবাবু হিসাবের পুস্তকে স্বরচিত গান লিখিয়াছিলেন সাহেব তদ্দৃষ্টে বিরক্ত হওয়াতে তিনিও রোষ পরবশ হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন।"[৩]

দুর্গাদাস লাহিড়ী নিধুবাবুর চাকরি ছেড়ে চলে আসার উল্লেখ করেননি। বৈষ্ণব চরণ বসাক এবং হরিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে, নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কোম্পানীর চাকরি করে তিনি পেন্‌সন্‌ নিয়ে কলকাতায় আসেন। বরদাপ্রসাদেরও এই মত।[৪]

নিধুবাবুর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় চলে আসার কারণ 'কবি-জীবনী-'তে বিশদ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। "একদিবস জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপনার আমলাদিগের প্রতি এতদ্রূপ আদেশ করিলেন যে, তোমরা

১. গোপিনাথ কবিরাজ, 'তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগদর্শন' (১৯৬৩), ৩৬; পঞ্চানন শাস্ত্রী (সম্পাদিত) 'আনন্দ লহরী', ৫-৬

২. K. K. Datta, *Survery.* 3, 6

৩. 'কবিজীবনী, ১০৩, পাদটীকা; 'গীতরত্ন', ।০, পাদটীকা।

৪. 'বাঙ্গালীর গান' ৬৫-৬৬; বঙ্গভাষার লেখক' ১, ৩২০; 'গীতাবলী', ১৮; *J.B.A.L.* I. 6. P, 5: "Ram Nidhi returned to Calcutta in or about 1795 with a competency."

চাকরি করিতে আসিয়াছে, অতএব উপার্জ্জনের পথ দৃষ্টি কর, এ সময়ে যে জমীদার তোমার দিগ্যে যাহা দিবে তাহাই লইয়া আপন আপন বাটীতে প্রেরণ কর। ইহাতে যদি তোমার দিগের উপর কোনরূপ আপদ বিপদ উপস্থিত হয়, তবে আমি তাহা হইতে রক্ষা করিব, ভয় কি, নির্ভয়ে উপার্জ্জন কর, ইত্যাদি। এবম্ভূত অপরিমিত অনুমতি শুনিয়া রামনিধিবাবু তৎক্ষণাৎ তৎকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে দেওয়ানজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, বাবুজী আপনি যদি নিতান্তই কর্ম্ম না করেন, তবে আপনার প্রাপ্য ১০,০০০ দশ হাজার মুদ্রা গ্রহণ করত গৃহে গমন করুন, বাবু তাতেই সম্মত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিলেন।"[১] ঈশ্বর গুপ্তের বিবৃত এই তথ্য বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনো যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু দশ হাজার টাকা কীভাবে নিধুবাবুর প্রাপ্য হলো—এ-প্রশ্ন থেকেই যায়। "নিধুবাবু যদি অসৎ উপার্জনকে ঘৃণা করেন, তবে এ টাকা কিসের ?"[২]

ঐ সময় উৎকোচ আদান-প্রদান অস্বাভাবিক ছিল না।[৩] কিন্তু নিধুবাবুর "প্রাপ্য" দশহাজার টাকা, ঘুষের টাকা,—প্রমাণাভাবে এ-কথা বলার অধিকার আমাদের নেই। নিধুবাবুর বেতনের হার আমাদের জানা নেই। অমরেন্দ্রনাথ রায়ের মতে জগন্মোহন নিধুবাবুকে দশহাজার টাকা দান করেন।[৪] কিন্তু নিধুবাবু অযাচিত দান নিয়েছিলেন,—এই প্রমাণও নেই। "প্রাপ্য" কথাটির ব্যাখ্যা, বোধ হয় ধার শোধের ব্যাপারে 'প্রাপ্য' ছিল,—এভাবে করা যায়। কিন্তু তা-ও অনুমান মাত্র।

ভবোতোষ দত্ত এ-সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক মত প্রকাশ করেছেন। তিনি অনুমান করেন, ১৭৬১ থেকে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত "প্রথমবার" ছাপরায় অবস্থান কালে নিধুবাবু এই অর্থ লাভ করেন। নবাব মিরকাশিম্-এর সঙ্গে পাটনার ইংরাজ কুঠিয়াল এলিস্ সাহেবের দ্বন্দ্ব হয়। এই সংঘাতে সারণের ফৌজদার "রামনিধি" নামক বাঙালি এলিস্-এর অসুবিধার সৃষ্টি করে। গোলাম

১. 'কবি জীবনী', ১০৩, 'গীতরত্ন', ।.

২. তদেব, ৩৯৫ ;

৩. V. A., Smith *The Oxford History of India* , ed. P. Spear (Paper back 1967) P. 503. রাজস্ব বিভাগের নানাবিধ দুর্বলতার বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

৪. নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ, (১৩২৩), ৮৯৪

হোসেন রচিত 'সেইর্-উল্-মুতাক্‌থ্‌রিণ' গ্রন্থে সারণের ফৌজদার রামনিধির কার্যকলাপ বর্ণিত হয়েছে। ভবতোষ দত্ত হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, মিরকাশিম-এলিস্-এর দ্বন্দ্বের সময় নিধুবাবুর বয়স ছিল ২২ বৎসর। তিনি লিখেছেন : "সুতরাং রামনিধি আসলে সত্যসত্যই ফৌজদার ছিলেন না।... এই বয়সে সাধারণ সৈনিক হওয়াই সম্ভব। এই জন্যই তাঁর নাম আর কারো মনে থাকেনি।" একটু পরেই তিনি লিখেছেন : 'এমন হওয়া বিচিত্র নয়, এই সব ঘটনায় তিনি [নিধুবাবু] প্রচুর অর্থলাভ করেছিলেন, কিন্তু সে সব ফেলে কিংবা গচ্ছিত রেখে বাংলাদেশে ফিরে আসেন সম্ভবতঃ ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে।" জগন্মোহনের কাছে টাকা গচ্ছিত রাখাও যে "বিশ্বাসযোগ্য" নয়—তা-ও তিনি লিখেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, সারণের ফৌজদার রামনিধির উল্লেখ 'সেইর-উল্-মুতাক্‌থ্‌রিণ' ছাড়া *Bengal District Gazetteer, Saran*এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২৩ পৃষ্ঠাতেই আছে। অন্যান্য প্রমাণ্য ইতিহাসের গ্রন্থে রামনিধি অনুল্লিখিত।[১]

নিজের অনুমানের সমর্থনে ভবতোষ দত্ত দুটি যুক্তি দেখিয়েছেন। (ক) তিনি লিখেছেন : "আমাদের অনুমান, ১৭৬১-তে নিধুবাবুর প্রথম বিবাহ এবং ১৭৬৮-তে প্রথম সন্তানের জন্ম পর্যন্ত নিধুবাবুর জীবনের এই সাত বৎসরে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটেছিল, যা তিনি পরবর্তীদের কাছে কখনই প্রকাশ করেন নি।"[২] (খ) তাঁর দ্বিতীয় যুক্তি : "ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বলেই ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সে সব কথা তিনি আর প্রচার করতে চান নি।" নিধুবাবুর ইংরেজ বিরোধিতার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাবে তিনি ঈশ্বর গুপ্ত বর্ণিত 'তাঁর দৃঢ় স্বল্পবাক ব্যক্তিত্ব,' ও "নানান দেশে নানান ভাষা"—এই প্রথম চরণ যুক্ত মাতৃভাষার বন্দনা-গানের উল্লেখ করেছেন।[৩]

রামনিধি ২০ বৎসর বয়সে ছাপরায় যান, এ-কথা দীনেশচন্দ্র সেন-ও লিখেছেন।[৪] দীনেশচন্দ্র সেন প্রদত্ত কালপঞ্জি তুলনামূলক বিচারে নির্ভর

১. 'কবিজীবনী', ৩১৬-৩১৮ ; *Seir-ul-Mutaqharin*' (1902) vol II, P, 474, 'কবিজীবনী', ৩১৭, পাদটীকা।

২. তদেব, ৩১৫

৩. তদেব, ৩১৭-১৮

৪. D. C. Sen, *op. cit*, 758

যোগ্য নয়। ১৭৬১ থেকে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশী ও বিদেশী শাসকদের দ্বন্দ্বের সময় রামনিধি কবিতা লিখেছিলেন, কিংবা গীতাভ্যাসে নিযুক্ত ছিলেন, — এ-রকম অনুমানও করা যায়। পরবর্তীদের কাছে বলার মতো কিছু ঘটেনি, তাই তিনি এ-সময়ের ঘটনাবলি সম্পর্কে পরবর্তীদের কিছু বলেননি, এ-রূপ ধারণাই বোধ হয় অন্য প্রমাণাভাবে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

'নানান দেশে নানান ভাষা'-গান নিধুবাবু কবে লিখেছিলেন, জানি না। এই গান লেখার কারণ সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র ইঙ্গিত অমরেন্দ্রনাথ রায়ের 'নিধুগুপ্ত' প্রবন্ধে আছে। তিনি লিখেছেন: "দেওয়ানজী ও অন্যান্য ধনী সৌখীন বাবুদের বৈঠকে বা মজলিসে পশ্চিমে খেয়াল বা টপ্পা গীত হইত বটে, কিন্তু তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়কে সুখ দিতে পারিলেও মনকে তেমন তৃপ্তি দিতে পারিত না।"[১] এই গানে, বিদেশী ভাষায় রচিত টপ্পা শ্রবণে শ্রোতার মনের ভাব প্রকটিত। এই গানটি ছাড়া নিধুবাবুর আর কোনো গানে বিদেশবিরাগ ও স্বদেশপ্রেম অভিব্যক্তি হয় নি।

২

সে যুগে কোম্পানীর কর্মচারীগণ হাতে টাকা পয়সা জমলে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে জমানো টাকা লগ্নী করতেন। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নিধুবাবু ১২০১ বঙ্গাব্দে কলকাতায় ফিরে এলেন। কলকাতায় তখন "Agency House"-এর স্বর্ণযুগ। কালীকিঙ্কর দত্ত লিখেছেন: "The Agency Houses were started by the servants of the company, who after accumulating large funds and finding their habits better adapted for commercial pursuits, *obtained permission to resign their situations and engage in agency and mercantile business.*" (*Italics ours*)[২]

নিধুবাবু ছাপরা থেকে যে দশ হাজার টাকা নিয়ে এসেছিলেন, তা কি তিনি কোনো "Agency House"-এর ব্যবসায়ে খাটিয়েছিলেন? কোনো

১. 'নারায়ণ' (১৩২৩), ৮৮৮-৮৯

২. K. K. Datta, *Survey*, 178-৯।

চাকরি না করে, নানারকম দান-ধ্যান করে, অতিবৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বৃহৎ সংসার চালানো কি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল? তাঁর সঙ্গে মার্কিন জাহাজি কোম্পানীর মুৎসুদ্দি রামচন্দ্র মিত্রের পূর্ব পরিচয় ছিল কি? প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য যে, কলকাতায় মার্কিন ব্যবসা-বাণিজ্য তখন ভালোই চলছিল। "In 1800, the value of American imports into Bengal was about 49,75,800 *sicca* rupees, and that of export···above sixty one lacs...[১] নিধুবাবু রামচন্দ্র মিত্রের সহায়তায় ছাপরা থেকে আনা দশ হাজার টাকা কি কোনো Agency House-এ লগ্নী করেন? প্রমাণের অভাবে এই সব প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

১২০১ কিম্বা ১২০২ বঙ্গাব্দে নিধুবাবু বরিঝাটি-চণ্ডীতলা গ্রামের হরিনারায়ণ সেনের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এই বিবাহে তাঁর চার পুত্র ও দুই কন্যার জন্ম হয়। প্রথম পুত্র, কনিষ্ঠ পুত্র ও জেষ্ঠা কন্যা তাঁর জীবদ্দশাতেই লোকান্তরিত হন। দ্বিতীয় পুত্র জয় গোপাল গুপ্ত, তৃতীয় পুত্র সুখময় গুপ্ত ও কনিষ্ঠা কন্যা ১২৭৫ বঙ্গাব্দেও জীবিত ছিলেন।[২] সুখময় গুপ্তের জ্যেষ্ঠ কন্যার বংশধরগণের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে।

বারবার স্বজন বিয়োগে নিধুবাবু বড়ো শোক পেয়েছেন। প্রথমা পত্নী ও প্রথম সন্তানের অকাল মৃত্যুতে শোকার্ত হয়ে তিনি 'মনপুর হতে আমার হারায়েছে মনঃ,'—এই প্রথম চরণ যুক্ত করুণরসাত্মক গানটি রচনা করেছিলেন।[৩] গুরুচরণ কবিরাজ ও গুরুদাস কবিরাজ নামে দুই কৃতবিদ্য তরুণ ভাগনের মৃত্যুতে নিধুবাবু "অত্যন্ত কাতর হইলেন, এবং তদবধি সাংসারিক সুখ সম্বন্ধে এককালেই আসক্তিহীন হইলেন, কি ঐশ্বর্য্য কি পরিজন কাহার প্রতি আর কিঞ্চিন্মাত্র যত্ন করিতেন না গৃহে থাকিয়া উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।"[৪] প্রথম পুত্র ও প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পূর্বে

1. Milburn, *Oriental Commerce* (London,1813), II, 201.

২. 'কবিজীবনী' ১০৪, গীতরত্ন' ।৶০; 'গীতাবলী' ১৮; 'বঙ্গভাষার লেখক' ১, ৩২০, নানানিবন্ধ' ১১৩; নিধুবাবু যে-গ্রামে তৃতীয়বার বিবাহ করেন, এই সব গ্রন্থে তার বিভিন্ন নাম দেখা যায়: 'গীতরত্ন'-তে উল্লিখিত 'বরিঝাটি চণ্ডীতলা' নাম মেনে নিচ্ছি।

৩, কবিজীবনী, ১০৪

৪. তদেব, ১০৪-১০৫

তিনি "সহজে সন্তোষচিত্ত ছিলেন·· সর্বদাই হাস্যপূর্বক আমোদ-প্রমোদে কালক্ষয় করিতেন।"[১]

যাঁদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন, তাঁরা অপ্রিয় ব্যবহার করলেও তিনি তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয়েছিল; অথচ, তাঁর অনুরোধে নিধুবাবু প্রতিবৎসর সরস্বতী পূজার সময় জগন্মোহন বিরচিত একটি বাণীবন্দনাগীত গাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[২]

নিধুবাবু কালী মির্জার মতো পারিষদ বৃত্তি অবলম্বন করেননি। তিনি গম্ভীর ও দৃঢ়চেতা ছিলেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নিধুবাবুর "মুখের পানে মুখ করিয়া, বাবু একটি গান করুন, এমত কথা কহিতে কাহারো সাহস হইত না।" অনেক বড়োলোক তাঁর কাছে গান শুনতে আসতেন; এমন কি, বর্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্র (১৭৭১-১৮৩২) কলকাতায় এসে নিধুবাবুর গান শুনেছেন: "ইহাঁরা তাবতেই বাবুর নিকট আসিতেন, কিন্তু বাবু প্রায় কাহারো নিকট গমন করিতেন না, কারণ তিনি স্বাধীনতা সম্মানের উপর নিয়তই দৃষ্টি রাখিতেন।"[৩]

স্থূল মোসাহেবি করার অর্থনৈতিক কারণ না থাকলেও নিধুবাবু তাঁর ধনী পৃষ্ঠপোষকদের বিরোধিতা করেননি। 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম'-এর তৃতীয় খণ্ডে নিধুবাবুর রচনারূপে একটি গান আছে, যাতে পৃষ্ঠপোষকতার মূল্য স্বীকৃত হয়েছে। গানটি 'গীতাবলী'-তে-ও উদ্ধৃত হয়েছে। তার প্রথম চরণ, "আঙ্গুর গাছের কিছু কহি বিবরণ"। শেষ চার চরণ: "ঐরূপ মানবতরু আশ্রয় পাইলে/উন্নত হইতে পারে সকল সকালে॥ বিনাশ্রয়ে শুন কই না পারে বাড়িতে। অবশেষে মরে যায় ভাবিতে ভাবিতে॥[৪]

বাবু কৃষ্ণমোহন বসাক নিধুবাবুকে নিয়ে একবার মাহেশের স্নানযাত্রা দেখতে গিয়েছিলেন। নৌকাতে আটদিন কাটিয়ে নিধুবাবু একদিন-ও গান শুনিয়ে

১. তদেব, ১০৩ ১০৪

২. তদেব ১০৩, 'গীতরত্ন' ।০-।/০

৩. 'কবিজীবনী,' ১০৬; ১৭৭১ থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তেজশ্চন্দ্রের রাজত্বকাল একটানা নয়।

৪. সঙ্গীতরাগ কল্পদ্রুম (১২৫২), ২৩৯; গীতাবলী, ৪৪-৪৫; 'গীতরত্ন'তে গানটি নেই।

কৃষ্ণমোহনকে আপ্যায়িত করেননি; "কেবল বাবুর বাক্‌কৌশলে ও রসিকতাতেই সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।"[১]

রেভারেণ্ড লং সাহেব লিখেছেন: "...he was said to have written the best when he was drunk."[২], কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত নিধুবাবুর মদ্যপানাসক্তির উল্লেখ করেননি। রেভারেণ্ড লং শোনা কথা লিখেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত বরং লিখেছেন: "বাবু শারীরিক নিদান এমত বুঝিতেন, যে সময়ে স্নান, সময়ে ভোজন, সময়ে শয়ন করাতে একাল পর্যন্ত কোনরূপ রোগ ভোগ করেন নাই।"[৩]

নিধুবাবু ছিলেন দয়ালু ও পরোপকারী। অমরেন্দ্র নাথ লিখেছেন: "নিধু এখনকার কবিদের মত শুধু কবিতা লিখিবার সময় কবি হইতেন না, জীবনেও তিনি বিলক্ষণ কবি ছিলেন।"[৪] অসাধারণ ব্যক্তিত্ব প্রভাবে তিনি "বাবু" নামেই পরিচিত ছিলেন। "কি সধন কি অধন সর্বসাধারণ ব্যক্তিই নিধুবাবুকে "বাবু" শব্দে সম্বোধন করিতেন। বাবুর বাটী, বাবুর সুর, বাবুর গীত, বাবু এলেন, বাবু গেলেন ইত্যাদি"।[৫]

মুর্শিদাবাদের নিজামতের দেওয়ান ছিলেন মহানন্দ রায়।[৬] তাঁর রক্ষিতা শ্রীমতীর সঙ্গে নিধুবাবুর সম্পর্ক নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। এসম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন: "মুরশিদাবাদস্থ মৃত মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুর এখানে আসিয়া বহুদিন অবস্থান পূর্বক প্রতিদিবস এক নিয়মে বাবুর সহিত একত্র হইয়া মনের আনন্দে আমোদ প্রমোদ করিতেন। উক্ত মহারাজের শ্রীমতী নাম্নী এক রূপবতী গুণবতী বুদ্ধিশালিনী বারাঙ্গনা ছিল, ঐ বারবিলাসিনী রামনিধিবাবুকে অন্তঃকরণের সহিত ভালবাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত এবং বাবুও তাহার বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করিতেন এই শ্রীমতী নিধুবাবুর প্রণয়িনী প্রিয়তমা বেশ্যা।

---

১. 'কবিজীবনী', ১১৩-১১৪, 'গীতরত্ন', ।৵০

২. Long, *A Descriptive Catalogue of Bengali Books* (D. C. Sen ed) P. 678

৩. 'কবিজীবনী', ১১৪-১১৫; গীতরত্ন' ৵৹

৪. 'নারায়ণ' (১৩২৩), ৮৯৩

৫. 'কবিজীবনী', ১১৫

৬. তদেব, ৪০৩

কিন্তু অনেকে একথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিতেন তিনি লম্পট ছিলেন না, কেবল স্তুতি, বিনয়, স্নেহ এবং নির্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন। এই প্রযুক্ত তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিয়া প্রায় প্রতিরজনীতেই তাহার গৃহে গমন করিতেন, এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্য পরিহাস, কাব্য আলাপ ও গীতবাদ্য করিয়া আসিতেন, আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেরূপ ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ রাগসুর বদ্ধ করিয়া তাহারি এক এক টপ্পা রচনা করিতেন"।[১] জয়গোপাল গুপ্ত এক কথাই লিখেছেন ; শুধু "প্রতি রজনীতে" কথাটি বাদ দিয়েছেন।[২]

'গীতরত্ন'-তে বেশ কিছু প্রেমের গান আছে। যেখানে গায়িকা কিম্বা নায়িকা "নিধি" শব্দ ব্যবহার করে প্রেমরূপ নিধি, কিম্বা নায়করূপ নিধির জন্য মনের আকুলতা প্রকাশ করেছে। এ-সব গানের কিছু নমুনা নিচে দেওয়া হলো। আমরা কিন্তু এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ নই যে, এই গানগুলি শ্রীমতীর প্রেরণায় কিংবা সান্নিধ্যে রচিত হয়েছিল। শেষ গানে বক্তা প্রেমিক অথবা নায়ক। নিদর্শন, যথা :

ক ॥ পিরীতি সুখের **নিধি** করিয়ে এখন কাঁদি অবলা করেছে বিধি, সহিতে হবে। (১৩৯)

খ ॥ পিরীতি সুখের **নিধি,** অনুকূল দিলে বিধি, এ যতনে যায় প্রাণ, সেহ বরং ভাল। (১২২)

গ ॥ মনের মানস বিধি, পূরাইবে পাব **নিধি** হলো এতদিনে। (৫৮)

ঘ ॥ যার যেবা বিধি, সেই দেয় **নিধি,** তার গণনে। (৫০)

ঙ ॥ এমন কল্যাণ কর বিধি, প্রাণ **নিধি** না হয় নিদয়। (১৪০)

চ ॥ অনুকূলে বিধি, যদি প্রাণ **নিধি** দিল হে আমারে। (৫৫)

ছ ॥ দেখিলে কি **নিধি** পাই কোথায় রাখিব। (৭৭)

জ ॥ গুণের সাগর হে তুমি গুণ **নিধি** (১৫)

ঝ ॥ জানি তুমি প্রাণ **নিধি** হে। (৮৬)

ঞ ॥ ইহার উপায় বিধি কিবা সেই প্রাণ **নিধি** বোধেরে হইল। (৪)

ট ॥ পরম সুখের **নিধি,** পিরীতি সৃজিল বিধি, জানিয়ে সুজনে। (১৪০)

ঠ ॥ এরতন **নিধি** পাইলাম যদি হে বিধি, বিবাদি হইও না। (১১২)

১. 'কবিজীবনী', ১০৭

২. 'গীতরত্ন', ।৵০

ঙ॥ পিরীতি রতন যদি, যতনে মিলালো বিধি, পাইয়ে এমন **নিধি** দুখ নাহি গেল। (৭৬)

চ॥ পিরীতি সমান **নিধি** কোথা আছে আর। (১৩৫)

ণ॥ বুঝিলাম এখন মনে, দুখিনী জনে **নিধি** লাভ হবে কেনে। সই (৮৫)

ত॥ পিরীতি রতন **নিধি** পাইল যে জন। (১৩৫)

থ॥ বিনে অনুকূল বিধি, কোথায় মিলয়ে **নিধি**? (৭১)

দ॥ হইয়ে অধীন, করিল অধীন **নিধি** উভয়ে মনেতে (১৯)

ধ॥ প্রতিনিধি পেয়ে সই **নিধি** ত্যজা যায় না। (১৩)

ন॥ যখন দেখে আমারে, **নিধি** পাই মনে করে ভাসে আনন্দেতে (৪১)।[১]

আমাদের মনে হয়, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে "নিধি" শব্দ দ্ব্যর্থবোধক। যেখানে এই শব্দ আছে, সেখানে "নিধি" লাভের, অথবা "নিধি" না পাওয়ার সুখদুঃখ ব্যক্ত হয়েছে। এই সব আভ্যন্তরীণ ইঙ্গিতে নিধুবাবুর সঙ্গে শ্রীমতীর প্রণয়-মূলক সম্পর্ক প্রকটিত। বরদাপ্রসাদ দে এই সম্পর্ক সম্বন্ধে লিখেছেন: "If there was any love, it was platonic love". পাদটীকায় তাঁর মন্তব্য: "I say this on the authority of one who was on familiar terms with Ram Nidhi".[২]

সুপরিণত বার্ধক্যেও নিধুবাবু সুস্থ-সমর্থভাবে চলাফেরা করতেন। মৃত্যুর এক বৎসর আগে তিনি তাঁর ২০ নম্বর নন্দরাম সেন ষ্ট্রীটের বাড়ীতেই থাকতেন, ইংরেজি, বাংলা বই. পড়তেন, কখন কখন "হস্তমাল কুবের ও তুলসীদাসকৃত গ্রন্থ পাঠ করিতেন"। এ-সময় বহু লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত। মৃত্যুর এক বছর আগেও তিনি গান লিখেছেন। যশোহর জেলার চাঁচড়ার রাজা বরদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর এ-সময় একটিমাত্র চরণ রচনা করে নিধুবাবুকে অবশিষ্ট অংশ রচনা করতে অনুরোধ করেন। বরদাকণ্ঠ রচিত প্রথম চরণ:

"মনে করি, পিরীত না করি।"

সমস্যা পূরণের ভঙ্গিতে নিধুবাবু রচনা করলেন:

"সকল দুঃখের মূল প্রণয়ে চাতুরী।
শ্যামাদরশনে যত ব্রজপুর নারী।
জ্বলিত বিরহানলে দিবা বিভাবরী॥

১. বন্ধনীতে প্রদত্ত সংখ্যা 'গীতরত্ন' গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা।
২. *J. B. A. L.* I. 6. P. 6.

বরদা বিধান এই বুঝহ বিচারি।
প্রেম সুখ যত দুঃখ হরি হরি হরি ॥[১]

অবশেষে, ১২৪৫ সালে ২১শে চৈত্র নিধুবাবু "জাহ্নবীর তীরে যোগাসনে জ্ঞানপূর্ব্বক জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এতন্মায়াময় সংসার পরিহার করত যোগ্যধামে যাত্রা করিলেন"।[২]

তাঁর মৃত্যু-সংবাদ *'Friend of India'*-এ বেরিয়েছিল।[৩]

১. 'কবিজীবনী', ১১৫, 'গীতরত্ন', ৸০ ৸/০

২. তদেব, ১১৫; তদেব, ৸০-৸/০

৩. 'The Weekly Epitome of News', *'The Friend of India'*, April 11, 1839, P. 229 : *J. B. A. L., I*, 6, P. 5.

টপ্পা গানের সামাজিক পটভূমি। (বঙ্গাব্দ ১২০১-১২৩০)

১.

বাংলাদেশে ও কলকাতায় ইংরাজি শিক্ষা প্রচলনের পূর্বে একটি বিশেষ ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। তার সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সম্পর্ক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কিম্বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে-ও নিবিড় হয়ে ওঠেনি। এই অবস্থা সম্পর্কে স্পীয়ার্ লিখেছেন: "The aristocratic world of India remained largely impervious to western influences... A change, when it came, emerged from a quarter half-way between the British and Indian worlds, and between the old aristocratic world and the new middle class, which had begun to cluster round the British."[১] ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে সাংস্কৃতিক দূরত্বের কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন: "The English despised the Hindus as barbarians, with hardly any trace of culture and civilization, and some even regarded them almost as brutes".[২] তিনি এই বক্তব্যের সমর্থনে Marquess of Hastings-এর মত উদ্ধৃত করেছেন। Hastings লিখেছিলেন: "The Hindoo appears a being nearly limited to mere animal functions, and even in them indifferent." কুকুর, হাতী অথবা বাঁদরের চেয়ে হিন্দুরা বুদ্ধিমান নয়।[৩]

যাঁরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাদেশের পরিচয় থেকেই আধুনিক বাঙালি কৃষ্টির সূত্রপাত দেখাতে ব্যস্ত, ইংরাজি শিক্ষা প্রচলনের পূর্বের অবস্থাটিকে তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব দেননি। কিন্তু তথাকথিত 'রেনেসাঁস'-এর পূর্বেও আমাদের দেশে কিছু সাংস্কৃতিক সম্ভাবনা ছিল। নিধুবাবুর গান যে

সে-সম্ভাবনারই অন্যতম প্রকাশ, তা পরে দেখান যাবে। দীর্ঘজীবী নিধুবাবু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তনের সূচনা দেখেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় কলকাতার তথা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে যে-সব মৌল পরিবর্তন ঘটেছিল, এখানে সংক্ষেপে সে-সম্পর্কে কিছু তথ্য আলোচনা করা হবে।

২.

১২০১ বঙ্গাব্দে নিধুবাবু ছাপরা থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন। এখানে এসে তিনি সমাজ-সংস্কার বা শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী হননি। সুপরিণত বার্ধক্যে তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত এ-সম্পর্কে নির্বাক। কিন্তু জয়গোপাল গুপ্তের মতে, একবার ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের "আদেশে" নিধুবাবু "কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া" একটি স্বরচিত ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁকে গেয়ে শুনিয়ে সুখী করেন।[১] নিধুবাবুর এই গান রামমোহন রায়কে শোনাবার আগেই উৎসবানন্দ পরলোক গমন করেন।[২]

নিধুবাবুর কর্মক্ষেত্র হলো কলকাতার চিৎপুর—শোভাবাজার অঞ্চল। গ্রীয়ারসন্ এক জায়গায় "Calcutta Civilization" কথাটি ব্যবহার করেছেন।[৩] ইংরাজ অধিকারের আদিযুগে উত্তর কলকাতায় একটি বিশেষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল। গ্রীয়ারসন্ ব্যাপক অর্থে সেই পরিমণ্ডলকেই "Civilization" শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। নিধুবাবুর টপ্পা এই বিশেষ পরিমণ্ডলেই রচিত হয়েছিল।

বিনয় ঘোষ প্রদত্ত একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে-ও বাগবাজার, শ্যামবাজার, জোড়াবাগান, গরাণহাটা, পাথুরিয়াঘাটা, মেছুয়াবাজার, জান-

১. 'গীতরত্ন', ৷৷৶৹

২. উৎসবানন্দের পরিচয়, S. K. De, *Bengali Literature*, 519, উৎসবানন্দাত্মজ বৈষ্ণবচরণের পরিচয়, "সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস"—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ৮০ পৃষ্ঠা।

৩. G. A. Grierson, *The Modern Vernacular Literature of Hindustan* (1889), xxiii.

বাজার, কাশীপুর, শোভাবাজার, নিমতলা, সিমলা, জোড়াসাঁকো ও বড়বাজারে ৬৩টি ধনী ও ক্ষমতাশালী পরিবার ছিলেন।[১] নিধুবাবু ছাপরা থেকে কলকাতায় ফিরে এলে উত্তর কলকাতার সমকালীন ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পেশা ও অর্থনৈতিক বিচারে তাঁদের এ-ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়, যথা :

১. রাজা-মহারাজা :—শোভাবাজারের রাজকৃষ্ণ দেব ও গোপীমোহন দেব ; বর্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্র ; মুর্শিদাবাদের রাজা মহানন্দ রায় ; যশোহর-চাঁচড়ার রাজা বরদাকণ্ঠ রায়।

২. দেওয়ান :—বাগবাজারের দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের বংশধর "সিংহবাবুরা"।

৩. জমিদার, মুৎসুদ্দি, বণিক, চাকুরে :—শোভাবাজারের মুৎসুদ্দি রামচন্দ্র মিত্র ; তাঁর পুত্র জয়চন্দ্র মিত্র ; পাথুরিয়াঘাটার নীলমণি মল্লিক ও ঠাকুর পরিবার ; গরাণহাটার কৃষ্ণমোহন বসাক ; শ্যামবাজারের দিগম্বর মিত্র (তাঁর রাজা উপাধি ছিল), ও হলধর ঘোষ , শোভা-বাজারের কালীশঙ্কর ঘোষের পুত্রগণ।

৪. গায়ক, ওস্তাদ, কবি :—কুলুইচন্দ্র সেন ; তাঁর পুত্র গোকুলচন্দ্র সেন ; জোড়াসাঁকোর রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় , বাগবাজারের মোহনচাঁদ বসু ; পক্ষীর দলের নেতা নারায়ণ মিশ্র ; রামলোচন বসাক ; শ্রীদাম দাস , রাজা রাজবল্লভের কালোয়াৎ আবুববস্ খাঁ , বিখ্যাত বাদক গোলাম আব্বাস। (গোলাম আব্বাস রামমোহনের সময় ব্রাহ্মসমাজে পাখোয়াজ বাজাতেন। সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ১, 'রামমোহন রায়', ৫৫ পৃষ্ঠা)

৫. ব্রাহ্মসমাজের আচার্য :—উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ।

৬. রক্ষিতা রমণী—শ্রীমতী।[২]

নিধুবাবুর গান নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের কলা-ঐতিহ্যের একটি মূল্যবান অংশ ; কিন্তু প্রচলিত অর্থে তাকে ঠিক 'folk-art' বলে ধরা যায় না। সাধারণ শ্রোতাদের জন্য তাঁর টপ্পা পরিকল্পিত হয়নি। সঙ্গীতকে "হাল্‌কা" করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।[৩] যে-সব ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি, যাঁরা ছিলেন তাঁর শ্রোতা ও সমঝদার, তাঁদের বিশেষ ধরনের রুচির প্রভাব নিধুবাবুর গানে লক্ষণীয়। এই দিক্ থেকে বিচার করলে সমকালীন কলকাতার সাংস্কৃতিক অবস্থার সঙ্গে নিধুবাবুর টপ্পার সম্পর্ক ধরা যাবে।

৩.

নিধুবাবু ১২০১ বঙ্গাব্দে কলকাতায় ফিরে আসার আগেই কলকাতার লোকরঞ্জন শিল্পে দুটি পরস্পর বিরোধী প্রবণতা সংমিশ্রিত হয়েছিল। তখনকার দিনের বড় বড় লোকরা নিতান্ত স্থূল গ্রাম্যতা বর্জন করতে পারেননি। অথচ, সূক্ষ্ম, সুসংস্কৃত শিল্পের সমর্থক-ও ছিলেন তাঁরাই। লোকরঞ্জনমূলক শিল্পে গ্রাম্যতা ও নাগরিকতার সংমিশ্রণজাত একটি বিচিত্র অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। তখন একদিকে ছিল কবি গান, পাঁচালী গান, পক্ষীর দলের কবিতা, তর্জা, খেঁউড ও 'বাইনাচ'। সাধারণভাবে এ-সব ছিল স্থূলতার নিদর্শন। অন্যদিকে ছিল উচ্চাঙ্গ বৈঠকী সঙ্গীত, যথা, আখড়াই ও টপ্পা। ঈশ্বরগুপ্ত ধনীদের "সকারে বকারে সন্তুষ্ট" হবার কথা লিখেছেন।[৪] এই ধনীরাই কুলুইচন্দ্র সেন, রসিকচাঁদ গোস্বামি, নিধুবাবু ও কালী মির্জার রাগ-সঙ্গীতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১২২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত, রাধামোহন সেন দাসের

সিংহপরিবার,—তদেব, ৪০৫, রামচন্দ্র মিত্র ও জয় চন্দ্র মিত্র=হরিহর শেঠ, 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়', ৪৪৭; নীলমণি মল্লিক—Lokenath Ghosh, '*The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas and Zemindars*, (1881), II, 58; পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার—কিশোরী চাঁদ মিত্র, 'দ্বারকনাথ ঠাকুর' (বঙ্গানুবাদ), ২৪৩ ২৫৬, কৃষ্ণমোহন বসাক—'কবিজীবনী', ১১৩-১১৪, 'গীতরত্ন', ।৵, সঙ্গীতজ্ঞ, গায়ক, কবি—'কবিজীবনী' ১০৫-১৬, 'গীতরত্ন' ।৶-৮, রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়—গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য, 'হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস', ১১-২০; শ্রীদাম দাস—'বিবিধার্থ সংগ্রহ', ১৭৮০ শক, ২৩৫, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১, ১৪০; নারায়ণ মিশ্র—হরিহর শেঠ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২০৮-২০৯।

৩. রাজেশ্বর মিত্র, 'বাংলার গীতকার', ১৩০-১৩১

৪ 'কবিজীবনী', ১৪৬

"সঙ্গীত তরঙ্গ" ছাপাবার জন্য শতাধিক ধনীব্যক্তি আর্থিক সাহায্য দান করেন। তাঁদের মধ্যে সাহেবরা-ও ছিলেন।[১]

গ্রাম্যতা ও নাগরিকতার এ-রকম সংমিশ্রণ অবশ্য নূতন ঘটনা নয়। কিন্তু নিধুবাবুর সময় কলকাতার ধনীদের শিল্প-রুচিবোধে স্থূলতা ও সূক্ষ্মতার মধ্যে এই টানাপোড়েনের পেছনে কিছু বিশেষ কারণ ছিল। সেগুলি লক্ষ করা যাক।

সেকালের সামাজিক ইতিহাসে এ-সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। নবাবী আমলের শেষে, "মেঘান্তের রৌদ্রের মত" যখন ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠল, তখন, 'হুতোম প্যাঁচা'র মতে, "কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগল। গবো মুন্সী, ছিরে বেণে ও পুঁটে তেলী রাজা হলো...হাফ্ আখড়াই, ফুল-আখড়াই, পাঁচালী ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লে, সহরের যুবকদল গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন।"[২] 'হুতোম প্যাঁচা' সমকালীন শিল্পরুচির অবনতির জন্য দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন: এক, "কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর"-এর উৎসন্নে যাওয়া; দুই, 'গবো মুন্সী', 'ছিড়ে বেণে' ও 'পুঁটে তেলী'দের রাজা হওয়া। এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' গ্রন্থে-ও আছে। এখানে লক্ষণীয়, 'হুতোম প্যাঁচা', 'হাফ আখড়াই' ও 'ফুল আখড়াই'-এর মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য বিচার করেননি। কিন্তু অখ্যাত লোকদের হঠাৎ ধনী ও প্রতিপত্তিশালী হওয়া সম্পর্কে অনন্থকরণীয় ভঙ্গিতে তিনি যা লিখেছেন, তা মানতেই নয়। রাজা নবকৃষ্ণ দেব, গোবিন্দরাম মিত্র, অথবা রামদুলাল দে সামান্য অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ইংরাজদের সঙ্গে নানাভাবে সহযোগিতা করে বড়মানুষ হন।[৩] ইংরাজ বণিক, ও এঁদের অভ্যুদয়ে "টাকা

১. 'সঙ্গীততরঙ্গ', ১ম সং, (১২২৫), পৃষ্ঠপোষকদের তালিকা। ৩।৪ জন সাহেবের নাম-ও আছে।

২. 'সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী', ১, ২৯-৩০

৩. N. G. Ghosh, *Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur*', (Calcutta, 1901), Chapters I, II, III, IV and IX ; '*An Account of the Late Govindrum Mitter*', vol. CCLXIX of India Office Library Tracts, Calcutta National Press, 1869 , G. C. Ghosh, A *Lecture on the Life of Ramdoolal Dey*, vol. CXXXVII of India Office Library Tracts, Bengal Press, Before. প্রাচীন জমিদারদের ১৭৯৩ খ্রী:-এর পর সর্বস্বান্ত হওয়া প্রসঙ্গে Mill and Wilson *History of India*, (1858), V, 367-369.
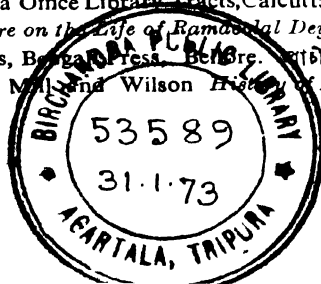
বংশগৌরবকে ছাপিয়ে উঠলেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগদী, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কলকাতায় কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠলেন। এ-সময় হাফ আখড়াই ও ফুল আখড়াই-এর সৃষ্টি ...”[১]

এঁরাই ছিলেন কলকাতার 'নব্যধনী', এবং এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সমকালীন কবি, গায়ক অথবা শিল্পীর স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃতি লাভের উপায় ছিল না।

ঈশ্বরগুপ্তের কবিগান সম্পর্কে লেখায় কবিগানের উৎপত্তি ও প্রসার সম্পর্কে রাজা নবকৃষ্ণের অবদান বিশেষ ভাবেই আলোচিত হয়েছে।[২] N. N. Ghosh লিখেছেন,“...he introduced into Calcutta Society and popularised the nautch which Englishmen believe to be the chief of our public amusements. It is *Bai Nautch*.”[৩] নবকৃষ্ণ Miss Wrangham নামে এক মেমসাহেবের জন্মদিনে নিজের বাড়ীতেই যে-বাই নাচের বন্দোবস্ত করেন, তাঁর বিবরণ বেরিয়েছিল হিকি'র 'Bengal Gazette-এ.।[৪] এ-ঘটনা, বেলগাছিয়া ভিলায় প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মিস্ ইডেনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত ভোজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নব্যধনীরা ফার্সি জানতেন; ইংরাজি ভাষা কাজ চালাবার মত শিখেছিলেন; কেউ কেউ সংস্কৃত জানতেন। নবকৃষ্ণ ফার্সি ও ইংরাজি ভাল জানতেন। 'Black Deputy' গোবিন্দরাম মিত্র ইংরাজি জানতেন। কিন্তু এঁদের, অথবা এঁদের মত ধনী, সন্তানদের বিদগ্ধ, সুরুচি-সম্পন্ন বা শিক্ষিত বলা যায় কি? ঈশ্বরগুপ্ত, কিংবা 'হুতোম প্যাঁচা', এঁদের সম্পর্কে যে-সব মন্তব্য করেছেন, অন্য প্রমাণাভাবে তা সত্য বলে স্বীকার করে নিতে বাধা নেই। ঈশ্বর গুপ্ত নবকৃষ্ণের বাড়ীতে “শ্লোষোক্তি ছেড়ের খেস্‌সা গান” শুনে সকলের “খল খল শব্দে হাস্য নির্গত” হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন।[৫] এ-ঘটনা তিনি “৯০ বৎসর বয়স্ক কোন প্রাচীন ব্যক্তির প্রমুখাৎ” শুনেছিলেন।

১. 'সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী' ১, ৩০.

২. 'কবিজীবনী', ১৪৩-১৪৯, N. N. Ghosh, *op. cit.* 186.

৩. N, N. Ghosh, *op. cit.* 186,

৪. *Ibid*, 183-84.

৫. 'কবিজীবনী' ১৪৮

হুতোম প্যাঁচা লিখেছেন : "এঁরা দলাদলির তর্ক কর্ত্তেন, মোসাহেবদের খোসামুদিতে ফুলে উঠতেন, গাইয়ে বাজিয়ে হলেই বাবুর বড় প্রিয় হত, বা-পান্ত কল্লেও বকশিস্ পেতো।"[১] সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সম্পর্কে এঁদের খুব বেশি ভাববার সময় ছিল না। এঁদের সামাজিক প্রতিপত্তির মূলে ছিল এঁদের অর্থ-প্রাচুর্য। একসময় কলকাতার ধনীরা 'গোলাপ জল দিয়ে জলশৌচ' কর্ত্তেন, 'ঢাকাই কাপড়ের পাড ছিঁড়ে' পরতেন, 'মুক্তাভস্মের চুণ দিয়ে' পান খেতেন, 'তেল মেখে চারঘোড়ার গাড়ী চ'ড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান কত্তে' যেতেন। 'হুতোম প্যাচা'র এই বর্ণনায় আতিশয্য থাকলেও কিছু সত্য কথা অবশ্যই আছে।[২] অজস্র অর্থ, সামাজিক প্রতিপত্তি, এবং ইংরাজদের উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্রয়, এই নব্য ধনীদের চারিত্রিক স্থূলতার সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি। কাঞ্চন-কৌলিন্য শুধু দেশী হুজুরদের রুচিবোধ স্থূল করেনি, যে-সব দরিদ্র ইংরাজ এ-দেশে এসে আঙ্গুল ফুলে কদলীকাণ্ড হয়েছিল, তাদের রুচি-ও তেমন একটা সূক্ষ্ম ছিলনা। তারা-ও দল বেঁধে বাইনাচ উপভোগ করত।[৩]

অসংস্কৃত ধনীদের টাকার ও স্থূলরুচির প্রভাবে সমকালীন শিল্প-সাহিত্যে স্থূলতা সঞ্চারিত হয়েছিল,—একথা যেমন সত্য, তেমনি একথা-ও মানতে হয় যে, সমকালীন কলকাতার কৃষ্টি পারিপার্শ্বিক গ্রাম-নগরের প্রভাবমুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। আখড়াই গানের ইতিহাস প্রসঙ্গে দেখা যাবে,—অন্ততঃ এই জনপ্রিয় শিল্পটি শান্তিপুর, চুঁচুড়া প্রভৃতি মফঃসল সহরের গীত-ঐতিহ্য দ্বারা বিশেষভাবেই প্রভাবান্বিত হয়। ইংরাজি শিক্ষা কলকাতায় চালু হবার পরেই কলকাতার সহুরে প্রভাব পারিপার্শ্বিক গ্রামীন কৃষ্টিতে সঞ্চারিত হয়। একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন : উনবিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে-ও গ্রাম ও নগর সাংস্কৃতিক বিচার অদ্বৈত ; তাদের মধ্যে "deep contradiction" দেখা যায় নি।[৪]

১. 'সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী', ১, ৪৫, দ্রষ্টব্য, "তমুবাবু", হরিহর শেঠ, 'কলিকাতা পরিচয়', (১৩৪১), ৭৬

২, তদেব, ২৮,—নবকৃষ্ণদেবের মাতৃশ্রাদ্ধে ৯ লক্ষ টাকা খরচ করার প্রচলিত কাহিনী N. N. Ghosh স্বীকার করেননি, N. N. Ghosh, *op cit.* 180-183

৩. 'রাজনারায়ন বসু, 'সেকাল আর একাল', ২-৭, T. J. P. Spear, *The Nabobs*, (London, 1963), 131.

৪. P. Sinha, '*Nineteenth Century Bengal*' (Calcutta, 1965), 4-5

কবি, তর্জা, পাঁচালী গানে-ত বটেই, টপ্পা গানের পদেও লৌকিক উপাদান লক্ষনীয়। টপ্পা-অঙ্গের 'প্রভাতী' গানের দেবর-ভ্রাতৃবধূর যৌন-সম্পর্কের ইঙ্গিত নিঃসন্দেহে গ্রাম্য খেউড়-প্রভাবিত।

৪

নব্যধনিক শ্রেণীর রুচির স্থূলতাই এই প্রসঙ্গে শেষ কথা নয়। জন্মগত, অথবা ভারতীয় পরিবেশে বর্ণজাত আভিজাত্যের অভাবে এই অনভিজাত ধনীগণ শেষ পর্যন্ত বর্ণাভিজাত্যের সংস্কার ও রুচি অনুসরণ করে কোনো কোনো বিষয়ে সুসংস্কৃত নাগরিকতা ও রুচির সূক্ষ্মতা সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন ; তা-ও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

নবার্জিত অর্থ, ক্রমবর্ধমান সামাজিক প্রতিপত্তি ও সম্মান অনভিজাত নব্যধনীদের অবচেতনে সাংস্কৃতিক সংশোধনের প্রবণতা তীক্ষ্ণ করে তোলে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে এই সংশোধনের দুটি দৃষ্টান্ত, 'হুতোম প্যাঁচা' বর্ণিত 'বাবু পদ্মলোচন দত্ত, ওরফে হঠাৎ অবতার', এবং বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণিত 'মুচিরাম গুড়'। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' উপন্যাসের 'নালুপাল' বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পল্লীসমাজে "Sanskritzation"[১] কিংবা 'সংস্কৃতীকরণ'-এর একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

এই সংশোধন-প্রবণতার দুটি উল্লেখযোগ্য ফল হয়েছিল। হিন্দু সংস্কার ও হিন্দু আচার সম্পর্কে কোনো কোনো নব্যধনী সংরক্ষণশীল হয়ে ওঠেন।[২] রক্ষণশীলতার অন্য নানা কারণের আলোচনা এখানে গ্রন্থ-গৌরব-ভয়ে করা গেল না। কিন্তু সংস্কৃতীকরণ যে তার অন্যতম কারণ, সে-সম্পর্কে সন্দেহ নাই। 'পদ্মলোচন' সম্পর্কে 'হুতোম প্যাঁচা' লিখেছেন: "পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুর মুখোস পরে সংসার রঙ্গভূমিতে নাবলেন,—ব্রাহ্মণের পাধুলো খান, পা চাটেন, দলাদলির ও হিন্দুধর্মের ঘোঁট করেন,...বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ধরে না..."[৩] সংস্কৃতীকরণের অপর একটি ফল বোধহয় বৈঠকী গানের,

১. দ্রষ্টব্য, Milton Singer, *Introduction To The Civilization In India* (Chicago, 1957), 365-380, এখানে কথাটির প্রয়োগ করা হয়েছে ভিন্ন অর্থে।

২. N. N. Ghosh, *op. cit.* ch. IX.

৩. 'সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী', ১, ৮৭

আখড়াই ও টপ্পা গানের প্রচলন। উনবিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে বাংলা গানের বাণী ও সুর বিদগ্ধ হয়ে উঠল। গ্রাম্য আদিরসের "উৎসার"[১] হ্রাস পেতে থাকল। এ-কথাও অনস্বীকার্য যে, শিল্পে সুরুচির সংক্রাম ব্যাপক ছিল না। কবি গান ও পাঁচালীর তুলনায় টপ্পা ও সখীসংবাদ গানে যথেষ্ট বৈদগ্ধ্য ছিল। কিন্তু, টপ্পা গান সবসাধারণের জন্য পরিকল্পিত হয়নি।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কলকাতার নব্য ধনীরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরাজদের সঙ্গে সহযোগিতা করলেও, অন্ততঃ উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতেই সাংস্কৃতিক সংশোধনের আদর্শরূপে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভক্ত হয়ে ওঠেননি। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই সেপ্টেম্বর 'Calcutta Chronicle' পত্রিকায় সুখময় রায়ের বাড়ীতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রিত সাহেবদের গান শোনানো সম্পর্কে লেখা হয়েছিল: "The only novelty that rendered the entertainment different from those of last year was the introduction, or rather the attempt to introduce, some English tunes among the Hindoostanee music."[২] সাহেব শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্যই হিন্দুস্থানি গানে ইংরাজি সুর মেশাবার চেষ্টা করা হয়, প্রচলিত সঙ্গীতে নূতনত্বের আদর্শ সৃষ্টি করবার জন্য নয়। নব্য ধনীদের অন্তর্নিহিত রক্ষণশীলতা, এবং ইংরাজদের "Native" সম্পর্কে ঘৃণা—এই দুই মনোভাবের সংঘর্ষ সাংস্কৃতিক মিশ্রণের অনুকূল ছিল না।

তা-ছাড়া, বিগত নবাবী কৃষ্টির আদর্শ তখন-ও বর্ণাঢ্য এবং উজ্জ্বল। সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে হিন্দু ও মুসলমানি সংস্কৃতি একে অপরের কাছাকাছি সরে এসেছিল। ভারতীয় সাহিত্যে আরব্য-পারস্য ভাবধারার ব্যাপক সঞ্চার-ও তখনি ঘটেছিল। উর্দু ভাষার-ও বিলক্ষণ উন্নতি হয়েছিল তখনি। হিন্দু ও মুসলমানি সঙ্গীতাদর্শের সংমিশ্রণে আঠার শতকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সমৃদ্ধ হয়েছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: আঠার শতকে মধ্য এশিয়ার তুরাণ্ থেকে উত্তর ভারতে নূতন সুরের আমদানী হয়েছিল। গীতপ্রবাহ এসেছিল আরব, ইরাণ্ ও ইয়েমেন থেকে। কৃষ্ণনগরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় দেখা গিয়েছিল আরব্য-ইরাণীয় লোকব্যবহার ও জীবনধারা।[৩] এই

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৬৩), ১৭
২. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ১, ৫১১.
৩. *Muhammad Sahidullah Felicitation Volume*, (Dacca, 1966), 121-139

জীবনধারার মূলোচ্ছেদ করার সময় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে-ও আসেনি।[১]

একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখেছেন : "Apart from Urdu, which is modelled entirely on the Persian tradition, other languages of Muslim India show considerable influence of Persian. Bengali borrowed from it nineteen forms of meter and the Ghazal.[২] তিনি অবশ্য উল্লিখিত ১৯-টি 'meter'-এর বিবরণ দেননি। কবি নজরুল ইসলামের পূর্বে বাংলায় ঠিক্ 'গজল' গান লেখা হয়েছিল কিনা, জানিনা। কিন্তু নিধুবাবুর গানে যে হাফেজ্-এর প্রভাব ছিল, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ তা জোর দিয়েই বলেছেন।[৩]

নিধুবাবুর সময়ে মুসলমানি-কৃষ্টির প্রভাবের আরো প্রমাণ দাখিল করা যায়। রামমোহন রায় সাহেবদের সঙ্গে মিশলে-ও মুসলমান 'Grandee'-র পোষাক পরতেন।[৪] নিধুবাবুর সমসাময়িক বিখ্যাত গায়ক ও গীত-রচয়িতা কালিদাস চট্টোপাধ্যায় পলাশির যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) সাত-আট বৎসর আগে গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি টোলে সংস্কৃত শিখেছিলেন; ফার্সি ভাষাতে-ও ছিলেন বিশেষ ব্যুৎপন্ন, কাশীতে পড়েছিলেন বেদান্ত; লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে শিখেছিলেন উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত। তাঁর চালচলন ও বেশভূষা ছিল মুসলমানি। 'কালী মীর্জা' অথবা 'কালী মজা' নামেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। অথচ, তিনি ছিলেন নির্ভেজাল হিন্দু ব্রাহ্মণ, হিন্দু ব্রাহ্মণের ধর্মীয় কৃত্য তিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করতেন।[৫]

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে-ও এ-ধরনের বাঙালি হিন্দুর অভাব ছিল না; 'হুতোম প্যাঁচা' প্যালানাথবাবুর বর্ণনা করেছেন এ-ভাবে : [চকবাজারের প্যালানাথ-বাবু] বড় হিন্দু; একাদশী-হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোস, উত্থান ও নির্জলা

---

১. David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance* (Calcutta, 1969), Part I, Chapter I—ওয়ারেন হেষ্টিংস্-এর সাংস্কৃতিক নীতি দ্রষ্টব্য।

২. Aziz Ahmad, *Studies in Islamic Culture in the Indian Environment* (Oxford, 1964), 233

৩. 'প্রীতিগীতি', ২৬.

৪. Collet, *Life and Letters of Raja Ram Mohan Roy* (1900), 91

৫. 'বাঙ্গালীর গান', ৩০১

করে থাকেন।·· সৌখীনের রাজা···ইংরেজি কেতা বাবুর ভাল লাগে না; মনে করেন, ইংরেজি লেখাপড়া শেখা শুদ্ধ কাজ চালাবার জন্য; মোসলমান-সহবাসে প্রায় দিবারাত্রি থেকে থেকে ঐ কেতাই এর বড় পছন্দ। সর্ব্বদাই নবাবী আমলের জাক-জমক, নবাবী আমীরী ও নবাবী মেজাজের কথা নিয়ে নাড়া-চাড়া হয়।"[১]

সমাজের প্রায় সর্বস্তরে, কলকাতায়-ত বটেই, বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে-ও, হিন্দু-মুস্লিম সংস্কৃতির মিলন হয়েছিল; মিলন আংশিক হলে-ও, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বাংলাদেশের তথা কলকাতার সাস্কৃতিক জীবনে তার গুরুত্ব কিছু কম ছিল না। একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক লিখেছেন: "It is a strange phenomenon that although the Muslims and Hindus had lived in Bengal for nearly six hundred years, the average people of each community knew so little of the other's history, literature, ideas and traditions."[২] যে-সব তথ্যের ভিত্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সে-গুলি এই: হিন্দু ও মুসলমানদের শিক্ষা-ব্যবস্থা আলাদা ছিল। মুসলমানরা আরবি-ফার্সি সাহিত্য থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করত। অল্পসংখ্যক হিন্দু ফার্সি জানত, খুব কম হিন্দু আরবি শিখেছিল। বাল্যকাল থেকে রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ পাঠ করে হিন্দুদের চিন্তাধারা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করত। রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে, কিংবা পুরাণ সম্পর্কে অধিকাংশ মুসলমানেরই কোন ধারণা ছিল না।[৩] তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, ছয় শতাব্দী ধরে একসঙ্গে থাকার ফলে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় সাধারণ হিন্দু-মুসলমান একে অপরের কাছাকাছি সরে এসেছিল; "...there must have been some assimilation in thought and ideas. Above all, the common subjection to an alien rule awakened a sort of fellow-feeling . All these factors brought about a more harmonious and friendly relation, removed many of the angularities, and to a large extent blunted the

১. 'সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী', ১, ৩১-৩২

২. *British Paramountcy and Indian Renaissance* II, 8

৩. *Ibid*, 7-8, Chapter I.

edge of ill feeling or hostility between the two communities."[১] নিধুবাবুর প্রসঙ্গে এই বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্কবিতর্ক ঠিক্ হবে না। তবে, হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যা তিনি বলেছেন,[২] তার বিপরীত তথ্য কিছু কিছু দেওয়া যায়। রাঢ় অঞ্চলে এ-যুগে, এমনকি, ১২৬৬ বঙ্গাব্দে-ও, একই পাঠশালায়, হিন্দু-মুসলমান বালকগণ একই গুরুমহাশয়ের কাছে একই ধরনের শিক্ষালাভ করত, পঞ্চানন মণ্ডল এই তথ্য আবিষ্কার করেছেন।[৩] Adam-এর প্রতিবেদনে বাংলাদেশের ৫টি জেলায় ২০৯৬ হিন্দু ও ১৫৫৮ জন মুসলমানের উল্লেখ আছে, যাঁরা ফার্সি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; লক্ষণীয়, ফার্সি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনে হিন্দুরাই অগ্রগামী ছিলেন।[৪]

ইংরাজদের সঙ্গে সহযোগের ফলে কলকাতার বনেদি রুচির পরিবর্তন পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। নিধুবাবু শেষ জীবনে কলকাতায় ইংরাজি রীতির ব্যাপক প্রসার দেখেছিলেন। কিন্তু বিগত শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে বাংলা গানের ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে বাংলা মার্গ-সংগীতের ক্ষেত্রে, টপ্পা ও আখড়াই গায়কদের অসাধারণ প্রভাব ছিল।

রাজা রামমোহন রায় নিজেই 'রঙ্গিন গান'-এর একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ নিধুবাবুর কাছে এসেছিলেন,-জয়গোপাল গুপ্তের এই মত ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন: গরাণহাটার আখড়াই দলের স্বরকার গোবিন্দ মালা "রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রহ্ম সভায় ব্রহ্ম সংগীত গান করিত"।[৫] কালী মির্জার জীবনী লেখক অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, রামমোহন কালী মির্জার কাছে গান শিখতেন। শুধু তাই নয়; "মির্জা মহাশয়ের সমীপে সঙ্গীত শিক্ষা সময়ে মহাত্মা রামমোহনের হৃদয়ে অদ্বৈতবাদিতার বীজ প্রথম রোপিত হয়।"[৬]

১. *Ibid*, 7

২. *Ibid*, Chapter I.

৩. পঞ্চানন মণ্ডল 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র', (বিশ্বভারতী. ১৩৭৫), প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ ২২৮-২৩০

৪. K. K. Datta, '*Survey*' 14, 18, Adam's Report, p. 274, সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান লেখক মীরমশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯২০) শৈশবে জগমোহন নন্দীর পাঠশালায় পড়াশুনা করেন। 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা,' ২, ৩১.

৫. 'কবিজীবনী' ১১৩

৬. অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) 'গীতলহরী' (১৯০৪), ১২

কৃষ্ণানন্দ ব্যাস 'সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম'-এ 'রঙ্গিন গান' পর্যায়ে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বহু 'নির্গুণ গান' সঙ্কলিত করেছেন। রামমোহন রচিত গানের সঙ্কলনে ৩১টি প্রচলিত রাগ-রাগিনীর ব্যবহার দেখা যায়। এর মধ্যে অনেকগুলি টপ্পা ও ঠুংরি গানে-ও ব্যবহৃত হোতো।[১] হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরাজিতে কবিতা লিখে খ্যাতি পেয়েছিলেন; কিন্তু তিনি-ও টপ্পার আঙ্গিকে বহু গান লিখেছিলেন। মফঃস্বলে কৃষ্ণনগর অঞ্চলে এ-সময় বাংলাগানের জনপ্রিয়তার কথা লিখেছেন দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়। তিনি নিজে সুমধুর স্বরে টপ্পা গেয়েছেন; তিনি একটি ঘটনা প্রসঙ্গে লিখেছেন: "তৎকালে সেখানে সঙ্গীত হইতেছিল। দুই চারি কথার পর একটি গান গাইতে আমাকে অত্যন্ত ধরিলেন। আমি তাঁহার নির্ব্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া এই গীতটি গাইলাম—

"এমন যে হবে প্রেম যাবে এ কভু মনে ছিল না,
এ চিতে নিশ্চিত ছিল পিরীতে বিচ্ছেদ হবে না"[২]

'দেওয়ানজি'দের বৈঠকখানায় যে 'বৈঠকীগান' হোতো, অমরেন্দ্র নাথ রায়ের-ও তা-ই মত।[৩] গ্রামে এক ধরণের গ্রামীন বনেদিয়ানা প্রচলিত ছিল; নব্যধনীদের অনুপস্থিতিতে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রসার গ্রামাঞ্চলে তখন-ও হয়নি। রাঢ় অঞ্চলে গ্রামের ধনীরা চন্দ্রকোনা ধুতি, তসরের ভুনি, মলমল, জামদানি, দোলাই, পাপোষ, বিনামা, খড়ম, শঙ্খ, বাক, পুটে, বোলাক, মরদানা, তাড়, হাঁসুলি, কানবালা, চুনী, রাঙ্গা লোহা, মল, নোলক, মাদুলি, মুক্তা, ঝুমকা, নৎ, চৌকি, পিড়ি, আড়ানি, সূক্ষ্ম ঝালর দেওয়া মশারি, কুঙ্কুম, ফুলেল" ইত্যাদি ব্যবহার করতেন।[৪] "জলেশ্বরের ধোলাই ধুতি পরিয়া মদিরা সহযোগে খানার শেষে কুরসিতে বসিয়া সালমউতে মাখা তামাক টানিতে টানিতে [গ্রামের ধনীরা] আফিঙ্গের মৌতাতে গুমোট বরষায় ঝিমাইতেছেন,

১. 'সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম' (১২৫২), ৩, ১৪৭-১৫৯

২. 'দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত' (১৩৬৩), ১৪১, দীনবন্ধু মিত্র কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের গান গাওয়া সম্পর্কে 'সুরধুনী কাব্যে' লিখেছেন, "সুমধুর স্বরে গীত কিবা গান তিনি। ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজানবাহিনী।' তদেব, পরিশিষ্ট, ১৯৩।

৩. 'নারায়ণ', (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩), ৮৮৮-৮৯

৪. পঞ্চানন মণ্ডল, 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ ১৯৬৮), ২০০-২০২

এই চিত্র দুর্লভ নহে"।[১] এই বিলম্বিত তালে জীবন যাপনের সঙ্গেই ছিল মধুর ও করুণ বাংলা টপ্পার আত্মিক যোগ। সহুরে ধনীদের মধ্যে-ও মৌতাতের, অভাব ছিলনা, এবং টপ্পা ছিল তার অন্যতম উপকরণ। তা যদি না হোতো, তবে "প্রধান প্রধান লোকেরা" বটতলার আটচালা ঘরে এসে নিধুবাবুর গান শুনতেন না।[২]

কিন্তু, ইংরাজদের সহযোগী, এবং ইংরাজি জানা সহুরে ধনীরা উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই বোধ হয় ইউরোপিয় শিল্পের ভক্ত হয়েছিলেন। বিশপ্ হেবারের 'Narrative'-এ দেখা যাচ্ছে এই কথা: "At present there is an obvious and increasing disposition [of the Indians] to imitate the English in everything." বাঙালি ধনীদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "None of them adopt our dress.. But their houses are adorned with verandahs and Corinthian pillars, they have very handsome carriages often built in England; they speak tolerable English, and they shew a considerable liking for European Society...". হরিমোহন ঠাকুরের বাগানবাড়ী যে 'ভিলা'-র ঢং-এ সজ্জিত ছিল, তা-ও তিনি লিখেছেন।[৩] যে-রামমোহনের বাড়ীতে শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস্ 'নিকি' নামক নর্তকীর বাই-নাচ দেখেছিলেন, তাঁর বাড়ীতে-ও আসববাবপত্র ইউরোপীয় ঢং-এ সাজানো ছিল।[৪] পূর্বে উল্লিখিত 'সংস্কৃতীকরণপ্রক্রিয়া'-র এই এক নবরূপ। Heber-এর সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই বাঙালি বড় মানুষের বাগানে ও বাগানবাড়ীতে ইউরোপীয় রীতিতে খোদাই করা মার্বেলের পরী ও ক্যুপিড (cupid), দেয়ালে ইউরোপীয় ষ্টাইলে আঁকা ছবি, ও মেঝেতে ইটালিয়ান্ মোজাইক্ সজ্জিত হতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষ-বৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণ-কান্তের উইল' উপন্যাসদুটিতে, যথাক্রমে সূর্যমুখীর শয়নগৃহের দেয়াল ছবির বর্ণনায় এবং গোবিন্দলালের 'বারুণী'-র পারে বাগানে 'অর্ধাবৃতা পাষাণময়ী

১. তদেব, ২০১

২. 'কবিজীবনী', ১০৬

৩. R. Heber, '*Narrative of Journey Through The Upper Provinces of India etc.*' (London, 1828), II, 232, 234, 252.

৪. বিনয় ঘোষ, 'সুতানুটি সমাচার' (১৯৬২), ৩৩৫ ৩৩৭.

স্ত্রীমূর্তি'-র উল্লেখে, গ্রামের জমিদারদের দেশী-বিদেশী আর্ট-এর প্রতি মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।[১] ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি ডিরোজিও-র ছাত্রদের আনুগত্য কিছু সময়ের জন্য প্রচলিত বাঙালি জীবনধারা থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ সম্পর্কে পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য। নূতন শিল্পরুচিবোধের অভ্যুদয় নিধুবাবুর টপ্পা ও আখড়াই গানের প্রাধান্য নষ্ট করে দিয়েছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পরে 'আখডাই' সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয়। নিধুবাবুর প্রিয়শিষ্য মোহনচাঁদ বসু কবিগান আর আখডাইগানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে 'হাফ আখডাই' গান সৃষ্টি করেছিলেন। টপ্পায়, রাজ্যেশ্বর মিত্রের মতে, খেম্‌টার অনুপ্রবেশ ঘটে।[২] দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় নিজে যথেষ্ট নামকরা গায়ক ছিলেন। তিনি তার যৌবনকালে প্রচলিত বাংলা প্রণয় সঙ্গীত সম্পর্কে লিখেছেন: "...পবিত্র প্রণয় রসাত্মক গান অত্যল্প শুনা যাইত। তদানীন্তন আদিরসাত্মক গীতির মধ্যে অধিকাংশ গাইতে লজ্জাবোধ হইত। তখন দম্পতি-প্রণয় প্রণয়-মধ্যেই পরিগণিত ছিল না। সুতরাং সুরসিক রচয়িতাগণও অপবিত্র প্রণয় প্রসঙ্গে গান রচনা করিতেন।"[৩] এ-ঘটনা আনুমানিক ১২৫০ বঙ্গাব্দের ঘটনা। তখন তাঁর বয়স ২৩ বছর। বলা বাহুল্য, 'বাইনাচ'-এর জনপ্রিয়তা কমে নি। পাঁচালী, ঢপ, কবির লডাই, যাত্রা, তর্জা, জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

১. 'বঙ্কিমরচনাবলী' (সাহিত্য সংসদ, ১৩৬০) ১, ৩৩২ ৩৩, ৫৬৩ ৬৪

২. রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'বাংলার গীতকার', ১৩০-৩১

৩. 'দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত', ১৮৭-৮৮

॥ পক্ষীর দল ॥

নন্দরাম সেন স্ট্রিটের বাড়ী থেকে নিধুবাবু 'প্রতিদিবস রজনীতে' শোভাবাজারের বটতলা সংলগ্ন একটি "প্রসিদ্ধ আট চালা ঘরে" গিয়ে বৈঠক ন। এই আটচালা ঘরটির প্রকৃত মালিক ছিলেন মারকিন্ জাহাজি ম্পানির মুৎসুদ্দি বাবু রামচন্দ্র মিত্র এবং তাঁর পুত্র জয়চন্দ্র অথবা জয় মিত্র।[১]

ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন: "বাবু নারায়ণ মিশ্র মহাশয় পক্ষির দল করিয়া উক্ত প্রসিদ্ধ আটচালায় সর্বদাই উল্লাস করিতেন।...পাখীর দলেরা নিধুবাবুকে কর্তা বলিয়া অত্যন্ত মান্য করিত।"[২] পক্ষীর দলের সভ্যগণ "গাঁজার গুণানুসারে নাম পাইতেন। তাবতেই বাসা বাঁধিতেন, কুটা বহিতেন, ডিম পারিতেন, আধার খাইতেন, ও বুলি ঝাড়িতেন"।[৩] ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর রচনায় পক্ষীর বুলির নমুনা দিয়েছেন:

"ভিখিন্ কিটি কিটি, কিস্ কিসিন্"

... ...

"কিচি মিচি কিচি, কিচিন কিন্"

... .

"ছোট বিলের পাখি মোরা, বড় বিলের কে।
উড়িতে না পেরে পাখি পোষ মেনেছে।"
কুকু, গাং সালিকে, কু, গঙ্গা বিসং"। ইত্যাদি।[৪]

নিধুবাবু গঞ্জিকা সেবন করতেন, এ-সংবাদ যখন কোথাও নেই, তখন এদের সঙ্গে নিধুবাবুর যোগাযোগের কারণ কি?

পক্ষীর দলের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের পারিষদ শিবচন্দ্র ঠাকুর।[৫] ছাপরা থেকে যখন নিধুবাবু কলকাতায় ফিরে এলেন,

১ 'কবি জীবনী', ১০৫; 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়', ৪৪৭.

২. তদেব, ১০৫. হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'কলিকাতা, সেকালের ও একালের' (কলিকাতা, ১৯১৫), ২৭২ ২৭৩

৩ তদেব, ১০৫.

৪. তদেব, ১০৫ ১০৬.

৫. 'সৎ সাহিত্য গ্রন্থাবলী,' ১, ৪৪, অনাথকৃষ্ণ দেব, 'বঙ্গের কবিতা' ১, ৩২৫.

তখন শোভাবাজারের পক্ষীর দলের নেতা ছিলেন নারায়ণ মিশ্র। তিনি ছিলেন অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ, এবং গঙ্গাতীরবর্তী 'অনন্দময়ী কালীমন্দিরের মালিক; বাড়ী ছিল নিমতলা অঞ্চলে।[১]

রামতনু লাহিড়ীর ছাত্রাবস্থায় বাগবাজার, বটতলা, ও বৌ-বাজারে তিনটি পক্ষীর দল ছিল। বাগবাজারেব দল সম্পর্কে হুতোমপ্যাচা লিখেছেন, "শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়...বাগবাজারেদের উড়তে শেখান।...তাদের একখানি পব্লিক আটচালা ছিলো, সেইখানে এসে পাকি হতেন, বুলি ঝাড়তেন ও উড়তেন..."[২] হুতোমপ্যাচা "পব্লিক্ আটচালা" বলতে কি শোভাবাজারের আটচালা বোঝাচ্ছেন? না-কি, বাগবাজারে-ও ঐ-রকম একটি আটচালা ঘর ছিল?

পক্ষীর দলের ইতিহাস ও কার্যকলাপ ভালো ভাবে জানলে-ও ঈশ্বরগুপ্ত এ-বিষয়ে বিশেষ কিছুই লেখেননি।[৩] পক্ষীর দলের ভদ্র যুবকদের বর্ণনা করতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী 'নিষ্কর্মা' বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন।[৪] ঈশ্বর গুপ্ত তাঁদের 'ভদ্র সন্তান, ও বাবু এবং সৌখিন্ নামধারি সুখি" রূপে বর্ণনা করেছেন। জয়গোপাল গুপ্ত লিখেছেন, তাঁরা ছিলেন "উপস্থিত বক্তা, উপস্থিত কবি।" জয়গোপাল গুপ্তের মতে এঁরা গাঁজা খেতেন না; তিনি এঁদের গাঁজা খাওয়ার উল্লেখ করেননি। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্ত ও শিবনাথ শাস্ত্রী এঁদের গঞ্জিকা সেবনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ঈশ্বরগুপ্ত অবশ্য এক জায়গায় পক্ষীর দলের সভ্যদের "নৃত্যগীত ও আমোদ-প্রমোদ"-এর উল্লেখ করেছেন।[৫]

'সোম প্রকাশ' পত্রিকায় বিখ্যাত রূপচাঁদ পক্ষীর যে-জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে ঈশ্বরগুপ্ত ও জয়গোপাল গুপ্তের বক্তব্য সমর্থিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র,' চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩১২, ৬২২, ৭৫৫, ৮৪১—৪৬; ১০২৬) ১২২১ সালে 'বউবাজার' মলঙ্গা-য় তাঁর জন্ম হয়। ১২৯৩ সালে-ও তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁকে

১, 'কবিজীবনী', ১০৫, 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়', ২০৮-২০৯.

২. সৎ সাহিত্য গ্রন্থাবলী,' ১, ৪৪.

৩. 'কবিজীবনী', ১০৬

৪. 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ', (নিউ এজ, ২ সং, ১৯৫৭), ৫৬

৫. 'কবিজীবনী', ১০৫; ১৩১; 'গীতরত্ন' (১২৭৫)' ৸০

'পক্ষিরাজ' উপাধি দিয়েছিলেন রাজা বৈদ্যনাথ রায়, সাতুবাবু, ব্রজমোহন সিংহ, নিধুবাবু, কাশীনাথ মল্লিক, রমানাথ ঠাকুর, নীলরতন হালদার, মোহনচাঁদ বসু ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর ২১১-টি গানের সংকলন 'সঙ্গীত-রসকল্লোল' সোম-প্রকাশে ছাপা হয়।[১] সুশীলকুমার দে-র মতে রূপচাঁদের পক্ষীর দল 'বৈঠকী গান' করত।[২] এখানে উল্লেখ করা দরকার, 'পক্ষীর জাতিমালা' নাম দিয়ে রূপচাঁদ যে-দল করেন তা ছিল সখের পাঁচালীর দল।

রূপচাঁদ রচিত ব্রজভাষায় ও বাংলা ভাষায় পাঁচটি পক্ষী-গীত 'সংগীত-রস-কল্লোল'-এ সঙ্কলিত হয়েছে।[৩] সে-সব গানে নানারূপ পাখীর নাম থাকলেও পক্ষীর বুলি নেই। পক্ষীর জাতি বর্ণনায় তিনি হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বর্ণের প্রসঙ্গ তুলেছেন।[৪] তিনি অনেক গানে 'ইয়ং বেঙ্গল'-কে সমালোচনা করেছেন।[৫]

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সঙ্গীত কোষ'-এ "পক্ষীগীত" নাম দিয়ে ৫০টি গান সঙ্কলিত হয়েছে।[৬] এই গানগুলিতে বর্ণিত হয়েছে প্রায় ৫০ রকম পাখীর রূপ ও হাবভাব। গানগুলি লিখেছেন "কালীপদ" নামক কবি।[৭] "কালীপদ" রচিত দুটি গান উদ্ধৃত করা যাক্।

১. বেহাগ। আদ্ধা। (চড়ুই পাখী)

দূর সমীরে উড়ি।
নিজ সুখে নিজে বিহরি।
প্রেমে নাহি মানি ভয়, সাধে সতত উদয়।
প্রাণে প্রাণে প্রাণ বিনিময়।
লোক লাজ কভু না করি।
পঞ্চশর সদা স্মরি, নাহি প্রণয়ে চাতুরি।
পোড়া লোকে নাহি বুঝে, পারি কি হারি।[৮]

১. 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র,' ৪, ৮৪৬-৯৬৪.
২. S. K. De, *op. cit.* 347, *fn*, 'কবিজীবনী,' ৪০২.
৩. 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৪, ১৮৭, ১৮৮—১৯৩ সংখ্যক গীত, পৃষ্ঠা ৯৩৭-৯৪২
৪. তদেব, ৯৩৮, পৃ. ১৮৯ সংখ্যক গীত, 'সম্পাতি পক্ষিজাতি গীতিবর্ণন'।
৫. তদেব, গীতসংখ্যা, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩. ২০৬, পৃষ্ঠা ৯৫২-৯৬১
৬. 'সঙ্গীত কোষ' (১৩০৬), পৃষ্ঠা, ১২০১-১২০৯, ১২২৯-১২৩৬
৭. তদেব, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৮. 'সঙ্গীত কোষ', ১২০৩।

২. সুর—কীর্তন। (চাতক)

চাহি মুখপানে, তৃষিত নয়নে, নিজগুণে রাখ প্রাণ।
বিষম পিয়াসা, নাহি পূরে আশা, সহে রহে দহে, সদা অভিমান॥
তোমা ছাড়া নই, তোমা ছাড়া রই, নিজ দোষে সই, যতই যাতনা—
তুমি কৃপাসিন্ধু, ওহে জগবন্ধু, কর কৃপাবারি বিন্দু দান॥[১]

রূপচাঁদ পক্ষী ও "কালীপদ" সম্ভবতঃ কোনো বিশেষ কাব্য-ঐতিহ্যের শেষ প্রতিনিধি। কথিত আছে, পক্ষীর দলের সভ্যরা গাঁজা খেতেন। কিন্তু তাঁরা কবিতা লিখতেন, গান গাইতেন, একথা-ও তো সত্যি। আদি পক্ষীর দলে নিধুবাবুর একটা স্থান ছিল। বরদাপ্রসাদ দে লিখেছেন, নিধুবাবু যুবকদের নিয়ে একটি গানের ক্লাব গড়ে তুলেছিলেন।[২] বোধ হয় বটতলার আটচালা ঘরে বহু যুবক 'পক্ষী' তাঁর কাছে গান শিখেছিল।

"পক্ষীর দল"-এর কবিদের কাব্যাদর্শ ইউরোপ থেকে আসেনি; এসেছে সংস্কৃত, আরবা ও ফার্সি সাহিত্য থেকে। এখানে বলে নেওয়া উচিত,—আদি পক্ষীর দলের কবিতাবলী এখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত, তাই সেই কবিতার ওপর আরবি-ফার্সি প্রভাবের গভীরতা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "Muslim Bengali or Muslim Hindustani Literature had a fuller development in the 18th century.… In this way, we have a permanent place for a new subject-matter in Indian Literature, namely, the matter of Islam,… of Persia and Arabia".[৩]

বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত 'সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার' গ্রন্থে পক্ষী-বিষয়ক বহু শ্লোক সঙ্কলিত হয়েছে। 'জাতিবর্ণন' অধ্যায়ে আছে ময়ূর, চাতক, পারাবত, বক ও কুক্কুট সম্পর্কে শ্লোক-সংগ্রহ। 'অন্যোক্তি প্রকরণ'-এ হংস, মধুকর, কোকিল, চাতক, ময়ূর, চক্রবাক, শুক, কাক, বক, বৃক ও খদ্যোত সম্পর্কে বহু শ্লোক আছে।[৪] পক্ষী-বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোকের তিনটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

১. তদেব। ১২৩২।
২. J. B. A. L. I. No. 6. P. 5.
৩. *Sahidullah Felicitation Volume*, 127-28.
৪. 'সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার', ২০৭-২০৮, ২২১-২২৯

১. বাতান্দোলিতপঙ্কজস্থিতরজঃপুঞ্জাঙ্গরাগোজ্জ্বলো
যঃ শৃণ্বন্ কলকূজিতং মধুলিহাং সংজাতহর্ষঃ পুরা।
কান্তাচঞ্চুপুটাপবর্জিতবিসগ্রাসগ্রহেঽপ্যক্ষমঃ
সোঽয়ং সংপ্রতি হংসকো মরুগতঃ কৌপং পয়ো যাচতে।[১]

পঙ্কজ পুষ্প বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে ; তার রেণুকণা হাওয়ায় উড়ে এসে হংসের অঙ্গরাগ উজ্জ্বল করে তুলেছে। মধুকরের কলগুঞ্জনে হংসের হর্ষ সংজাত হচ্ছে। কান্তার চঞ্চুপুট থেকে স্খলিত মৃণালকাণ্ড গ্রহণেও সে অক্ষম! কিন্তু এ-সব পুরানো কথা! এখন সেই হাঁস মরুভূমিতে এসে পড়ে কূয়োর জল চেয়ে চেয়ে ঘুরছে।

২. ইহ রূপমাত্রসারে চিত্রগতে কনককল্হারে।
ন রসো, নাপি চ গন্ধো মধুকর বন্ধো মুধা ভ্রমসি॥

ছবির মত সুন্দর, রূপ-সর্বস্ব এই কনক-কল্হারে (সোনার কুমুদে) না আছে রস, না আছে গন্ধ! হে বন্ধু মধুকর! বৃথাই এর কাছাকাছি ঘুরছ![২]

৩. অস্যাং সখে বধির লোক নিবাসভূমৌ কিং কূজিতেন খলু কোকিল কোমলেন।
এতে হি দৈবহতকাস্তদভিন্নবর্ণং ত্বাং কাকমেব কলয়ন্তি কলানভিজ্ঞাঃ॥[৩]

সখে! এখানে সব কালা লোক থাকে। এখানে তোমার কোমল কূজনের কি প্রয়োজন? এই সব বধির লোক তোমার রং কালো দেখে তোমাকে কাক বলেই গণ্য করছে। এদের ত আর কলা সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই!

সংস্কৃত শ্লোকগুলি দ্ব্যর্থবোধক ; কবিরাই বক্তা। অন্যোক্তি প্রকরণের ২৩৯টি পক্ষী-বিষয়ক শ্লোকের অধিকাংশই স্পষ্টার্থ, ও নিগূঢ়ার্থ-সম্পন্ন।

Powys Mathers-এর 'আলিফ্ লায়লা'র ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থের চতুর্থ

---

১. তদেব, ২২১ (২৭)

২. তদেব, ২২২ (৫৪)

৩. তদেব, ২২৫ (১৩২)

খণ্ডে একটি মনোরম কাহিনীতে পক্ষী-বিষয়ক ৮-টি সুন্দর কবিতা আছে।[১] কাহিনীর নায়িকা 'তুফা' (আমরা বাংলায় বলি, তোফা) নামে একটি সুন্দরী ক্রীতদাসী। 'তুফা', সোয়ালো পাখী, প্যাঁচা, ফাল্‌কন্‌, রাজহংস, মধুকর, পতঙ্গ, কাক ও হুপী পাখীদের কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছে ভূতের রাজাকে। 'তুফা'-র একটি কবিতা :

The Song of the Bee

I build my house within the hill,
And, in my feeding, do no ill
Upon the flowers I fasten to
For forage lighter than the dew.
When, with my harmless theft content,
And mind on meditation bent,
I go to my abiding place
And brood on bees' predestined grace,
My eye is met at every turn
By works where Euclid deigned to learn.
Of all my musings this is chief :
That toil can be both joy and grief ,
For, if my wax is fruit of pain,
Honey is Learning's golden gain.
And next I ponder how my sting
Teaches the whole of love making :[২]
... ...

ফার্সিতে পক্ষী-বিষয়ক কবিতা ছিল কিনা, জানা নেই। মনে হয়, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীচরণ মুন্সী রচিত 'তোতা ইতিহাস' জাতীয় ফার্সি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের প্রভাব পক্ষী-কবিদের ওপর ছিল। সংস্কৃত কবিতায় কবিরাই বক্তা। 'আলিফ্ লায়লা'র কবিতায় কিন্তু পাখীরাই নিজেদের কথা বলেছে। রূপচাঁদ পক্ষী ও 'কালীপদ' রচিত 'পক্ষীগীত'-এ পাখীদের নিজস্ব চাওয়া-পাওয়ার বর্ণনা আছে। তাই মনে হয়, পক্ষীর দলের কবিরা সংস্কৃত আঙ্গিক

১. P. Mathers, *The Book of The Thousand Night and One Night* (London, 1956), 4, 430-473.
২. *Ibid*, 462-463.

গ্রহণ না করে এই ধরণের কবিতায় মধ্য-প্রাচ্যের আঙ্গিক অবলম্বন করেছিলেন। 'তুতিনামা'র কথা পরে আলোচনা করা যাবে। লক্ষণীয়, পক্ষী-গীত নেহাৎ প্রেমের গান নয়। সংস্কৃত, আরবি ও বাংলা পক্ষী-গীতে সামাজিক প্রসঙ্গের অভাব নেই। রূপচাঁদ রচিত 'সম্পাতি পক্ষিজাতি গীতিবর্ণন'-এর উল্লেখ আগেই করেছি। 'কালীপদ'-র গানেও সামাজিক বিষয় আছে, যথা:

মাছরাঙ্গা

লুম্-মিশ্র।

মিছে কিনেছি বদনাম।
সবাই গেল সাধু হয়ে পড়ে রইনু হাম্॥
একাজ করে সব শালা,
কারোর হয়নিকো জ্বালা,
প্রেমের ঘোরে অন্ধকারে হলেম বেতালা॥
ফেল্লি একা,...ব্যাধের করে
বিধি! তোকে দিই সেলাম॥[১]

গানের বিষয়বস্তু মাছরাঙ্গা-ও হতে পারে, আবার "ডুবে ডুবে জল খাওয়া", এবং পরে ধরা পড়ে খেদ প্রকাশ-ও হতে পারে।

---

১. 'সঙ্গীতকোষ', (১৩০৬), ১২০৮

॥ আখড়াই গান ॥

১২১১ কিংবা ১২১২-১৩ বঙ্গাব্দে নিধুবাবু কলকাতায় দুটি "সংশোধিত" আখড়াই দল গড়েছিলেন। তিনি ছিলেন আখড়াই গানের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

কবিগান, হাফ আখড়াই ও আখড়াই এক জিনিস নয়। মনোমোহন বসু এই পার্থক্য সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। 'হুতোম প্যাচা' হাফ আখড়াই-এর আঙ্গিক সম্পর্কে যত গভীর ভাবে অবহিত ছিলেন, আখড়াই সম্পর্কে ততটা ছিলেন না। তিনি হাফ আখড়াই, "ফুল আখড়াই" ও কবিগান এক শ্রেণীতে রেখে বিচার করেছেন।[১] এই সব বিভিন্ন ধরনের গানের মধ্যে পার্থক্য বিচার না করে দুর্নীতির দায়ে এদের অভিযুক্ত করা শেষ পর্যন্ত একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আখড়াই গানের উৎপত্তি কবে এবং কি-ভাবে হয়েছিল, সে-সম্বন্ধে কেউ নিঃসন্দেহ নন। বৈষ্ণবচরণ বসাক লিখেছেন: "ক্রমে কবির অনুকরণে আখড়াই গানের সৃষ্টি হয়।"[২] হুতোম প্যাচার মতে নবাবী আমলের শেষে, ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে, হাফ আখড়াই ও "ফুল আখড়াই"-এর উৎপত্তি হয়।[৩] ঈশ্বর গুপ্তের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শান্তিপুরে আখড়াই গান প্রথম গাওয়া হয়।[৪]

আখড়াই গানের উৎপত্তি প্রসঙ্গে গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য 'হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস' (কলিকাতা, ১৩৩২)—গ্রন্থে নিজস্ব মত প্রকাশ করেছেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দে-ও তিনি জোড়াসাঁকোর হাফ আখড়াই দলে 'রসরাজ' অমৃতলাল বসুর সঙ্গে গান লিখেছেন।[৫] কাজেই "দলের লোক" হিসেবে তাঁর কথার কিছু মূল্য আছে। কিন্তু তাঁর ভাষা ও তথ্যবিচার, তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে পাঠকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। জোড়াসাঁকোর আখড়াই

১. 'সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী', ১, ২৯-৩০
২. 'গীতাবলী', ৫
৩. 'সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী', ১, ২৯-৩০
৪. 'কবিজীবনী', ১২৭
৫. 'হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস', ৫২-১১৭

ও হাফ-আখড়াই দল যে চিরকাল অপরাজেয় ছিল,– এটাই তাঁর প্রধান বক্তব্য। নিধুবাবুকে তিনি প্রাধান্য দেননি। তাঁর মতে, জোড়াসাঁকোর দলনেতা রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় (মৃত্যুকাল, ১২৬৯ বঙ্গাব্দ [১]) নিধুবাবুর চেয়ে উঁচুদরের সঙ্গীত-শিল্পী ছিলেন। অথচ, 'গীতরত্নমালা'-র প্রথমভাগে রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় রচিত যে-তিনটি গান আছে, তাতে রচনার সৌন্দর্য ও অভিনবত্বের অভাব দেখা যায়।[২] "এই ইতিহাস কতদূর নির্ভরযোগ্য, সন্দেহ আছে"[৩]— ভবতোষ দত্তের এই মূল্যায়ন মেনে নিয়ে গঙ্গাচরণ-কৃত ইতিহাসের কিছু কিছু তথ্য এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা যাক্।

গঙ্গাচরণের মতে আখড়াই গান "হরিদাস ঠাকুরের প্রথম কীর্ত্তি"।[৪] এই হরিদাস ঠাকুর কে? হরিদাস ঠাকুরের পরিচয় প্রসঙ্গে গঙ্গাচরণ প্রথমেই লিখেছেন: হরিদাস ঠাকুর ও নিত্যানন্দকণ্ঠী "ভাটপাড়া-কলাগাছি গ্রামে" "কৃষ্ণলীলার কঠিন কঠিন প্রশ্ন ও উত্তর"মূলক—আখড়াই গানের অনুষ্ঠান করেন।[৫] হরিদাস ঠাকুর সম্পর্কে গঙ্গাচরণের বিবরণ কাল্পনিক বলে মনে হয়। হরিদাস ঠাকুরের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীর পূর্ণ ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন সতীশচন্দ্র মিত্র. তাঁর 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডে।[৬] খুলনা জেলায় "ভাটলা-কলাগাছি" গ্রামে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। জয়ানন্দ রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' থেকে দু'ছত্র বাংলা শ্লোকের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন: "ভাট্‌লার পার্শ্ববর্ত্তী কলাগাছি গ্রামে হরিদাসের জন্ম হইয়াছিল।" (৩৯৯ পৃষ্ঠা) এ-জায়গার সঙ্গে গঙ্গাচরণ উল্লিখিত "ভাটপাড়া-কলাগাছি"র কোন যোগ নেই। আরো দু'জন হরিদাস 'কীর্ত্তনিয়া' রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ভাটলা-কলাগাছির হরিদাস 'যবন হরিদাস' অথবা 'ব্রহ্ম হরিদাস' নামে বিখ্যাত হন। কিন্তু 'যবন' হরিদাসই হরিদাসঠাকুর নামে বৈষ্ণব-সাহিত্যে পরিচিত।[৭] 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থে হরিদাস ঠাকুরের ফুলিয়া গ্রামে

১. তদেব, ২০
২. 'গীতরত্নমালা', ১, ৪৯৭, ৫১৪, ৫২৬ ; 'বাঙ্গালীর গান', ৮৭৩
৩. 'কবিজীবনী', ২৯ পাদটীকা।
৪. গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য, 'হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস', ১
৫. তদেব। ১ ; প্রথম অনুষ্ঠানের তারিখ, গঙ্গাচরণের মতে, "৮৭১ সাল"
৬. সতীশচন্দ্র মিত্র, 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' (১৯৬৩', প্রথম খণ্ড, ৩৯৯-৪১১
৭. তদেব, ৩৯৮

যাওয়ার উল্লেখ আছে।[১] গঙ্গাচরণ এ-ঘটনার উল্লেখ করেছেন।[২] হরিদাস দাস 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে যবন হরিদাস ছাড়া (১) নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হরিদাস, (২) উৎকলীয় গৌরভক্ত হরিদাস, (৩) শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য হরিদাস, (৪) কীর্ত্তনীয়া হরিদাস ('পদকল্পতরু'-তে তাঁর ছ'টি পদ আছে), (৫) গৌর পার্ষদ বড় ও ছোট হরিদাস, (৬) হরিদাস আচার্য, (৭) দ্বিজ বলরাম দাসের বংশধর হরিদাস গোস্বামী, (৮) হরিদাস পণ্ডিত, (৯) হরিদাস ব্রহ্মচারী, (১০) হরিদাস বৈরাগী, (১১) হরিদাস শিরোমণি ও (১২) হরিদাস স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করেছেন।[৩] এঁরা আখড়াই গানের সূত্রপাত করেছেন—এমন কোনো তথ্য এই চরিতাভিধানে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

অথচ, গঙ্গাচরণ সুনিশ্চিত ভাবেই লিখেছেন যে, ভাটপাড়া-কলাগাছি গ্রামে হরিদাসঠাকুর ও নিত্যানন্দকণ্ঠীর উদ্যোগে বৈষ্ণব আখড়াগুলিতে কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক আখড়াই গান হতে থাকে।

'আখড়া শব্দটির আভিধানিক অর্থ,—"বিঃ (ব্যায়াম গীতবাদ্য প্রভৃতির) অনুশীলনের স্থান; সন্ন্যাসীদের (বিশেষতঃ বৈষ্ণব বৈরাগীদের) আশ্রম; আড্ডা। [সংস্কৃত, অক্ষবাট, হিন্দী, আখাড়া][৪]। মনোমোহন বসু লিখেছেন: আখড়াই গান সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য "ভাল ভাল গায়ক···এক বৎসর ধরিয়া **নিয়ত আখড়া দিয়া আসিতেন**, তবে আসরে নামিতেন, তাহাও দুই তিনবার গুপ্ত পরীক্ষার পর।"[৫] মনোমোহন অনুশীলনের অর্থে 'আখড়া' কথাটি ব্যবহার করেছেন। হয়তো, যেমন এখনও কলকাতার গোয়াবাগানে প্রসিদ্ধ বলী গোবর বাবুর 'আখড়া'য় ব্যায়ামের অনুশীলন হয়, তেমনি সে-কালেও বড় বড় ওস্তাদ গায়কগণ বিশেষ এক ধরণের গানের অভ্যাসের জন্য "আখড়া" পরিচালনা করতেন; সে-সব 'আখড়া'য় যে-গান উদ্ভাবিত ও গীত হ'ত, তার নাম "আখড়াই গান"। এই জন্যই মনোমোহন বসু "একবৎসর ধরিয়া নিয়মিত আখড়া" দেওয়ার কথা লিখেছেন।

১. হরিদাস দাস, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' (১ম সং) ২, ১৪০৯
২. গঙ্গাচরণ, ৮
৩. 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' ২, ১৪০৮-১৪১১
৪. 'সংসদ বাংলা অভিধান' [দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৬৪], ৭১
৫. 'মনোমোহন গীতাবলী' ।/০

গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্যের ভাষায়, হরিদাস ঠাকুর "শান্তিপুরে ও ফুলিয়ায় দুইটি সঙ্গীত সংগ্রামের আখড়া বসাইয়া দেন"। তার ফলে শান্তিপুরে ও ফুলিয়ায় পাড়ায় পাড়ায় আখড়াই গান হয়েছে। কিন্তু "কাল-স্রোতের কৌটিল্যে ও রুচির পরিবর্ত্তনে ঐ আখড়াই সঙ্গীত—সংগ্রাম স্বভাব-কবিদিগের আজীব্য হইয়া দাঁড়াইল"। আখড়াই গান থেকে কবিগান হল। কবিগানের অনুকরণে "সাধারণ অশিক্ষিত স্বভাবকবি মুসলমানগণ আবার একটা নূতন করিয়া বসিল; তাহার নাম তর্জ্জার লড়াই"। এখানেই শেষ নয়। "উক্ত তিন প্রকারের (অর্থাৎ আখড়াই, কবি ও তর্জ্জার) ছায়া মাত্র অবলম্বন করিয়া শিক্ষিত ভদ্রবংশীয় যুবক ও প্রৌঢ়গণ" কৃষ্ণলীলার প্রাধান্য কমিয়ে "তাল মান লয়াদি" নিয়ে মেতে উঠলেন।[১] কালক্রমে শান্তিপুরের তালমানলয় বিশিষ্ট আখড়াই সপ্তগ্রামে প্রচলিত হল। "ভাগীরথীর দেহ ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সপ্তগ্রাম হইতে বাণিজ্যকেন্দ্র হুগুলী-চুঁচুড়াতে সরিয়া আসিল··· আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রাম ধনীর সেবনীয় হইয়া চুঁচুড়ায় আসিয়া আসন পাতিল। ভাগীরথী তথায়ও ক্ষীণ হওয়াতে বাণিজ্যকেন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া আসিবার কালে সহচর সঙ্গীত সংগ্রামাদিও কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল।"[২]

ঈশ্বরগুপ্তের 'কবিজীবনী'-তে আংশিকভাবে গঙ্গাচরণের বক্তব্য সমর্থিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন: "সর্ব্বাগ্রে শান্তিপুরস্থ ভদ্রসন্তানেরা আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন, ইহা প্রায় ১৫০ শত বৎসরের ন্যূন নহে।"[৩] শান্তিপুরে খেঁউড় আর প্রভাতী গান ছিল আখড়াই-এর মৌল উপাদান। ভারতচন্দ্রের সময় শান্তিপুরের খেঁউড় ছিল বিখ্যাত। স্বদেশের জন্য অস্থিরচিত্ত সুন্দরকে বিদ্যা বলেছিলেন: "নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব। নূতন নূতন ঠাটে খেড়ু শুনাইব॥"[৪] ঈশ্বর গুপ্ত শান্তিপুরের খেঁউড় সম্পর্কে লিখেছেন: "সেই সকল গীতে "ননদী এবং দেওরা" এই শব্দ উল্লেখ থাকিত, এবং রচকেরা অতিশয় অশ্রাব্য কদর্য্য বাক্যে গীত সমুদয় রচনা করিতেন·· তচ্ছ্রবণে শান্তিপুরের স্ত্রী-পুরুষ মাত্রেই অশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন।"[৫]

১. 'গঙ্গাচরণ' ৮
২. 'তদেব', ৮
৩. 'কবিজীবনী', ১২৭
৪. 'বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী' (বসুমতী); ৬৬
৫. 'কবিজীবনী', ১২৭

শান্তিপুরের আখড়াই গানে "যন্ত্রের বিশেষ বাহুল্য এবং সুরের তাদৃশ পারিপাট্য ও আধিক্য ছিল না।"[১] কলকাতায় ও চুচুঁড়ায় আখড়াই গানের প্রায় পুনর্জন্ম হয়। আগে কলকাতা-সংস্কৃতির 'Sanskritization" প্রক্রিয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে। চুঁচুড়ায় এবং বিশেষভাবে কলকাতায় 'সংস্কৃতীকরণ'-এর ফলে আখড়াই গানে সুর ও বাদ্যের 'সুশৃংখল' মিলন সাধিত হয়। গানের প্রারম্ভে ভক্তিভাবাপন্ন "ভবানীবিষয়" গাওয়া হতে থাকে। "ইতর শব্দ" পরিত্যক্ত হয়। "সরল সাধুভাষায়" গান রচিত হয়। নিধুবাবুর "প্রভাতী" গানে-ও "দেওরা" কথা আছে। কিন্তু কোথাও "ইতর" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না।[২]

বড়বাজারে "কাশীনাথ বাবুর ফুলবাগানে"[৩] চুঁচুড়া ও কলকাতার আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রাম হতো। চুঁচুড়ার সঙ্গে এ-সময় বারোয়ারী দুর্গাপূজা নিয়েও কলিকাতার প্রতিযোগিতা হয়েছে[৪]। আখড়াই গানে চুঁচুড়ার দল ২২ রকম বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করত। তাদের মধ্যে হাঁড়ী-কলসী পর্যন্ত বাজান হত।[৫]

কিন্তু শীঘ্রই আখড়াই গানে কলকাতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। পেশাদার গায়ক বৈষ্ণব দাস "দৌড", "সবদৌড", "দোলন", "পিডেবন্দি", "মোড" প্রভৃতি নূতন নূতন তাল আবিষ্কার করেছিলেন। রামজয় সেন এই সব তালের অনেক উন্নতি করেছিলেন। জোড়াসাঁকো দলের বাদ্যকর ন্যাটা বলাই, এবং তাঁর তিনজন শিষ্য, নবু আঢ্য, রাজু আঢ্য ও রূপচাঁদ ঢোল বাজিয়ে আসর মাত করতে থাকেন। জোড়াসাঁকোর দলে সুরকার দুর্গাপ্রসাদ বসু, ও বেহালাবাদক হোগলকুঁড়ে নিবাসী পার্বতী চরণ বসু খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নিমতলায়, রামবাগানে ও হালসীবাগানে সৌখীন বাবুদের পৃষ্ঠপোষকতায় পেশাদারী আখড়াই দল গঠিত হয়।[৬]

১. 'কবিজীবনী', ১২৭
২. তদেব, ১২৭, এই সংকলনের শেষে প্রভাতী গান দ্রষ্টব্য।
৩. তদেব, ১২৭-২৮, কাশীনাথবাবুর পরিচয়, তদেব, ৪১০
৪. 'সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী', ১, ২৮
৫. 'কবিজীবনী', ১২৭-২৮
তদেব, ১২৭-২৮

আখড়াই গানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব (১৭৩২-১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ)। তার সভা-গায়ক "অদ্বিতীয় সঙ্গীতজ্ঞ" কুলুইচন্দ্র সেন নিধুবাবুর নিকট আত্মীয় ছিলেন। কুলুইচন্দ্র সেনকে "আখড়াই গাহনার একজন জন্মদাতা বলাই কর্ত্তব্য হয়·· ইনি আপন ক্ষমতা ও শক্তিদ্বারা পুরাতন বিষয়ে কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন করত অনেক নূতন সৃষ্টি করেন। সুর ও গীতকে নানাপ্রকার রাগ-রাগিনীতে যুক্ত করত নূতন নূতন বাদ্যের সূচনা করিয়াছিলেন।"[১] সুশীলকুমার দে আখড়াই গানকে "বৈঠকী গান" ব'লছেন।[২] সম্ভবতঃ নিধুবাবুর কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পূর্ব্বেই কুলুইচন্দ্র সেনের সংস্কারের ফলে আখড়াই গান বৈঠকী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পরিণত হয়। "মার্জ্জিত প্রণালী'র আখড়াই কুলুইচন্দ্র সেনের সৃষ্টি। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন: "···৺কুলুই চন্দ্র সেন সুরের যে প্রণালীবদ্ধ করিয়াছিলেন, ৺নিধুবাবু তাহা হইতে বিস্তর বাহুল্য করেন, এবং তাহা অতি উৎকৃষ্ট ও সুমিষ্ট হয়।"[৩]

নিধুবাবু কলা-কৈবল্যের নীতি অনুসরণ করে শোভাবাজার-বাগবাজারে, এবং পাথুরিয়াঘাটায় দুটি অপেশাদার, 'এমেচার' আখড়াই দল গঠন করেন। গঙ্গাচরণের মতে তিনি "কালোয়াতী প্রথার" প্রচলন করেন।[৪] 'কালোয়াতী'র ফলে সুরের "বিস্তর বাহুল্য" হয়।

নিধুবাবু আখড়াই গানে 'আদিরসের উৎসাব' কমিয়ে ভদ্র, সুশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করেন। আখড়াই গানে আগেই 'ঐক্যতান বাদ্য' প্রচলিত ছিল। নিধুবাবু তারও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন।[৫] নিধুবাবুর "সংশোধিত" আখড়াই গানের দল দুটি কবে ও কোথায় গান করে, তা ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা জয়গোপাল গুপ্ত লেখেননি। তাঁরা উভয়েই লিখেছেন যে, সখের আখড়াই দল সৃষ্টিতে "ব্যবসায়ীদিগের আখড়াইয়ের দল একেবারে উঠিয়া গেল।"[৬]

গঙ্গাচরণের মতে ১২১১ সালে বড়বাজারে রামসেবক মল্লিকের বাড়ীতে

---

১. তদেব, ১০৭, কুলুই চন্দ্র সেন নিধুবাবুর মাতুল ছিলেন, 'গঙ্গাচরণ' ১১, ভাগিনেয় ছিলেন, **'মনোমোহন গীতাবলী'**, ।০, মাতুল-পুত্র ছিলেন, 'গীতরত্ন', ।।০, 'মাতুল পুত্র' সম্বন্ধ-নির্ণয় গ্রাহ্য।

২. S. K. De, *Bengali Literature*, 278

৩. **'কবিজীবনী'**, ১২৯.

৪. **'গঙ্গাচরণ'**, ১১.

৫. **'গঙ্গাচরণ,'** ১১

৬. **'কবিজীবনী,'** ১০৮, **'গীত রত্ন,'** ।।-।।/১

একটি আখড়াই অনুষ্ঠান হয়েছিল।[১] কিন্তু গঙ্গাচরণের বর্ণনা পড়ে মনে হয়, অনুষ্ঠানটি ছিল হাফ আখড়াই গানের। ১২১১ সালে হাফ আখড়াই গানের আবিষ্কারক মোহনচাঁদ বসু নিধুবাবুর তরুণ শিষ্য মাত্র। হাফ আখড়াই প্রচলিত হয়েছিল ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর। অতএব, গঙ্গাচরণ ঠিক কি বলতে চেয়েছেন, তা বোঝা যায়নি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে "কলিকাতা-সংস্কৃতি"-র গতি-প্রকৃতি আলোচনায় সাধারণভাবে কবিগান প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। আখড়াই গানের ইতিহাস ও ভৌগলিক পটভূমির তুলনায় কবিগানের সামাজিক পটভূমি ও ইতিহাস ছিল ব্যাপকতর। কিন্তু সমকালীন সংস্কৃতিক্ষেত্রে স্থূলতা ও সূক্ষ্মতার মধ্যে যে টানাপোড়েন চলেছিল, তা বোঝাবার জন্য আখড়াই গান-কে অবহেলা করলে আমরা ভুল করব।

নিধুবাবুর সখের আখড়াই দলের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে উত্তর কলকাতার ধনীরা অনেকগুলি আখড়াই দলের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো, গরাণহাটা, শোভাবাজার, ও শ্যামপুকুর অঞ্চলে 'এমেচার' আখড়াই দল গড়ে ওঠে। এই দলগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার, জোড়াসাঁকোর "সিংহবাবুরা", গরাণহাটার কৃষ্ণমোহন বসাক, শোভাবাজারের কালীশঙ্কর ঘোষের "পুত্রগণ" এবং শ্যামপুকুরের দিগম্বর মিত্র ও হলধর ঘোষ।[২] ভবতোষ দত্ত লিখেছেন: মহারাজ গোপীমোহনের বাড়ীতে আখড়াই গানের চর্চ্চা ছিল।[৩] গরাণহাটার কৃষ্ণমোহন বসাক ছিলেন নিধুবাবুর বন্ধু; তাঁর দলের সুরকার ছিলেন রামমোহন রায়ের সমকালীন ব্রাহ্মসমাজের গায়ক গোবিন্দ মালা। তার কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। নিধুবাবুর অপর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন বিখ্যাত ঢোল-বাজিয়ে বাগবাজারের রসিকচাঁদ গোস্বামী। তাঁর সঙ্গে পক্ষীর দলের নেতা বাগবাজারের শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েরও বন্ধুত্ব ছিল। রসিকচাদ উভয়েরই বন্ধু ছিলেন।[৪] বাগবাজারের রাধানাথ সরকার বেহালা বাজিয়ে প্রসিদ্ধ হন।

১. 'গঙ্গাচরণ', ১০-১১
২. 'কবিজীবনী', ১০৮
৩. তদেব, ৩০, ১১২
৪. তদেব ১১৪

ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন : "গোস্বামির ঢোল ও সরকার বাবুর বেহালা যিনি না শুনিয়াছেন, তাঁহার কর্ণই বৃথা"।[১] শোভাবাজারের অদ্বিতীয় সেতার শিল্পী ছিলেন মাধবচন্দ্র ঘোষ।[২] নিধুবাবুর নিজস্ব আখড়াই দল সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। মনোমোহন বসু লিখেছেন : শান্তিপুরের গায়করা "যৎসামান্য টপ্পার সুরে অশ্লীল ভাষায় গাইতেন, আর নিধুবাবুর সময়ে কি সুর, কি গান, সকলই চমৎকার, অতি চমৎকার।… শুনা যায়, অধিকাংশ স্থলেই বাগবাজারের জয় হইত," কারণ, সেই দলে ছিলেন, "মহা প্রতিভাশালী কোকিলকণ্ঠ নিধুবাবু,—সুরদাতা, নিয়ন্তা, ও শিক্ষয়িতা," এবং "যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য মহাপ্রতিভাশালী কোকিলকণ্ঠ মোহনচাঁদবাবু"।[৩] বাগবাজারের মোহনচাঁদ বসু সমকালীন কলকাতার গায়কদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। দেওয়ান রামচরণ বসুর পৌত্র ছিলেন তিনি। "লোকে অদ্যাবধি মোহনচাঁদ বাবুকে নিধুবাবুর খাস ভাণ্ডার কহিয়া থাকে"।[৪] ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন : "নিধুবাবু ইহাঁকে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করিতেন, যেহেতু তাঁহার কৃত কি আখড়াই, কি টপ্পা ইনি যখন যাহা গাহিতেন, তখন তাহাতেই মধুবৃষ্টি করিতেন।" "কন্দর্পকান্তি" মোহনচাঁদ সমগ্র উত্তর ভারতে গায়ক রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। "মোহনচাঁদের স্বর শ্রবণে আহা! আহা শব্দে অশ্রুপাত না করিয়াছেন, এমত ব্যক্তি কেহই নাই"। "বাঙ্গালির মধ্যে এই বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় বাঙ্গালা গাহনা বিষয়ে ইদানীং সবশ্রেষ্ঠ যোগ্য ব্যক্তি দ্বিতীয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।"[৫] নিধুবাবু যখন ছাপরা থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন, তখন তিনি প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছেন। ঐ-বয়সে কতটা কর্মোদ্যম ও উৎসাহ থাকলে তিনি আখড়াই দল চালাতে পারেন এবং মোহনচাঁদের মতো গায়ককে তালিম দিতে পারেন, তা একটু একটু অনুমান করা যায়।

ঈশ্বর গুপ্ত, মনোমোহন বসু, ও গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্যের এই সব বর্ণনা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, কলকাতায় ফিরে এসে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতাদর্শ

১. 'কবিজীবনী' ১১৩
২. তদেব, ১১৩
৩. 'মনোমোহন গীতাবলী', ৶০—৷০
৪. 'গীতাবলী', ৮, পাদটীকা, 'কবিজীবনী', ১১০
৫. 'কবিজীবনী' ১০৯ ; মনোমোহন লিখেছিলেন : "মোহনচাঁদ কৃত সুর মাত্রেই কেমন যে একটা মধুরতা, তাহা আর কাহারো সুরেই নাই", 'মনোমোহন গীতাবলী', ॥৶০

দ্বারা প্রভাবিত নিধুবাবু এমন একটা সঙ্গীত-গোষ্ঠী গঠন ও পরিচালনা করেন, যা সমসাময়িক কলকাতার গানের ধারায় যথেষ্ট পরিমাণে বৈদগ্ধ্য ও শালীনতা সৃষ্টি করেছিল, গান ও কবিতা-বিষয়ক রুচিবোধ যথেষ্ট উন্নত করেছিল।

আখড়াই গানের প্রতিযোগিতা হতো দুই কিংবা তিন-টি দলের মধ্যে। কোন উত্তর-প্রত্যুত্তরের ব্যাপার ছিল না। যে-দলের গান ভাল হতো, সে-দল জয়ী হতো। "প্রত্যেক দলের একটী ভবানী-বিষয়, একটী খেঁউড়, একটী প্রভাতী এবং মাঝে মাঝে অপূর্ব সাজবাদ্যেই রাত্রি কাটিয়া প্রচুর বেলা হইয়া পড়িত"।[১] এক-একটি গান চলবার সময় রাগ-রাগিনীর পরিবর্তন হতো, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতের বাদ্যের পরিবর্তন হতো। মহড়া, চিতেন ও "পারঙ্গ"—আখড়াই গানের এই তিনটি সুনির্দ্দিষ্ট পর্যায়। সঙ্গত সুরু হতো 'পিড়েবন্দি' তালে; তারপর হতো 'দোলন' ও 'দৌড়'; শেষ হতো 'সবদৌড়'-এ। মহড়ার শেষে "সাজ বাজত।" সাজ বাজা শেষ হলে সুরু হতো চিতেন। চিতেনের শেষে আবার সাজ বাজত। তারপর "পারঙ্গ"-এ গান শেষ হতো। ঈশ্বর গুপ্তের সাক্ষ্য অনুসারে এই ধরনের বাজনা উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল না। এই বাজনা বাঙালির তৈরী, সম্পূর্ণ ভাবেই বাংলাদেশের নিজস্ব জিনিস; এখন কালগর্ভে নিমজ্জিত; তার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নেই। ঈশ্বর গুপ্ত তার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় লিখেছেন: "আখড়াই তিন গানের ভিন্ন ভিন্ন তিনখানি সাজ, সে সাজের ভিতর যে কত সাজ, তাহার কি ব্যাখ্যা করিব? যখন বাজে তখন বাজে লোকের বুঝিবার সাধ্য কি?..."[২]

ঢোল, তানপুরা, বেহালা, মন্দিরা, মোচঙ্গ, খরতাল, জলতরঙ্গ, সপ্তস্বরা, বীণা, বেণু ও সেতার আখড়াই গানে বাজানো হতো। বেহালার সঙ্গতে ঢোল বাজত। আখড়াই গান "রাগরাগিনীর খেলা, ছেলে খেলা নহে, অতিশয় কঠিন"।[৩] সাজের বাজনা জমে উঠত বেহালার সুরে আর ঢোলের সঙ্গতে।

আখড়াই গান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত; তাই সাধারণ্যে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা ছিল না। ১২৩৫ সালের ৬ই মাঘে প্রকাশিত একটি সংবাদে

১. 'মনোমোহন গীতাবলী', ।/০

২. 'কবিজীবনী', ১১০—১১২, 'মনোমোহন গীতাবলী', ।/০

৩. তদেব, ১০৮

সম্ভবতঃ শেষ আখড়াই অনুষ্ঠানের খবর আছে। অনুষ্ঠানটি হয় গুরুচরণ মল্লিকের বাড়ীতে। হরচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বাগবাজারের দল, বৃন্দাবন ঘোষাল ও রামলোচন বসাক পরিচালিত জোড়াসাঁকোর দলকে পরাজিত করেছিল। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন: ১২৩০-৩১ সালে আখড়াই গান "রহিত" হয়েছিল। ১২৬০-৬১ সালে একবার শ্যামপুকুরে আখড়াই দল গড়বার ব্যর্থ চেষ্টা হয়।[১] আখড়াই গান ঠিক জনসাধারণের জন্য পরিকল্পিত হয়নি। জনসাধারণ কবি ও পাঁচালী গানেই তৃপ্তি পেত। আখড়াই-এর অবলুপ্তির এ-ও একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণ, নিধুবাবুর প্রিয় শিষ্য মোহনচাঁদ বসুর হাফ-আখড়াই-এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা।

মনোমোহন বসু হাফ-আখড়াই সৃষ্টির ইতিহাস লিখেছেন। তার সার-সংক্ষেপ এই: "কোন ধনশালী মল্লিক বাবুদের ভবনে" মোহনচাঁদের এক পিতৃব্য প্রতিজ্ঞা করেন যে, শীঘ্রই একটা নূতন ধরনের অশ্রুতপূর্ব গান তিনি শোনাতে পারবেন। প্রতিজ্ঞা করে যখন বাড়ী এলেন, তখন গভীর রাত্রি। "বাবা কই! বাবা কই!" বলে চিৎকার করে তিনি মোহনচাঁদের নিদ্রাভঙ্গ করে তাঁকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা জানালেন। মোহনচাঁদ কিছু সময় ধরে ভেবে স্থির করলেন: "রাগরাগিনীর অত নৈপুণ্যময় খেলা, অত ভাঁজ ছাড়িয়া দিই ..." এই 'ছাড়িয়া' দেওয়ার ফলে সৃষ্টি হলো হাফ আখড়াই; এই সৃষ্টির সংবাদ প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি যাতে না জানতে পারে, তার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বিত হয়েছিল। জোড়াসাঁকোর দল এক "ভাগিনেয়"কে গুপ্তচর রূপে পাঠিয়েছিল মোহনচাঁদের দলভুক্ত তার "মাতুল"-এর কাছে। কিন্তু "ভাগিনেয়" কিছুই জানতে পারেনি। অবশেষে, "গাহনার দিন আসিল; সঙ্গীত-সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বাগবাজারের আসর—প্রথমেই তাঁহাদিগকে গাইতে হইল। সারদাবিষয় উভয়পক্ষে একরকম তো হইয়া গেল। সখীসম্বাদের সময় সাজ বাজনার পর স্বয়ং মোহনচাঁদ প্রমুখ বাগবাজারের দল যেই মাত্র চিতেনের প্রথম চরণ গাইয়া ছাড়িয়া দিল, অমান বাহবার চোটে বোধ হইল বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়ে! ক্রমে পর-চিতেন, ফুকা, ডবল্-ফুকা (এই ডবল্-ফুকা কবি-গানের মধ্যে পূবে মোটে ত ছিল না), মেল্‌তা, মহড়া ইত্যাদি—পর পর যত গাওয়া হইতে লাগিল, ততই অভূতপূব

১. 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা', ১, ১৩৯, ১৪৪—১৪৫, 'কবিজীবনী', ১১৩

গগনস্পর্শী প্রশংসার ধ্বনি পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইল···প্রতিপক্ষীয় দল এককালে হতজ্ঞান! তাঁহারা আসরে নামিতেই আর অসম্মত!"[১]

এই অনুষ্ঠানটি হয় মেছুয়াবাজারের রামমোহন মল্লিকের বাড়ীতে, ১২৩৮ সালে, ৯ই মাঘ শনিবারের রাত্রিতে। এই খবর 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় ছাপা হয়েছিল।[২]

কবিগান ও আখড়াই-এর সংমিশ্রণে হাফ আখড়াই গান হয়। কবি-গানকে 'দাঁড়া-কবি' বলা হতো। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "হাফ্ আখড়াইও একপ্রকার কবি, কিন্তু বসা"।[৩] নিধুবাবু তখন অতিবৃদ্ধ। তিনি যখন এ-খবর শুনলেন, এ-সম্পর্কে তাঁর তখন কিছু করবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি 'দাঁড়া-কবি' একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাঁরই প্রিয়শিষ্য মোহন-চাঁদ কবিগানের সঙ্গে আখড়াই মিশিয়ে হাফ আখড়াই করেছেন শুনে তিনি না-কি বলেছিলেন: "কি! আমার এত সাধের—এত অসীম বিদ্যাবত্তার পদার্থ যে 'আখড়াই', তাহাকে ঐ মূর্খটা কিনা ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া কবির গানে দাঁড়া করাইল, অমূল্য নিধি লইয়া বানরের গলায় পরাইল!"[৪] মোহনচাঁদ গুরুর বাড়ীতে দলবল নিয়ে এসে তাঁকে হাফ আখড়াই শুনিয়ে সন্তুষ্ট করেন। নিধুবাবু না-কি মোহনচাঁদের গান শুনে খুসী হয়ে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করে হাফ-আখড়াই গাইবার অনুমতি দিয়েছিলেন।[৫]

হাফ আখড়াইয়ের সুরের কোন বৈশিষ্ট্য দেখে নিধুবাবু মোহনচাঁদকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, আজ তা বোঝা মুশকিল। তবে হাফ্-আখড়াই যে 'লিরিক' হিসেবে আখড়াইয়ের নিম্নস্তরের, সেটা নিচের দৃষ্টান্তটি থেকেও কিছুটা বোঝা যায়। রাম বসু বা গদাধর মুখোপাধ্যায় রচিত কবিগান-ও হয়তো তার চেয়ে ঢের ভালো। হাফ-আখড়াই গানের নমুনাটি বৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত 'বিশ্বসঙ্গীত' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হল।

১. 'মনোমোহন গীতাবলী', ।/০—।।/০
২. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২, ২০৮—২০৯
৩. 'মনোমোহন গীতাবলী', প্রকাশকের বিজ্ঞাপন, ৶০
৪. তদেব, ।।৶০
৫. তদেব, ।।৶০—।।৶০

প্রশ্ন প্রথম। খেউড়

মহড়া—বল ননদী গুণের ভাই, ওরে **প্রাণ প্রাণ**রে, শুন্‌বো সমাচার, ওরে **প্রাণ প্রাণ**রে।

সওয়ারী—ধন্য তোমার বোন যুবতী, একবার কল্লে প্রজাপতি, **প্রাণ**রে এবার কে হে আসিয়ে, হোলো নতুন বোনাই **প্রাণ** তোমার।

তেহরণ—ওরে **প্রাণ**রে **ননদী** ঢলালে, ওরে **প্রাণ** কি ঢলান ঢলালে, কি ঢলান ঢলালে, **প্রাণ** কি ঢলান, ওরে **প্রাণ**, ওরে **প্রাণ** কি ঢলান, ওরে **প্রাণ প্রাণ প্রাণ**, কি ঢলান ওরে **প্রাণ** কি ঢলান! ওরে আমার **প্রাণ**, **প্রাণ** কি ঢলান, ওরে **প্রাণ** কি ঢলান, ওরে **প্রাণ** আবার পতি হোলো কে হে তাঁর।

চিতেন—সুবলতনয় তুমি হে **প্রাণ**, প্রাণপতি আমার, ওরে **প্রাণ প্রাণ প্রাণ**রে।

পরিচিতেন—ননদী হন সুবলসুতা রে ভগ্নীটী তোমার।

ফুকো—কুলের মান্যে সে চন্দ্রাস্যে সুহাস্যে হে অনুক্ষণ পরে, **প্রাণ**রে **প্রাণ প্রাণ** আমার, দেখলে পরে সে-ননদীর **প্রাণ**রে মোহ হয় মদন।

ডবল ফুকো—অজের প্রেয়সী ঠাকুরঝী ওরে **প্রাণ** ওরে, মনেতে জান তো ওরে **প্রাণ প্রাণ প্রাণ**রে।

মেলতা—আবার পতি হ'লো কে হে তার॥[১]

এই গানে 'প্রাণ' কথাটিই ৩১ বার ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধরনের হাফ আখড়াইয়ের সঙ্গে নিধুবাবুর টপ্পার কোন তুলনাই হতে পারে না। অথচ, নিধুবাবুই অশ্লীলতার অভিযোগে বার বার তথাকথিত সমালোচকদের ঘৃণা অর্জন করেছিলেন। এই ধরনের হাফ আখড়াই সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধ'রে বাংলাদেশে, বিশেষ ভাবে কলকাতায় প্রচলিত ছিল। এই গানের দীর্ঘস্থায়িত্ব সমকালীন কলকাতার এক বিশেষ ধরনের রুচির প্রমাণ মাত্র। সংবাদপত্রের সংবাদ-সঙ্কলন গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হাফ আখড়াই অনুষ্ঠানের খবরগুলি নিচে সাজিয়ে দিচ্ছি: ১২৩৮, ৯ মাঘ; ১৮৪৬, ১ জানুয়ারী; ১৮৪৬, ৩-ফেব্রুয়ারী; ১৮৫৪, ২২ নভেম্বর; ১৮৫৬, ১৪ ফেব্রুয়ারী।[২]

১. 'বিশ্বসঙ্গীত', ৪৩৯-৪০

২. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১, ১৩৯, ১৪৪-৪৫, তদেব, ২, ২০৮-২০৯; 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৩, ৪৬২, 'কবিজীবনী', ৩৫৫-৩৬১

'হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস'-এ আরো অনেক তারিখ আছে, যথা : ১২৭১, ১২৭২, ১২৭৪, ১২৮৩ (পঞ্চমী দোল), ১২৮৪, ১২৮৭, ১২৮৮ (১২ই মাঘ), ১৩২২, ১৩২৫ (২১ অগ্রহায়ণ) ।[১]

মনোমোহন বসু উল্লিখিত তারিখ : শ্রীপঞ্চমী, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ, ১২৮৩, পঞ্চম দোল; ১২৮৪ ৭ই বৈশাখ ; ১২৮৬, ১১ই মাঘ, ; ১২৯১, ১৩ই কার্ত্তিক। ১২৮৬ বঙ্গাব্দে রামমোহন মল্লিকের বাড়ীতে যে-অনুষ্ঠান হয়, মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল তা শুনেছিলেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে ৬ই বৈশাখ যদুনাথ মল্লিকের বাড়ীতে হাফ আখড়াই অনুষ্ঠিত হয়।[২]

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হুতোম প্যাচা চড়কপূজার শেষ দিন ভোরে চিৎপুর অঞ্চলের এক বেশ্যাবাড়ীর বারান্দায় শখের হাফ-আখড়াই দলের দোহারদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। তিনি "ধোপাপুকুর" হাফ আখডাই দলের নেতা 'মুখুয্যেদের ছোটবাবু'-র বর্ণনা করে লিখেছেন : "ছোটবাবু ইয়ারের টেক্কা, বেশ্যার কাছে চিড়িয়ার গোলাম, ও নেশায় শিবের বাবা! শরীর ডিগডিগে, পৈতে গোচ্ছা করে গলায়, দাঁতে মিশি, প্রায় আধহাত চেটালো কালা ও লালপেড়ে চক্রবেড়ের ধুতি পরে থাকেন। ডের ভরি আফিং, দেড়শ ছিলিম গাঁজা ও একজালা তাড়ী রোজকী মৌতাতের উঠনো বন্দোবস্ত।" হাফ আখড়াই দলের দোহাররা "তেলী, ঢাকাই কামার ও চাষাধোপা"; শ্রোতারা, "ইয়ার গোচের স্কুলবয়, বাহাত্তুরে ইনভেলিড্"।[৩]

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় মদনমোহন মৈত্রের বাড়ীতে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে যে-হাফ আখডাই অনুষ্ঠিত হয়, তার বিষয়বস্তু ছিল বিধবাবিবাহ। এই অনুষ্ঠানে "ইতরভাষা" ব্যবহার করা হয়নি। "সম্বাদ ভাস্কর" লিখেছিলেন : "এ সঙ্গীত একপ্রকার নূতন সঙ্গীত হইয়াছে।"[৪] বৈষ্ণবপ্রভাবমুক্ত, সামাজিক সমস্যামূলক হাফ আখড়াই পরে কত উন্নত হয়, তা জানা নেই।

অনুষ্ঠানের তারিখগুলি বিচার করে এ-রূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, সরস্বতীপূজা, দোল, চড়ক, দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে হাফ আখড়াই গানের অনুষ্ঠান হতো।

---

১. 'গঙ্গাচরণ', ২০-২৯, ৪৭-১১৭ ; সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৬, ৬২-৬৩.
২. 'মনোমোহন গীতাবলী', ৫, ১১, ১৩-১৪, ১৫, ১৯, ২১, ২৮
৩. 'সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী', ১, ১৭, ৩০-৩১, ৩৫
৪. 'সাময়িকপত্রে বাংলায় সমাজচিত্র' ৩, ৪৬২

দুর্গাপূজার একটি বিশেষ পর্যায়ে অশ্লীল গান করার বিধি কোনো কোনো তন্ত্রগ্রন্থে দেখা যায়। 'বিশ্বসারতন্ত্র'-এর একটি অধ্যায়ে "ভগাখ্যানসমূহ" দেবী চণ্ডিকার পূজার অঙ্গ রূপে বর্ণিত। সেই তন্ত্রমতে, "ভগশব্দং সমুচ্চার্য্য ভগশব্দৈঃ স্তবেৎ সদা"। "দক্ষিণাবিধি"-র পূজন-ক্রমে ঐ-তন্ত্রে "ভগগীত" ও "লিঙ্গগীত" নির্দিষ্ট হয়েছে।[১] গন্ধর্বতন্ত্রে সপ্তদশ পটলে দেবী ত্রিপুরার অর্চ্চনাকালে বেশ্যাদের নৃত্যগীত, কৌতুক ও "হাস্যানন্দ" পরিবেশনের নির্দেশ আছে।[২] দোলের সময় অশ্লীল গান করা ত ভারতবর্ষে সর্বত্রই ধর্মানুমোদিত প্রথা।

১. 'বিশ্বসার তন্ত্রম্', রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ৩৭-৩৮, ৪১, ৪৮
২. 'গন্ধর্ব তন্ত্রম্', রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ৩৮

॥ নিধুবাবুর কবিতা ॥

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটা "গানের যুগ"-এর অস্তিত্ব বোধ হয় প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন রামগতি ন্যায়রত্ন।[১] পরে অনাথকৃষ্ণ দেব লিখেছিলেন: "আধুনিক যুগের প্রথমাংশ বিলকুল গান। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ কবিতার সময় হইতে বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যে 'অগেয়' কবিতার আরম্ভ দেখা যাইতেছে।"[২] গীতকাব্যের যুগবৈশিষ্ট্য ও কাব্যস্বরূপ সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন সুশীলকুমার দে।[৩] নিধুবাবুর কবিতার সাহিত্যিক সমালোচনা প্রথম তিনিই করেছিলেন, এ-ধারণা কিন্তু সত্য নয়। ১৩০৩ সালে প্রকাশিত 'গীতাবলী' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে বৈষ্ণবচরণ বসাকের একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ দেখা যাচ্ছে, যাতে নিধুবাবুর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ খণ্ডন করা হয়েছে।[৪] ১৩০৫ সালে প্রকাশিত 'প্রীতিগীতি'র ভূমিকায় অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বহু নিদর্শন দিয়ে নিধুবাবুর কাব্য নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন।[৫] অবিনাশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন: "বাস্তবিক নিধুবাবুর রচিত টপ্পার ন্যায় সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী টপ্পা বাংলা ভাষায় আর কখনও রচিত হয় নাই। উহাতে স্বরলয়ের যেমন পারিপাট্য, তেমনি ভাষার লালিত্য, ততোধিক ভাবের কোমলতা ও গভীরতা···নিধুবাবুর ভাষার চেয়ে ভাব আরো মনোহর"···আরো লিখেছেন: "নিধুবাবুর দুই ছত্রের গানে যে-ভাব থাকে, অন্য কবির বড় বড় গানেও তা থাকে না···কবির একটি লক্ষণ এই যে তিনি কল্পনাবলে মানসিকবৃত্তি প্রভৃতি অশরীরী পদার্থকেও শরীরী করিয়া আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দেন। এই লক্ষণ নিধুবাবুর গানে আছে...নিধুবাবুর অনেকগুলি গান তাঁহার চিত্রকুশলতার পরিচয় দেয়... নিধুবাবুর গানে পারমার্থিক ভাবের অপ্রতুল নাই···"[৬] সুশীলকুমার দে 'নানানিবন্ধ' গ্রন্থে 'রামনিধি গুপ্ত' রচনায় অধিকাংশ স্থলে অবিনাশচন্দ্র ঘোষের

১. 'বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', ১৭০-১৭১
২. 'বঙ্গের কবিতা' ১, ৮০
৩. De, *Bengali Literature*, 'Love-Lyric' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৪. 'গীতাবলী', (১৩০৩), ২১-২৩
৫. 'প্রীতিগীতি' (১৩০৫), ২/০-২৸০
৬. তদেব, ২৷৵০, ২৷৷৶০, ২৷৷৶

মতের প্রতিধ্বনি করেছেন। এমন কি, কোথাও কোথাও ভাষার সাদৃশ্যও বিলক্ষণ। যথা :

'প্রীতিগীতি'—"নিধুবাবুর গান তাঁহার জীবদ্দশাতেই সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয় হইয়াছিল যে, এখনও তাঁহার নামের দোহাই দিয়া অতি জঘন্য গীত "নিধুর টপ্পা" বলিয়া বিক্রীত হয়।" (পৃষ্ঠা, ২।৴০)

'নানানিবন্ধ'—"নিধুবাবুর গান তাঁহার জীবদ্দশাতেই সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয় হইয়াছিল যে, তাঁহার নামের দোহাই দিয়া অতি জঘন্য গীতও 'নিধুর টপ্পা' বলিয়া চলিয়া গিয়াছে"। (পৃষ্ঠা ১১৯)

'প্রীতিগীতি'—"প্রেমের বিষয় যাহা কিছু বলিবার আছে নিধুবাবু প্রায় তাহা বলিতে বাকী রাখেন নাই"। (পৃষ্ঠা, ১।।০)

'নানানিবন্ধ'—প্রেমের বিষয় যাহা কিছু বলিবার আছে, নিধুবাবু তাহার অনেক কথাই বলিয়াছেন"। (পৃষ্ঠা, ১২০)

'প্রীতিগীতি' "...নিধুবাবু মিলনের চেয়ে বিচ্ছেদের গান গাহিতে বেশি ভালবাসেন"। (পৃষ্ঠা ২।।৴০

'নানানিবন্ধ'—"মিলনের চেয়ে বিচ্ছেদের গান গাহিতে তিনি বেশি ভালবাসেন" (পৃষ্ঠা, ১২৮)

এ-কথা অনস্বীকার্য যে, নিধুবাবু ও সমকালীন গীত-রচয়িতাদের সম্পর্কে অনেক নূতন কথা লিখেছেন সুশীলকুমার দে। তিনিই দেখিয়েছেন যে, নিধুবাবুর কবিতা ধর্মপ্রভাবমুক্ত মানবিক প্রেম সম্পর্কে নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যঞ্জনাময় রূপায়ণ। প্রকরণের দিক থেকে নিধুবাবু প্রাচীনপন্থী, তবু তাঁর গান পার্থিব, বাস্তব প্রেমের রূপায়ণে বিশ্বধর্মী। তিনি প্রায় বিচারকের ভঙ্গীতে 'রায়' দিয়েছেন ;

"There is a good deal of frankness and a passionate sense of the good things of life, it is true ; but even judged by very strict standard, his songs are neither indecent nor offensive, nor immoral."[১]

তাঁর মত বোধ হয় পরে পরিবর্তিত হয়েছিল। 'নানানিবন্ধ' বইতে

১. S. K. De, *Bengali Literature*, 361, কাব্যালোচনা, *Ibid*, 359 366 ; "Exasperatingly impressionist' কথাটি *Bengali Literature*, 361-এ আছে। দ্রষ্টব্য 'নানানিবন্ধ', ১১৭-১৩০

লিখেছেন : "ইংরেজি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভাষার দুর্দ্দিনের সময় যে সকল যুগপ্রবর্ত্তনকারী লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিধুবাবুও তাহাদের মধ্যে একজন।"[১]

টপ্পা-রচয়িতাদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: "They preserve in a degree the old poster and the old manner ; but in spirit and temper, if not in any thing else, they herald the new age."[২]

অথচ, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কবিজীবনী'-র ভূমিকায় সুশীলকুমার দে "টপ্পারচয়িতা" রামনিধি গুপ্ত-কে কবিওয়ালাদের মতো বলে গণ্য করেছেন: "কিন্তু টপ্পারচয়িতা রামনিধি গুপ্ত বা তাঁহার সমসাময়িক কবিওয়ালারা কেবল অরাজক বাংলা সাহিত্যের আসর জমাইয়া রাখিয়াছিলেন ; প্রতিনিধি হিসাবে বসিবার প্রতিভা বা যোগ্যতা তাঁহাদের ছিল বলিয়া মনে হয় না"।[৩]

Bengali Literature in the Nineteenth Century গ্রন্থে ৩৫০ পৃষ্ঠা থেকে ৩৭২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, এবং 'নানানিবন্ধ' গ্রন্থে ১০৪ পৃষ্ঠা থেকে ১৩০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দীর্ঘ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার সিদ্ধান্ত তা-হলে দাঁড়াল এই? কিন্তু তা-ও কি স্পষ্ট বলা চলে? 'কবিজীবনী'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু ১৯৬২-তে প্রকাশিত হয় Bengali Literature'-এর দ্বিতীয় 'পরিবর্দ্ধিত' সংস্করণ। (লেখকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। এই সংস্করণে কোথাও 'কবিজীবনী'-র ভূমিকায় লিখিত ঐ-জাতীয় মন্তব্যের প্রতিধ্বনি নেই।

অনাথকৃষ্ণ দেব লিখেছিলেন: "নিধুর টপ্পা আদিরস ঘটিত প্রেমগীতি, অথচ তাহাতে রাধাকৃষ্ণ বা বিদ্যাসুন্দরের প্রসঙ্গ নাই"।[৪] সুশীলকুমার দে লিখলেন: তাহার প্রায় সমস্ত গানই প্রেমবিষয়ক ; কিন্তু তাহাতে রাধাকৃষ্ণ বা বিদ্যাসুন্দরের নামগন্ধও নাই"।[৫] কিন্তু ঐ-প্রবন্ধেই অন্যত্র তিনি লিখেছেন: "কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্কের যে এই মর্ম্ম, নিধুবাবু তাহা সুন্দর রূপে বুঝাইয়াছেন..."[৬] সুশীলকুমার দে'র রচনায় এ-রকম স্ববিরোধ প্রচুর। কিন্তু এ-সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

১. 'নানানিবন্ধ'-১৩০
২. De, *op.cit.* 353
৩. 'কবিজীবনী', ৷/৹
৪. 'বঙ্গের কবিতা' ১, ২৯২
৫. 'নানানিবন্ধ',১১৮
৬. তদেব, ১২৬

নিধুবাবুর গানে 'রাধাকৃষ্ণের' উল্লেখ নেই, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে বৈষ্ণব প্রভাব থেকেও মুক্ত নন। দুটি গানে অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বৈষ্ণব প্রভাব দেখেছিলেন, আমরাও দেখি।[১] গানদুটি 'গীতরত্ন'-এর ৪৮ পৃষ্ঠায় আছে। প্রথম গানের প্রথম চরণ, "চল সখী যাই যমুনাতীরে ঘন বরণ ঘন উদয় মনেতে'। "কৃষ্ণপ্রেমের" প্রমাণ রূপে সুশীলকুমার দে-ও গানটির উল্লেখ করেছেন।[২] অপর গীতটির প্রথম চরণ, 'ঘন ঘন ঘন বরণ ধ্যানে মম মনের তমো রহিল দূরেতে"। নায়িকা বলছে : "দেখিতে বরণ কাল, অন্তর করয়ে আলো"। 'গীতরত্ন'-এর ২৬ পৃষ্ঠায় "এ দুঃখ আর না যায় সহনে", এবং ৭২ পৃষ্ঠায় "সদয় রহিও শুন প্রাণ প্রিয় নিদয় না হয়ো নাথ"—গান দুটি বৈষ্ণব কীর্তনের ভঙ্গি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত; গানদুটি অবশ্য টপ্পা-রূপে রচিত। নিধুবাবুর কোনো-কোনো গানে অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ দাসের প্রভাব দেখেছেন।[৩] নিধুবাবু কখন কখন 'আজু' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ; শব্দটি বৈষ্ণব কবিতায় যত্রতত্র দ্রষ্টব্য।

কবিওয়ালাদের গানের অনেক কথাই নিধুবাবু ব্যবহার করেছিলেন, যথা প্রিয় সম্বোধনে "প্রাণ", "কেনে", "দিবেনিশি", "মনো"। কবিগানের অনুপ্রাসের প্রভাব নিধুবাবুর গানেও অবিরল। একটি গান-তো অনুপ্রাসে ভরা। তার প্রথম চরণ, "ভাবনা রহিল যদি সেখানে ভাবনা রহিত না হই"। ('গীতরত্ন' ৬০ পৃষ্ঠা)। অন্য একটি গীতের পদ-বিন্যাসে কবিয়ালী রীতি দেখা যায়, যথা, "নিদ্রাবশে গেল কালো। সুখ তো করলে ভালো।। ('গীতরত্ন', ৫ পৃষ্ঠা।)[৪]

টপ্পা-গানও বৈষ্ণব প্রভাবমুক্ত ছিল না। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে উত্তর ভারতে যখন গোলাম নবি'র টপ্পার স্বর্ণযুগ, তখন কাংড়া উপত্যকা থেকে শুরু করে পাটনা পর্যন্ত সর্বত্রই, চারুশিল্প বৈষ্ণব প্রভাব দ্বারা আক্রান্ত। উত্তর ভারতেই প্রচলিত ছিল "হোরীগান"; অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী লিখেছেন : "টপ্পা নানাপ্রকার। তন্মধ্যে ঠুংরী, গজল, রেক্তা, রুবাই, সোহেলা

১. 'প্রীতিগীতি', ২৸৹

২. 'নানানিবন্ধ', ১২৬

৩. 'প্রীতিগীতি', ২।/৹

৪. তদেব, ৭১১, কবির গানে সুর অনুসারে উচ্চারণ ও বানান-এর ব্যাখ্যা : 'কবিজীবনী', ২৪৬

"হোরী" জিগর, ইত্যাদি প্রসিদ্ধ"।[১] কৃষ্ণানন্দ ব্যাস 'সংগীত-রাগকল্পদ্রুম'-এর তৃতীয় খণ্ডে "টপ্পাদি রঙ্গীন গান"-এর যে-সব নিদর্শন দিয়েছেন, তাঁর মধ্যে বৈষ্ণব টপ্পাও আছে। যেমন,

ভৈং ধিং তিং (ভৈরবী, ধিমাতেতালা)
দীনদয়াল, জাগর নট, নটবর কটি পটে পীত, ঠাড়ে কালিন্দী তট।
মাথে মুকুট ধরে, করমে ল কটলী, নেকর টে কে ক দ ম ডা র, (?)
মৃদঙ্গ উ ঘ ট ত চ ট (?)॥[২]

কাজেই, নিধুবাবুর কবিতা যে সম্পূর্ণভাবে বৈষ্ণব প্রভাব কাটিয়ে উঠেছিল, এ-কথা মানা শক্ত।

কবিওয়ালাদের ছন্দের শিথিলতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ মন্তব্য করেছিলেন, বলেছিলেন, ছন্দের অভাব ঢাকার জন্য কবিওয়ালারা "ঘন ঘন অনুপ্রাস" ব্যবহার করেছেন।[৩] নিধুবাবুর গানে ছন্দের দীনতা ঢাকা হয়েছিল সুরে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, তিনি "শ্রোতাদের মনে পেরেক মারিবার" জন্য গানগুলি অনুপ্রাস-সর্ব্বস্ব করে তোলেননি। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন: "নিধুবাবু যে প্রকার রাগ, সুর, এবং ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, মিলের প্রতি সে প্রকার দৃষ্টি করিতেন না। এ কারণ তাঁহার কোন কোন গান সুর করিয়া গাহিলে মানুষের মনকে যে প্রকার আর্দ্র করে, মুখে পাঠ করিলে সে প্রকার চিত্ত-সুখকর হয় না...ভাবের উদয় মাত্রেই মুখ হইতে স্বভাবতঃ যে সকল কথা নির্গত হইত ইনি তাহাই সুর ও রাগভুক্ত করিয়া গান করিতেন, সেই সময় যদিস্যাৎ মিলের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিতেন তবে সোণার উপর সোহাগার অপেক্ষাও কতদূর পর্যন্ত উত্তম ও আশ্চর্য হইত তাহা কথনীয় নহে"।[৪]

নিধুবার গানের অনেক পদ ছিল টপ্পার তান বিস্তারের উপযোগী, যেমন, "তুমি যা বলিলে তা না না না রে"; "একফুলে ভুলে অলি নহে না না নে";

১. 'সঙ্গীতসার' (১২৮৬), ৩৪
২. 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম' (১২৫২), ৩, ৬৬, ৮১-১১৬
৩. 'লোকসাহিত্য' (১৩৭২), ৮০-৮১
৪. 'কবিজীবনী', ১১৫-১১৬

"চাতকীর তৃষা ঘন ঘন ঘন" "বরিষে ঘন ঘন ঘন কেন গরজে ঘন", "নানান দেশে নানান ভাষা"; "যায় যায় যায় প্রাণ যায় রে"।[১]

গীতকারদের রচনা প্রসঙ্গে সুশীলকুমার দে "savage, uncouth, grotesque", এই তিনটি বিশেষণ ব্যবহার করে পরে আবার লিখেছেন: "it is at the same time trenchant, vivid, and full of nervous and muscular energy".[২] সুশীলকুমার দে'র বিশেষণগুলো সত্যি কি নিধুবাবুর গানের বেলায় কুণ্ঠাহীনভাবে প্রয়োগ করা যায়?

নিধুবাবুর গানে করুণ রসই প্রধান। মিলনের গান তিনি বেশি রচনা করেননি। বাংলা কবিতার ইতিহাসে বিরহবেদনার অবাধ প্রকাশ নূতন নয়। পদাবলীর একটি বড়ো অংশই বিরহের গান। কিন্তু, "বৃন্দাবন ছাড়ি কৃষ্ণ না যায় কখন,"—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মানুমোদিত এই মত[৩] 'মাথুর' কাব্যেও বিরহের অবভাস মাত্র সৃষ্টি করে। নিধুবাবুর গানের বিরহবিচ্ছেদজাত দুঃখ ছিল বাস্তব ও সামাজিক।

বিরহ বা বিচ্ছেদ সব সময়েই কেবল রসশাস্ত্রেরই চর্বিত চর্বণ নয়,—যে সমাজ বহুপত্নীক পুরুষকে অনুমোদন দেয়, সেখানে স্বভাবতই প্রত্যাখ্যাতা ও অবহেলিতা পত্নীদের বিচ্ছেদবেদনা সামাজিক, বাস্তব অবস্থারই প্রতিচিত্রণ।

প্রোষিতভর্তৃকার উৎকণ্ঠা অনেকদিন থেকেই কবিদের প্রিয় প্রসঙ্গ। কিন্তু রাষ্ট্রের কোনো-কোনো অবস্থায় এই উৎকণ্ঠা নিছক বায়বীয় প্রেম থেকে নিঃসৃত না-ও হতে পারে—পথ-ঘাট বিপদসঙ্কুল, দেশ অরাজক, নিরাপত্তা শঙ্কাতুর—সে-ক্ষেত্রে বরং উৎকণ্ঠিত না হওয়াই অস্বাভাবিক; কিন্তু উৎকণ্ঠার এই বাস্তব কারণগুলো থেকে আলাদা করে নিলে পথিকবধূর মর্মবেদনা, বা প্রোষিতভর্তৃকার আশঙ্কার সবগুলো স্তর আমাদের চোখে পড়বে না। এই উৎকণ্ঠার সাংগীতিক প্রকাশই নিধুবাবুর অনেক গানে ঘটেছিল।

নিধুবাবুর গানের নায়িকাদের ঐতিহাসিক স্বরূপ কি? লুক স্ক্রাফটন্ তৎকালীন বাঙ্গালী মহিলাদের সম্পর্কে লিখেছিলেন; "They are married in their infancy and it is common to see a woman of 12

১. 'গীতরত্ন' (১২৪৪), ১১৮, ৩০, ১৩৬, ৪৩, ৯৮, ৪৩

২. S. K. De, *Bengali Litrature*, 360.

৩. গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এই মত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির থেকে প্রকাশিত "বিদগ্ধ মাধব" নাটকের ভূমিকায়। ভূমিকা, পৃষ্ঠা, ৩-১০

with a child in her arms···yet they bear but few children, for at 18 their beauty is on the decline, and at 25 they are strongly marked with age"[১] বাল্যে বিবাহিতা, কৈশোরে সন্তান জননী, আঠার বৎসর বয়সে প্রৌঢ়ত্বে উপনীতা বাঙালি মহিলারা নিধুবাবুর টপ্পার "অধিনী", কিংবা "অধিনীজন"। শুধু টপ্পার গায়কী থেকেই নিধুবাবুর গানে করুণ রসের সংক্রাম হয়নি; তার উৎস কবির গভীর অবচৈতন্যে নিহিত। লক্ষনীয়,—রাজনারায়ণ বসু কিন্তু "সেকালের" মহিলাদের প্রসঙ্গে তাঁদের রূপের কথা একবারও বলেননি; "সেকালের স্ত্রীলোকেরা একালের স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক শ্রমশীলা ছিলেন,"—এটাই তাঁর প্রধান বক্তব্য।[২]

ভবতোষ দত্ত প্রশ্ন করেছেন: "রেনেশাঁর মূল কথা যদি হয় আত্ম আবিষ্কার, তবে নিধুবাবুর গানেই কি তার ক্ষীণ সূচনা দেখতে পাচ্ছি না?"

অমলেশ ত্রিপাঠী উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ও রেনেশাঁস্ যুগের ইতালীর মধ্যে বহু গড়মিল দেখতে পেয়েছেন।[৩] কিন্তু ডানিয়েল গাব্রিয়েল রসেটি'র সমৃদ্ধ অনুবাদে রেনেশাঁসপূর্ব্ব ইতালীর কবিদের রচনায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত বাংলা টপ্পা গানের করুণ ভাব দেখা যায়। সেখানেও এই বিরহের ব্যাপার, এই দুঃখের কথা। নিধুবাবু ও তাঁর সময়কার গীতকারদের রচনায় বিরহিনীদের বেদনাই প্রধানত ফুটে উঠেছিল। পক্ষান্তরে, দেশকালের পার্থক্যের জন্যই রেনেশাঁস-পূর্ব্ব ইতালীয় কবিতায় বিরহী নায়কদের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় হয়। কিন্তু দেশকালপাত্রের ভেদ সত্বেও কেন একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্ত্তে এই বেদনার প্রকাশ ঘটেছিল, তা ভেবে দেখা যেতে পারে। রেনেশাঁস-পূর্ব ইতালী, এবং নিধুবাবুর বাংলা দেশ, দুটিই ছিল ঔপনিবেশিক, বিদেশীশাসিত, পরাজিত। লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের গ্লানিই কি রূপান্তরিত হয়ে এ-ভাবে দুই দেশের কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছিল? দুঃখের বোধ থেকেই কি এই দুই দেশে নবজাগৃতির সূচনা হয়েছিল?

আরো আশ্চর্য, প্রাক্-রেনেশাঁস ইতালীয় কবিদের কোন কোন কবিতায় "মানিনী", "খণ্ডিতা", "কলহান্তরিতা" নায়িকাদেরও আবির্ভাব। 'খণ্ডিতা'

১, Scrafton-এর মন্তব্য K. K. Datta প্রণীত *survey*-তে উদ্ধৃত হয়েছে। P. 34. Scrarfton-এর *Reflections on the Government of Indostan*", Pp, 10-11 দ্রষ্টব্য।

২. রাজনারায়ণ বসু, 'সেকাল আর একাল' (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, ১৩৬৩), ৮৫-৮৮

৩. *History of Bengal* (Cal University 1967), Section 3-Pp, 472-513.

নায়িকা তার পলাতক নায়কের সঙ্গে আকাশে লীন হয়ে যাওয়া বাজ পাখীর তুলনা করেছে। যেন অনেকটা বাংলাদেশের 'খাঁচার পাখী'র উড়ে যাওয়ারই উপমা।[১] কিন্তু অন্তত দুটি ইতালীয় কবিতায় নিধুবাবুর ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, যেমন,

গীতরত্ন : "কেশ ফাঁসী গলে দিলে প্রাণ হাসিতে হাসিতে।" (১১৪ পৃষ্ঠা)

I Canzone, of Fazio Degli Uberti : "I look at the crisp golden-threaded hair/whereof, to thrall my heart, love twists a net."

গীতরত্ন : "তুমি কি রাজা হলে প্রাণ আমার দেশেতে ?" সংখ্যা-৪৭৯

Dante Alighieri : "a King love is, whose palace where he sojourneth/Is called the Heart. (The New Life, P. 208)

(এইসব তথ্য D. G. Rosetti প্রণীত, এক খণ্ডে প্রকাশিত, 'The Early Italian Poets', ও 'Dante and his Circle' থেকে নেওয়া হয়েছে। 'The Early Italian Poets' লণ্ডন থেকে ১৮৬৪-তে, এবং 'Dante and his Circle' লণ্ডন থেকে ৮৭৪-এ প্রকাশিত হয়।)

বাহুল্য হবে যদি বলি যে, নিধুবাবু নিশ্চয় ইটালীয় কবিদের বিষয় জানতেন না। কিন্তু তবুও চিন্তার এই সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

অবিনাশচন্দ্র ঘোষ "ওষ্ঠাগত প্রাণ, নাথ! না দেখে তোমারে",—নিধুবাবুর এই গানটির সঙ্গে "হাফেজের একটি প্রসিদ্ধ পদের অবিকল" মিল খুঁজে পেয়েছেন।[২] 'মঙ্গলাচরণ কর সখিগণ আইল মনোরঞ্জন, গাও এমনকল্যাণ' —এই গানটি সুশীলকুমার দে'র মতে সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের ওপর ভিত্তি করে রচিত।[৩] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে "নিধুবাবুর গানের ভাব অনেক হিন্দি টপ্পায় পাওয়া যায়।"[৪]

১. Rosetti, *The Early Italian Poets* (London, 1864) : *Rinaldo D, Aquino, II Canzone*, 'কলহান্তরিতা', *Lippo Paschi De' Bardi, Sonnet*, 'মানিনী'. *Anon. I. Sonnet*, 'খণ্ডিতা', *Anon I. Sonnet*, '*A lady laments for her lost lover, by Similitude of a Falcon*'.

২. 'প্রীতিগীতি', ২।৶০

৩. 'নানানিবন্ধ', ১১৫

৪. তদেব, ১১৮

নিধুবাবুর 'গীতরত্ন' গ্রন্থে অন্যান্য ভাষা থেকে অনুবাদ করা গীতের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। তবে 'তুতিনামা' গ্রন্থে উদ্ধৃত, 'খোজেস্তা'র প্রেমের গানের সঙ্গে নিধুবাবুর, ও সমসাময়িক অন্যান্য গীতকারদের রচিত গীতের মিল দেখা যায়। উর্দ্দু ভাষায় 'তুতিনামা'র অনুবাদের ভাবানুবাদ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সচিত্র শুক-শারি উপন্যাস'। গদ্যে লিখিত চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[১]

'শুকশারি উপন্যাস'-এ বহু বিচিত্র ধরণের প্রেমের গান, এবং প্রেমের গান লিখবার বহু বিচিত্র পদ্ধতি দেখা যায়। বাংলা টপ্পা গান 'তুতিনামা'-দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল কিনা, কোন সূত্রে বাংলা গানে 'তুতিনামা'র সংক্রাম হয়েছিল, তা আলাদা গবেষণার বিষয়। কিন্তু 'শুকশারি উপন্যাস'-এর গান ও বাংলা টপ্পার ভাব-সাদৃশ্য সন্দেহাতীত। যেমন :

শুকশারি উপন্যাস : ভৈরবী, আড়াঠেকা।

মনের যে সাধ মন মনে বুঝি মিটাইল,
কেবল বিষাদ আসি ক্রমে বাড়িতে লাগিল ॥
এ দুঃখ না মনে সহে, সতত অন্তর দহে,
কেন দহে প্রাণ রহে, মরি মম কি হইল ॥[২]

* * * *

নিধুবাবু : মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল (দেওরা রে)
তোমার সাধনা করি সাধ না পূরিল
সাধিয়ে আপন কাজ, এখন বাড়িল লাজ,
আমার সে গেল লাজ বিষাদ হইল। (গীতরত্ন, ১৪১)

---

১. রমাকান্ত ত্রিপাঠী সম্পাদিত, ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী থেকে প্রকাশিত সংস্কৃত 'শুক-সপ্ততি'র ভূমিকায় (পৃষ্ঠা ৯-১৮) ভারতীয় সাহিত্যে তোতা-ইতিহাসের প্রভাব বর্ণিত।

২. 'সচিত্র শুক-শারি উপন্যাস', উর্দ্দু ভাষায় "তুতিনামা". ইংরেজি ভাষায় 'টেল্‌স্ অফ্ প্যারট্' ও অন্যান্য গল্পের আভাষ লইয়া লিখিত গল্প-পুস্তক। শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক গদ্যে লিখিত। (শ্রাবণ, ১৩৩৫ সাল, সপ্তমবার মুদ্রিত), পৃষ্ঠা, ১০৪

'সচিত্র শুক-শারি উপন্যাস'-এ একটি প্রেমের গান এভাবে লিখিত আছে :

প্রেম নাম কিবা প্রা
মম মন নিরন্তর

দুর্ঘটনা গমনে অপরাধ অধিনী	র	ব্যাঘাত ঘটায়। না লইবে তায়

বহির তোমায়।
তোমাকেই চায়॥

১

'সচিত্র শুক-শারি উপন্যাস'-এ এ-রকম অনেক ছক আছে।[২]

এ-কথাও অনস্বীকার্য যে, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাব নিধুবাবু কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। 'গীতরত্ন' গ্রন্থে মানিনী, বালা, মুগ্ধা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিত-ভর্তৃকা, কলহান্তরিতা, অভিসারিকা নায়িকাদের চিত্রণ দ্রষ্টব্য। 'দক্ষিণ' নায়কেরও অভাব নেই।

একটি তথ্য প্রসঙ্গত লক্ষ করা যাক। 'গীতরত্ন'-তে অনেক গানেই নায়ক অভিমানী ও বাঙালি। সংস্কৃত কবিতার নায়কেরা অভিমান বিশেষ প্রকাশ করেননি। ইঙ্গলস্ লিখেছেন :[৩] "A convention that sets Sanskrit at odds with European literature is that within the mood of love jealousy may be expressed by a woman but not by a man...A man may express jealousy, but by doing so he shifts

the mood to the comic. Doubtless the reason for this convention is that in a polygamous society the code of love can not demand a strict fidelity from the lover..." বোধহয়, বৈষ্ণব-কাব্যের মান প্রকরণেই অভিমানী নায়কের প্রথম আবির্ভাব হয়েছে। শ্রীরাধার "দুর্জয় মানে" ব্যথিত শ্রীকৃষ্ণ রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলেন। কবিওয়ালা রাম বসুর গানে আছে: "শ্যাম কাল মান করে গেছে। কেমন আছে, সখি দেখে আয়"। নিধুবাবুর একটি গানের প্রথম চরণ: "আর আলে না প্রাণ! মান করে যে গেলে!"[১]

নিধুবাবুর কবিতার ঋতুমণ্ডল বর্ষা, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরৎ। শীত ও হেমন্ত অনুল্লিখিত। নিধুবাবুর গানে প্রকৃতির বর্ণনা প্রায় নেই; যা আছে, তা অগভীর ভাবোদ্দীপক। চিরন্তন প্রেম ও বিরহের প্রতীকরূপে নিধুবাবু বহু গানে প্রচল নির্ভর কমলিনী ও ভ্রমরের, চাতক ও চাতকীর উল্লেখ করেছেন। এরাই বহু গীতে নায়ক নায়িকা। পরবর্তীকালে দাশরথি রায় তিন পর্যায়ে নলিনী ও ভ্রমরের বিরহ সম্পর্কে যে প্রকাণ্ড পাঁচালী লেখেন, তা কিঞ্চিৎ স্থূলভাবে আদিরসাত্মক। নিধুবাবুর নলিনী-ভ্রমর দাশু রায়ের পাঁচালীতে লম্পট নায়ক ও গ্রাম্য নায়িকায় রূপান্তরিত হয়েছে।[২]

প্রেমের মধ্যে দুঃখের বোধ না থাকলে তা উপভোগ্য হয় না—এই উপলব্ধি নিধুবাবুর অনেক টপ্পায় অনুভব করা যায়। বাংলা কবিতায় বিরহ ছিল, বিচ্ছেদ ছিল, দুঃখ ছিল—কিন্তু দুঃখ না থাকলে প্রেম উপভোগ্য হয় না, এ-কথা শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনেই আছে। প্রেমের এই বোধ নিধুবাবু বৈষ্ণব দর্শন থেকে পেয়েছিলেন কিনা, জানি না। কিন্তু বাংলা কবিতায় এই ভাব অভিনব। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে এই বোধ ছিল মধ্যযুগ থেকেই। কিন্তু নিধুবাবু যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে প্রেমের এই সংজ্ঞার্থ আহরণ করেছিলেন, তা প্রমাণ করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। প্রেমের কথা বলতে গিয়ে নিধুবাবু বহুবার 'মন', 'মনন' ও 'অন্তরের' কথা বলেছেন। খেঁউড় যাকে বলে, নিধুবাবুর গানে তার নামগন্ধ নেই; প্রেম আর মনন, তাদের অন্তর্নিহিত গভীর সম্পর্ককে তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন।

---

১. 'বাঙ্গালীর গান', ১৫২, 'গীতরত্ন', ৮৩
২. 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী', ৭২৫, ৭৩২, ৭৭৩

একটি মাত্র টপ্পায় খোলাখুলি ভাবে পরকীয়া প্রেমের কথা আছে। গানটির প্রথম চরণ : "আসিবে হে প্রাণ কেমনে এখানে", (গীতরত্ন, ১৩৫) পরকীয়া প্রেম প্রধানতঃ 'প্রভাতী' গানগুলির বিষয়বস্তু। কিন্তু সে-গানেও "দেওরা ওরে"—এই রীতি-সম্মত (stylized) ভণিতা ছাড়া আপত্তিজনক আর একটি কথাও নেই। কাব্য-সাহিত্যে উদার ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাব সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে-সব "আসরী খেস্‌সা খেঁউড়"[১] লেখা হয়েছিল, তাদের স্থূলতার সঙ্গে প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে রচিত নিধুবাবুর গানের 'কোমলকান্ত' ভাব ও ভাষার কোনরূপ তুলনাই হতে পারে না।

নিধুবাবুর সমকালীন গদ্যের গঠন কি ছিল, গানের ভাষার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি, এ-প্রসঙ্গ বোধ হয় ওঠে না। রামপ্রসাদ ছাড়া সে-যুগে যাঁরা ভক্তির গান লিখেছিলেন, তাঁদেরও অনেকের ভাষা অত্যন্ত সংস্কৃত ঘেঁষা ও কঠিন।[২] কবিগানের ভাষাও এ-রকম, যথা : "গেল গেল কুল কুল, যাক্-কুল,-তাহে নহ আকুল। লয়েছি যাহার কুল, সে আমার প্রতিকুল॥ যদি কুলকুণ্ডলিনী অনুকুলা হন আমায়। অকূলের তরী কূল পাব পুনরায়॥ এখন ব্যাকুল হয়ে কি দুকূল হারাব সই। তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয়॥" এই উদ্ধৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "পাঠকেরা দেখিতেছেন, উপরি-উদ্ধৃত গীতাংশে এক কুল শব্দের কূল পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে।"[৩] বিদগ্ধ, শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য রচিত কবিতার ভাষাও এ-রকম ছিল :

"হেরে চৌদিগে কামিনী লক্ষ লক্ষে। সমক্ষে পরোক্ষে গবাক্ষে কটাক্ষে॥ কতি প্রৌঢ়রূপা ও রূপে মজন্তি। হসন্তি স্খলন্তি দ্রবন্তি পতন্তি॥ কত চারুবক্ত্রা সুবেশা সুকেশা। সুনাশা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা॥ কত ক্ষীণ মধ্যা সুভঙ্গা সুযোগ্যা। রতিজ্ঞা, রসজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা॥ দেখি চন্দ্রভাগে কত চিত্তহারা। নিকারা বিকারা বিহারা বিভোরা॥ করে দৌড়াদৌড়ি মদমত্ত প্রৌঢ়া। অনূঢ়া বিমূঢ়া নবোঢ়া নিগূঢ়া॥[৪]

১, 'মনোমোহন গীতাবলী', ৫১-৫২

২ 'গীত রত্নমালা', ১. তৃতীয় অধ্যায়ের গানগুলি দ্রষ্টব্য।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লোকসাহিত্য', ৮০ ৮১

৪. 'হরিলীলা', দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত। (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯২৭), রচনাকাল, ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ, দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা।৶০, উদ্ধৃতি, ৫৭-৫৮, এই অংশ আনন্দময়ীর রচনা।

লিখিত গদ্য তখন তৈরি হচ্ছে, কোনো স্পষ্ট চেহারা বা স্বচ্ছন্দ গতি পায়নি,—সেই জন্যই আড়ষ্ট ও দুরূহ। কিন্তু সমকালীন কাব্যভাষার বিচারেও নিধুবাবু অসাধারণ স্বাচ্ছন্দের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর গানের বাণী কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচল-নির্ভর হয়েও সরল ও অনাড়ষ্ট। যেমন :

অনেক যতনে তোমারে পেয়েছি (১৬); অনিবারে দহে মন (১৪); আগে কি জানি প্রাণ বিরহে যাবে ? (১৩৯); আপন রুচি রুচির চির তার (৫১); কাজল নয়নে আর দিও না কখন (৮); কিছু তারে বোলো না, বোলে কি হবে বল ? (১৯); ছাড়িলে তো ছাড়া নাহি যায় (৯৮); তুমি কি জানিবে আমার মন, মন আপনারে আপনি জানে না (৭৮); তুমি কি রাজা হলে প্রাণ আমার দেশেতে (১২৬-১২৭); নানান দেশে নানান ভাষা (৯৮); নয়নে নয়নে আলিঙ্গন, মনে মনে মিলিল (১১২); নয়ননীরে কি নিবে মনের অনল (১২৫); বিধুমুখে মৃদু হাসি ভালবাসি প্রাণ (৩৬), মৃদু মৃদু হাসি, প্রাণ, মনের তিমির নাশে (১৭); **প্রাণের আকার কেহ দেখেছ ?** (৩৭, দ্বিতীয় চরণ)। (বন্ধনীতে প্রদত্ত সংখ্যা 'গীতরত্নের' পৃষ্ঠা সংখ্যা)

কবিওয়ালাদের মধ্যেও কেউ কেউ (যেমন রাম বসু, ও পরবর্তীকালে গদাধর মুখোপাধ্যায়) বহু আধুনিক কথ্যপদ ব্যবহার করেছিলেন। রামবসু জন্মগ্রহণ করেন ১৭৮৬ সালে ; ৪২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ওপর নিধুবাবুর প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। গদাধর মুখোপাধ্যায় ছিলেন পেশাদার কবিগান রচয়িতা।[১]

রামবসুর আধুনিক ভাষা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত :

"তোমার প্রেম হ'তে প্রাণ বিচ্ছেদ আমায় ভালবেসেছে।
প্রেম হ'ল আর ফুরাল,
চ'খে দেখতে দেখতে গেল,
জন্মের মত বিচ্ছেদ আমার অন্তরে পশেছে।"[২]

১. **'বাঙ্গালীর গান,' ১৯৭, ১৪৮**

২. **বাঙ্গালীর গান', ১৬০**

নীলু ঠাকুরের দলের জন্য গদাধর মুখোপাধ্যায় এই গানটি লিখেছিলেন :

"নিকুঞ্জেতে রাধা'শ্যাম ছিলেন উভয় ;
নিশি অবসান, গাত্রোত্থান করিয়ে প্যারী শারীশুকে কয়,
দেখ ! গগনের চাঁদ অস্ত গেছে ;
আমার মন কুমুদের চাঁদ, সাধের কালাচাঁদ, কুঞ্জে নিদ্রাগত হয়ে আছে।
শ্যামকে না বলে ত যাওয়া নয়,
ডাকলে নিদ্রাভঙ্গ হয়,
নিদ্রাভঙ্গ করতে না পারি।
দেখো কালাচাঁদকে, হে শুকশারি !
রেখে প্রাণের কৃষ্ণ তোদের ঠাঁই,
প্রভাতকালে গৃহে যাই,
দেখো, দেখো,
কুঞ্জে একাকী রইলেন কুঞ্জবিহারী।
কুলবতী, আর তো রইতে না পারি

যদি বল, যাওয়া অনুচিত হয়, না গেলে নয়,
কুলকামিনী। যামিনী প্রভাতে থাকা কি সম্ভব হয় ? ইত্যাদি।[১]

এখানে লক্ষণীয়, গদাধর মুখোপাধ্যায় "না পারি" লিখেছেন, "নারি" লেখেননি।

আরো একটা দিক লক্ষ করা যায়। কবিওয়ালাদের আসর, নিধুবাবুর গান, একটা সময়ে এই সব জনচিত্তের নিকট আত্মীয় হয়ে পড়েছিল। নিধুবাবুর গান অবশ্য জনসাধরেণের জন্য পরিকল্পিত ছিল না,—কিন্তু টপ্পাগানের অন্তর্নিহিত মানবিকতার আবেদন শুধু নবাধনিক সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল না। পরে, একটা সময়ে, কবিতা যত শিক্ষিত হল, ততই তা জনচিত্ত থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। পরে আর কখনও কবিতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের এ-রকম নিবিড় যোগাযোগ হয়নি। তার কারণ কি এই যে, শিক্ষিত বাংলা ভাষার সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্পর্শ বেশি হল ? তার কারণ কি এই যে, এর পর থেকে

১. 'গীতরত্নমালা' ১, ৫৩২-৫৩৩

বাংলা কবিতা ও গান লিখলেন মধ্যবিত্ত বাঙালি,—যাদের সঙ্গে বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের যোগযোগ ছিল ক্ষীণ? তার কারণ কি এই যে, এরপর বাংলা কবিতা কেবল মধ্যবিত্ত আশা-নিরাশা ও ভাব-বিলাস নিয়েই মেতে থাকলো?

বলতেই হয়, সারল্যই কবিতার সফলতার কারণ হতে পারে না। কখন-কখন বিষয় অনুযায়ী ভাষাকে হতে হয় গম্ভীর, বহুস্তর, জটিল, শিক্ষিত, ও সুদূরস্পর্শী। তা-ছাড়া, মাইকেলের পর থেকে কিছুদিন মহাকাব্যের আড়ম্বর কবিদের সম্মোহিত করে রেখেছিল। তাই এই সব ছোটো ও সরল গানের ভাব ও ভাষা কিছু কালের জন্য লোপ পেয়েছিল। কেউ কেউ ভেবেছিলেন, শুধু ঈশ্বরগুপ্তের রঙ্গব্যঙ্গ ও আমোদ প্রমোদেই বুঝি ও-ভাষা মানায়। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর গদ্যেও অসাধারণ সরল ও অনাড়ম্বর ভাষাবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন।[১] পরে অবশ্য—ইতিহাস জানে—বাংলা কবিতা নিরলঙ্কার, সরল হতে চেয়েছিল।

কালক্রমে বাংলা সাহিত্য হল সমান্তরাল দুই পর্যায়ের। একটা শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের; আরেকটা ক্ষীণকায়, নিস্তেজ, অশিক্ষিত, কিন্তু গ্রাম-বাংলার মানুষের কাছাকাছি।

---

১. ঈশ্বর গুপ্তের বাংলা রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত: "এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি,—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই...আমরা "বৃত্র সংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষপার্বণ" চাই না।" (বঙ্কিম রচনাবলী, ২, ৮৩৬)

নিধুবাবুর টপ্পা

নিধুবাবু বিখ্যাত হয়েছিলেন টপ্পা লিখে ও টপ্পা গেয়ে। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন: "বাঙ্গালা গীতে রাগস্বরের ব্যাপারে ইনি যদ্রূপ ক্ষমতা প্রকাশ করেন, তাহাতে সরিমিঞার অপেক্ষা ইহাকে কোন অংশেই ন্যূন বলা যাইতে পারে না। ইহার প্রণীত টপ্পাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন হিন্দুস্থানে 'সরির টপ্পা', তেমন বঙ্গদেশে নিধুর টপ্পা'..."[১]

বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম নিধুবাবুই টপ্পা গান লিখেছিলেন কিনা, তা জানা নেই। তাঁর সমসাময়িক কবি ও গায়ক 'কালী মির্জা' এবং রাধামোহন সেন দাস' রচিত টপ্পা-অঙ্গের গান আছে।[২] সুশীলকুমার দে লিখেছেন: Ramnidhi Gupta···*was the earliest and by far the most important writer* of this group." তারপরেই তিনি লিখেছেন: "*It is not clear whether Nidhu Babu was the first dealer* in this new specis, or whether it was he who introduced it into Bengali."[৩] (Italics ours.) ঈশ্বর গুপ্ত নিধুবাবুকে প্রথম টপ্পা-রচয়িতারূপে বিচার করেননি। তাঁর মতে, "ইহাঁর প্রণীত টপ্পাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"[৪] মনোমোহন বসু শান্তিপুরের গায়কদের টপ্পার সুরে অশ্লীল খেঁউড় গাইবার উল্লেখ করেছেন।[৫]

"নিধুর টপ্পা" কি সুরের বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ? নিধুবাবু খুব [illegible] গায়ক ছিলেন; কিন্তু নিধুবাবুর সুর-জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে মতের বিভিন্নতা দেখা যায়। কৃষ্ণানন্দব্যাস রাগসাগর 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম'-এর তৃতীয় খণ্ডে কালী মির্জা-রচিত গান সবচেয়ে বেশি সমাহৃত করেছেন।[৬] জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক 'সঙ্গীত রসমাধুরী' গ্রন্থে (১২৫১ সাল) "অস্মদাদির জন্মভূমি বঙ্গরাজ্যে সঙ্গীত শাস্ত্র প্রচার করণের মূলাধার মহাকবি ৺প্রাপ্ত রাধামোহন সেন মহাশয়" রচিত

১. 'কবিজীবনী', ১১৫; 'গীতরত্ন', ৮/০

২. 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম' (১২৫২) তৃতীয় খণ্ড, ও 'সঙ্গীত তরঙ্গ' (১২২৫) দ্রষ্টব্য।

৩. S. K. De, *Bengali Literature*, 351-352.

৪. 'কবিজীবনী, ১১৫

৫. 'মনোমোহন গীতাবলী', ৶৷০

৬. 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম' (১২৫২), তৃতীয় খণ্ড, 'বাঙ্গালা রঙ্গীন গান' দ্রষ্টব্য।

'সঙ্গীততরঙ্গ' (১২২৫ সাল) গ্রন্থের উল্লেখ করে লিখেছেন : তাঁর ঋণ "জন্ম-জন্মান্তরেও বিস্মরণ হইবার নহে।"[১] অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থে অনেক ক্ষেত্রে রাধামোহনের মতের প্রামাণ্যতা স্বীকার করেছেন।[২] কিন্তু মনোমোহন বসু লিখেছেন: "নিধুবাবু [টপ্পা গান] যেরূপ সুমার্জ্জিত, সুবর্দ্ধিত ও সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া তুলেন,—এমন আর কি পূর্ব্বে, কি পরে, কেহই পারেন নাই।"[৩]

এক সময় টপ্পা সম্পর্কে অজ্ঞতা, এবং অজ্ঞতা-সঞ্জাত অবজ্ঞার সৃষ্টি হয়েছিল। অনাথকৃষ্ণ দেব কবিগানের টপ্পা, অথবা লহর নামে এক ধরণের গানের একটি উদাহরণ দিয়েছেন। এ-গানের ভাব ও ভাষা অশ্লীল। বিষয়বস্তু পারিবারিক ব্যভিচার প্রসঙ্গে মগধরাজ জরাসন্ধের কৃষ্ণনিন্দা।[৪] এ-ধরনের কুরুচিপূর্ণ গান টপ্পা রূপে প্রচলিত থাকায় টপ্পা গান সম্পর্কে একটা হীন ধারণার সৃষ্টি হয়। "সঙ্গীতের প্রতি হতাদর" হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করে গীত-রচয়িতা গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "রামনিধি গুপ্ত প্রভৃতি অনেকানেক সঙ্গীত রচয়িতারা নানাবিধ অশ্লীল সঙ্গীতের পরিচালনা করিয়া দেশের এই মহানিষ্ট সাধন করিয়া গিয়াছেন।"[৫] নিধুবাবু 'অশ্লীল সঙ্গীত'-এর পরিচালনা কোন কালেই করেননি। সে-প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করা হবে। টপ্পা গানও আসলে অশ্লীল গান ছিলনা। 'বিশ্বসঙ্গীত' গ্রন্থে বৈষ্ণবচরণ বসাক লিখেছেন:

"টপ্পার সৃষ্টি প্রধানতঃ স্ত্রীকণ্ঠের জন্যই হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, প্রথমে উহা আফগানিস্থান হইতে অস্মদ্দেশে আনীত হয়। পরে এদেশে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। টপ্পার বাক্যবিন্যাস অধিকাংশই প্রেমবিষয়ক। ইহার তাল সকল অপেক্ষাকৃত লঘু। দোষ এই যে, ইহাতে রাগরাগিনীর শুদ্ধতা সর্ব্বসময় রক্ষিত হয় না। গিট্‌কিরীই টপ্পার সর্বস্ব···টপ্পার তাল সকল অতি ক্ষিপ্র·· টপ্পার সুরে রাগরাগিনী প্রকাশের বিশেষ কোন যত্ন নাই, কেবল

১. 'সঙ্গীত রসমাধুরী' (১২৫১), ॥• ॥/•
২. 'প্রীতিগীতি' ২৸/•
৩. 'মনোমোহন গীতাবলী' ।•
৪. 'বঙ্গের কবিতা, ১, ৩২৪, S. K. De, *Bengali Literature*, 325 , on.
৫. গঙ্গাধর চটোপাধ্যায়, 'গীতহার' (১৮৭৪), পৃষ্ঠা /• , গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী, 'বাঙ্গালীর গান', ৮৬৭

তাহাদের ছায়া থাকিলেই যথেষ্ট ; আবার গিটকারী এত শীঘ্র এবং নূতন নূতন চলিতে থাকে যে, সকলেই তাহা বুঝিতে পারে, কাজেই টপ্পা মিষ্ট লাগে।

টপ্পা আস্থায়ী ও অন্তরা,—এই দুই চরণে বিভক্ত থাকে। টপ্পার অর্থ লম্ফ, অর্থাৎ সংক্ষেপ...”[১] সুশীলকুমার দে'র মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন : “Tappa, unlike Kabi, Panchali, or Yatra, was essentially Baithaki gan (or songs for the drawing room) which was appreciated chiefly, if not wholly, by the upper classes.”[২] সুশীলকুমার দে 'বাঙ্গালা শব্দকোষ'-এ লিখিত যোগেশচন্দ্র রায়ের এই মত উদ্ধৃত করেছেন : “আদি রসাত্মক গানকে যে টপ্পা বলে, এ সংস্কার ভুল।”[৩]

হিন্দুস্থানী টপ্পা সম্পর্কে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

“খেয়াল হইতে টপ্পার চং পৃথক, এবং যে সকল রাগে খেয়াল হয়, সে রাগে টপ্পা হয় না। টপ্পায় এই সকল রাগ ব্যবহৃত হয়, যথা ভৈরবী, কলিঙ্গড়া, খাম্বাজ, সিন্ধু, কাফী, (নিধুবাবুর বানান্-এ 'কাপি'), ঝিঁঝোটী, পীলু, বরবা, ইত্যাদি। খেয়ালের প্রায় সকল তালই টপ্পায় ব্যবহৃত হয়। হিন্দুস্থানী ওস্তাদগণ শোরীকৃত এবং গমদমকৃত গানকেই টপ্পা বলেন, তদ্ভিন্ন অন্য টপ্পাকে 'ঠুংরী' বলিয়া থাকেন। শোরীর টপ্পা, সচরাচর 'মধ্যমান' ও 'আড়াঠেকা' তালেই শুনা যায়। ক্যাপ্টেন উইলার্ড সাহেব বলেন,—টপ্পারীতির গান পাঞ্জাবদেশীয় উষ্ট্র চালকদের জাতীয় সঙ্গীত।[৪] জগদ্বিখ্যাত গায়ক শোরী ঐ প্রণালীর গানকে নানালঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন। সেইজন্য শোরীর টপ্পা পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত।” (১৮৩৪ সালে Wilard, A Treatise on The Music of Hindoostan লিখেছিলেন)

“খেয়ালের রাগে ও টপ্পার রাগে মিশ্রিত হইয়া যে গীত হয়, তাহাকে টপ্ খেয়াল কহে, যেমন ঝিঁঝিট-বেহাগ, ভৈরবী-বাহার, ইত্যাদি।

“টপ্পার রাগিনীতে কবালী, অদ্ধা, ঠুংরী, খেমটা, কহরবা ইত্যাদি তালে যে গান হয়, তাহাকে তাহাকে ঠুংরী কহে। পারস্য বা উর্দ্দু ভাষায় রচিত যে প্রেমবিষয়ক গান টপ্পার রাগিনীতে পোস্তাতালে গীত হয়, তাহাকে গজল্ কহে।

১. 'বিশ্বসঙ্গীত', ৭৯-৮২
২. S. K. De, op. cit. 351, fn
৩. সুশীলকুমার দে, 'নানানিবন্ধ', ১১৬
৪. রাজ্যেশ্বর মিত্র উইলার্ডের বক্তব্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 'বাংলার গীতকার', ১২৯-১৩০

রেখ্‌তা বা রুবাই নামক গানও গজল্‌-এর ন্যায়। (রূপচাঁদ পক্ষী 'রেক্তা' গান লিখেছিলেন—দ্রষ্টব্য, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪, ৮৪৩ পৃষ্ঠা)

"তিন স্বরের কম তান হয় না, যত বেশি ইচ্ছা হইতে পারে। এই প্রকার তান ধ্রুপদে ব্যবহার করা হয় না, ইহা কেবল খেয়াল এবং টপ্পাতেই ব্যবহৃত হয়।

"টপ্পাতে সাদা গিট্‌কারী ব্যবহৃত হয়।[১]

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় "শোরী মিঞা" সম্পর্কে লিখেছেন: "ইনি মোহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ছিলেন। ইনি টপ্পা গানের চরম উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। মোহম্মদ শাহের রাজত্বকাল ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সঙ্গীত সারে···লিখিত আছে যে, অযোধ্যানিবাসী গুলামনবী নামক এক ব্যক্তি টপ্পা রচনা করিয়া তাঁর প্রণয়িনী শোরীর নামে ভণিতা দিয়া গাইতেন, এই জন্যই শোরী টপ্পা প্রণেতা বলিয়া খ্যাত। প্রায় ৭৬ বৎসর অতীত হইল, গুলামনবী ৫০ বৎসর বয়ঃক্রমে লক্ষ্ণৌ নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন। (সঙ্গীতসার, ৩৮৬ পৃষ্ঠা)[২] ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'সঙ্গীত সার'-এর প্রথম সংস্করণ ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। অতএব, 'শোরী মিঞা'র মৃত্যু হয়েছিল ১১৯৯ সালে; তখন নিধুবাবুর বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করেছে। 'শোরী মিঞা' নিধুবাবুর চেয়ে এক বছরের ছোট ছিলেন। ১১৪৯ সালে 'শোরী মিঞা'র জন্ম হয়।

"হমদম—ইনিও একজন বিখ্যাত টপ্পা গায়ক; ইহার রচিত অনেক টপ্পা দেখিতে পাওয়া যায়।"[৩]

'বাঙ্গালীর গান'-এ 'শোরী মিঞা' রচিত ১৭টি টপ্পা সংগ্রহ করা হয়েছে। সব টপ্পাই 'শোরী মিঞা' রচিত কিনা, জানা নেই। দুটি নমুনা দি।

(১) ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

ইয়ার্‌ ইয়ার্‌ হুঁদাবে জানী, বখেরা দিদার।
অরি যো মর্গ শরা ইস্ক্‌ দিবানাবি মন্তু,
কেয়া সক্তায়্‌ সৈদা বাদ্‌ ন মুদ্‌ জানী বখেড়া দার।
অরি যো মর্গ শরী ইস্ক্‌ দমগনি মে থোড়া শোরী কহে॥

১. গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা', ১, ১৭-১৯, ৪৭, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, 'সঙ্গীতসার', (২য় সং ১২৮৬), ৩৪-৩৬

২. 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা', ১, ৪৯, পাদটীকা,-১২

৩. তদেব, ৪৯, পাদটীকা,-১৩

(২) সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

ও জটী সাঙ্গমানলে, জাঁদিয়া খাঁ গম্ তেরে মেয় তেরে শোয়ে।
লোগোঁদি বদনামে সোঁ, ডর মত শোরী,
তু ত আপনা জনম তেরি সোঁ ॥[১]

হিন্দুস্থানী টপ্পা সম্পর্কে বহু সঙ্গীতজ্ঞ লেখক আলোচনা করেছেন; কিন্তু বাংলা টপ্পা সম্পর্কে আলোচনা নেই বললেই চলে। বাংলা টপ্পা সম্পর্কে 'বাংলার গীতকার' (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে রাজ্যেশ্বর মিত্র কিছু মূল্যবান কথা লিখেছেন।

সেকালে ভক্তিরসের ধ্রুপদগান বাংলাদেশে জনপ্রিয় ছিল। ধ্রুপদে প্রণয়-গীতের কোমলতা, অথবা কারুণ্য ফুটিয়ে তোলা যায় না। "এই মস্ত বড় অভাব মিটিয়ে দিলে টপ্পার দানাদার তান। এক একটি তানের ভিতর দিয়ে এক একটি ব্যাকুলতা যেন মর্ম স্পর্শ করে যায়। নিধুবাবু বুঝতে পারলেন যে, বাঙলার মত নমনীয় ভাষায় টপ্পার মাধুর্য ঢেলে দিতে পারলে সে গান প্রাণকে একেবারে গলিয়ে দিতে পারবে। তাই এদিকটাতেই তিনি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন। টপ্পার মধ্যেও আবার নিধুবাবুর টপ্পা অন্য জিনিস। তিনি তেমন গোঁড়াভাবে পশ্চিমী টপ্পার অনুসরণ করেননি। ওদিককার টপ্পায় দ্রুত তানের কাজটা বেশি, কিন্তু নিধুবাবুর টপ্পায় এক একটি সুরের ওপর আলাদা আলাদা আন্দোলন, তাতে করে গানের করুণ রসটি যেন আরো নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে আসে। উঁচুদরের গানের মধ্যে বাংলার নিজস্ব জিনিস হচ্ছে টপ্পা···বাঙালীর ভাবুকতা টপ্পার রসে ঢালা"।

"···নিধুবাবুর টপ্পা ও পশ্চিমী টপ্পা এক জিনিস নয়। পশ্চিমী টপ্পায় তানের কাজটা খুব দ্রুত কিন্তু নিধুবাবু এই তানে এক একটি সুরের ওপর একটা আন্দোলনের ভাব নিয়ে এলেন যাতে করে টপ্পার করুণ রসটি মূর্ত হয়ে ওঠে।"[২]

এই আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, টপ্পা-গান হিন্দু ও মুসলমানি সঙ্গীতাদর্শের একটি সুপরিণত ফল। হিন্দুস্থানী টপ্পার পরিবর্তন সাধন করে নিধুবাবু বাংলা ভাষায় টপ্পা-জাতীয় গান লিখেছিলেন ও গেয়েছিলেন। তার ফলে নিঃসন্দেহে বাংলা গানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

১. 'বাঙ্গালীর গান', ৯৯৫, 'শোরী মিয়া'র আবির্ভাবকাল দুর্গাদাস লাহিড়ীর মতে 'একাদশ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভ'

২. রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'বাংলার গীতকার', ১৫-১৬, ১২০, ১২৪; ১২৬

রাজ্যেশ্বর মিত্র লিখেছেন: "টপ্পা আমাদের গৌরবের বস্তু এই কারণে যে, টপ্পায় বাঙালী শিল্পীর স্বকীয়তার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।"[১]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নূতন বাংলা প্রেমের কবিতার উদ্ভাবনায় উত্তর ভারতে প্রচলিত সঙ্গীত ঐতিহ্য বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলা টপ্পা-গান তার প্রমাণ। পাশ্চাত্ত্য কাব্যাদর্শের আবির্ভাবে এই প্রভাব ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।[২]

পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেই বাঙালী কবি প্রেম সম্পর্কে ব্যক্তিগত অনুভূতির অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, এ-ধারণা সত্য নয়। কারণ, ব্যক্তিগত প্রেমের সুন্দর প্রকাশ পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত টপ্পা-গানেও বিলক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ-ও টপ্পার আঙ্গিকে গীত রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর টপ্পার প্রভাব সম্পর্কে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "হিন্দুস্থানী টপ্পার অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গান রচনা করিয়াছিলেন, যথা, "এ পরবাসে রবে কে", "একি করুণাময়" ইত্যাদি। আবার "সার্থক জনম আমার", "কোথা যে উধাও হলো" ইত্যাদি গানগুলিতে টপ্পার অলঙ্করণ দেখিতে পাওয়া যায়।"[৩] রবীন্দ্রনাথের কীর্তনাঙ্গগান, যথা, "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই", "তোমায় নতুন করেই পাব বলে" গান দুটি ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে টপ্পা-প্রভাবিত।[৪] তিনি তিনটি প্রচলিত হিন্দুস্থানী টপ্পা ও তিনটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর-সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। যথা:

হিন্দুস্থানী টপ্পা।	রাগ ও তাল।	রবীন্দ্র-সঙ্গীত
ও মিঞা বেজনুওয়ালে	সিন্ধু, মধ্যমান।	এ পরবাসে রবে কে।
বে পরিয়া তাঁড়ে।	সিন্ধু, মধ্যমান।	কে বসিলে আজি।
মিঞা বে মানুড়ে।	ঝিঁঝিট, মধ্যমান।	হৃদয় বাসনা পূর্ণ হোল।[৫]

১. তদেব, ১৩১

২. ডঃ ব্রহ্মানন্দ নামক একজন হিন্দী লেখক অবশ্য সিদ্ধান্ত করেছেন: "নিধুবাবু কো ইন্ লঘু-প্রণয় গীতো অথবা টপ্পা কী প্রেরণা হিন্দী-সংগীত সে হী মিলা হৈ।" ছাপরায় হিন্দুস্থানী গান শেখার প্রমাণ ছাড়া লেখক এই সিদ্ধান্তের জন্ম আর কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি। দ্রষ্টব্য, 'বাংগলা পর্ হিন্দী কা প্রভাব' (হিন্দীগ্রন্থ) দিল্লী, ১৯৬২; ২৪৮-২৫১ পৃষ্ঠা।

৩. ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সঙ্গীতদর্শিকা' ২য় সং, ১৩৭৪, ২, ১০৫

৪. তদেব, ১০৫

৫. তদেব, ১০৬

দ্বিতীয়বার বিলাত যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ বেথুন সোসাইটির এক অধিবেশনে গান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সে-সম্পর্কে 'জীবন-স্মৃতি'-তে তিনি লিখেছেন : "বাংলাদেশে বহুকাল হইতে কথারই আধিপত্য এত বেশি যে এখানে বিশুদ্ধ সংগীত নিজের স্বাধীন অধিকারটি লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য এ-দেশে তাহাকে ভগিনী কাব্যকলার আশ্রয়েই বাস করিতে হয়। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর গান পর্যন্ত সকলেরই অধীন থাকিয়া সে আপনার মাধুর্য-বিকাশের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ...এদেশে গানও তেমনি বাক্যের অনুবর্তন করিবার ভার লইয়া বাক্যকে ছাড়াইয়া যায়"।[১] নিধুবাবুর গানের কথার অন্তরালে সুরের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিধুবাবুর গানের সুর রবীন্দ্রসঙ্গীতে আছে কিনা,—অথবা থাকলেও, তা কি ভাবে আছে,—তা-নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। 'গীতবিতান'-এ 'গ্রন্থপরিচয়' প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে : "...প্রচলিত বিলাতি, বৈঠকী, বা লোক-সংগীতের আত্মীকরণ এবং প্রথম জীবনের কিছু রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরযোজনার কথা ছাড়িয়া দিলে, রবীন্দ্রনাথের নামে প্রচারিত সব গানের সুরস্রষ্টাও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ"।[২] এখানে বলা আবশ্যক যে, প্রথম যৌবনে তিনি অক্ষয় চৌধুরী এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহচর্যে বহু গান রচনা করেছেন, বহু গানের সুর দিয়েছেন। অক্ষয় চৌধুরীর " হরুঠাকুর, রামবসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি ...অনুরাগের সীমা ছিল না।"[৩] অক্ষয় চৌধুরীর সাহচর্য-প্রভাবে নিধুবাবু বা শ্রীধর কথকের টপ্পার সুর যৌবনে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতে সঞ্চারিত হয়েছিল,—এ-কথা বলা বোধহয় যুক্তিসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা' ১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই বইতে মোট সাতাশটি গান "হিন্দিগান-বিশেষের রাগরাগিনী অনুসারে রচিত" হয়েছিল। "গানের বহির পরবর্তী গ্রন্থসমূহেও হিন্দিভাঙা গানের অসদ্ভাব নাই"।[৪] এ-সব তথ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ওপর প্রচলিত বাংলা টপ্পার প্রভাবের কথা কিন্তু বলা হয়নি।

১. 'রবীন্দ্র রচনাবলী', জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) দশম খণ্ড, ৯৫
২. 'গীতবিতান', (১৩৫৭), ১০০৩ পৃষ্ঠা
৩. 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (পশ্চিমবঙ্গ সরকার), (১০) ৬০
৪. 'গীতবিতান', ১০০৯-১০১০ , ইন্দিরা দেবী, 'রবীন্দ্র সংগীতের ত্রিবেণী সংগম', 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' (১০-১২, ১৩৫৬), ২০২-১৪

গানের যুগের অন্যান্য কবি

পরাধীনতার প্রথম যুগে বহু কবি শুধু প্রেমের গান লিখেছিলেন, কখন কখন ভক্তির গানও লিখেছিলেন। বাংলার ইতিহাসে এ-এক অদ্ভুত ঘটনা। বিদেশী শাসক অবাধে শোষণ করছিল। আর দেশের কবিরা অবাধে ধর্মের, অথবা প্রেমের গান লিখছিলেন। অথচ, পল্লী-অঞ্চলে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৬ বার প্রজাবিদ্রোহ হয়।[১] মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে জনজীবনের যে বর্ণাঢ্য ছবি আছে, ভারতচন্দ্রের নগর বর্ণনায়-ও তা কিছুটা দেখা যায়। ভারতচন্দ্র গ্রামের কবি নন, সহরের কবি। রামপ্রসাদের কিছু গানে অভিযোগের ভাষায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য মর্মন্তুদ ভাবে চিত্রিত।[২] কিন্তু নিধুবাবুর যুগের অজস্র-'রঙ্গীন গান'-এ পরাধীন, শোষিত, এবং "পদদলিত" বাঙালিদের আশা আকাঙ্খার কোনো উল্লেখ নেই। জন-জীবন থেকে নাগর পরিবেশের এই বিচ্ছিন্নতা নবাবী আমলেও ছিল। কিন্তু কলকাতার নব্যধনী 'পুঁটে তেলী' ও 'গবোমুন্সী'-র দল, ইংরেজ শাসকদের ও নিজেদের স্বার্থে এই বিভেদ সুসম্পন্ন করেছিল। তারই এক তিক্ত-মিষ্ট ফল 'বাঙ্গালা রঙ্গীন গান', যেখানে শুধু কোমলকান্ত বিরহের খবর। দৃষ্টিভঙ্গীর এই সংকীর্ণতা, এই আধ্যাত্মিক দুর্বলতা, শুধুই প্রেম নিয়ে "রাত্রিদিন ঝকঝকি" (গীতরত্ন, ১১৮) একটা অস্বাভাবিকতা। প্রেম সম্পর্কে এই সব কবিদের মধ্যে ক'জনের নিবিড় উপলব্ধি ছিল, অথবা সেই উপলব্ধি প্রকাশ করার যোগ্যতা ছিল,-তা-ও হয়তো জিজ্ঞাসা করা যায়।

নিধুবাবুর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে যাঁরা প্রেমগীতি রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন, তাঁদের মধ্যে কালিদাস চট্টোপাধ্যায়,[৩] রাধামোহন সেনদাস,[৪]

১. সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', ১, ৩-১৫৬।

২. "শ্যামা! দুটো মনের কথা কই। কে বলে মা তোরে দীনদয়াময়ী"—ইত্যাদি। 'গীত-রত্নমালা', ১, ৩৮৪-৩৮৫।

৩. 'গীতলহরী' (১৯০৪), অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত; 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম' (১২৫২) ৩, ২০৯-২৩৬; 'বাঙ্গালীর গান', ৩০১।

৪. 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' ১, ১১৬-১২১, 'সঙ্গীততরঙ্গ' (১৩১০), হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়,[১] আশুতোষ দেব,[২] কাশীপ্রসাদ ঘোষ,[৩] শ্রীধর কথক,[৪] জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক,[৫] ও যদুনাথ ঘোষের নাম[৬] উল্লেখযোগ্য। অবিনাশচন্দ্র ঘোষের মতে যদুনাথ ঘোষ "সাবেক গীতরচয়িতাদের শেষাবশেষ"।[৭] এঁরা প্রায় একই কালে একই রীতিতে গান লিখেছিলেন, তাই তাঁদের ভাবে ও ভাষায় স্বাভাবিক সাদৃশ্য বর্ত্তমান।

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় অথবা 'কালীমির্জা'র কথা আগে বলা হয়েছে। তিনি প্রথমে বর্ধমানের যুবরাজ প্রতাপচাঁদের সভাসদ্ হয়েছিলেন, পরে গোপীমোহন ঠাকুরের পারিষদ। প্রতাপচাঁদ এই প্রতিভাশালী গায়ককে মাত্র ১৫ টাকা বৃত্তি দিতেন। প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে কাশীতে তাঁর মৃত্যু হয়। জন্ম হয়েছিল পলাশীর যুদ্ধের সাত-আট বৎসর আগে, গুপ্তিপাড়ায়, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে।

'সঙ্গীতরাগ কল্পদ্রুম'-এর তৃতীয় খণ্ডে কালীমির্জা রচিত ৩৫০টির বেশি গান সঙ্কলিত হয়েছে। তাঁর গান সবচেয়ে বেশি সঙ্কলন করে খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগর নিধুবাবুর চেয়ে তাঁকেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু অনেকের মতে কাব্যবিচারে নিধুবাবুর গান কালীমির্জার গানের চেয়ে উৎকৃষ্ট। রাজ্যেশ্বর মিত্র লিখেছেন: "তবে এটা ঠিকই যে কালীমির্জার স্থান নিধুবাবুর এবং শ্রীধর কথকের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নে। এর প্রধান কারণ তাঁর রচনার কাব্যাংশ তত উৎকৃষ্ট নয়, দ্বিতীয়ত অনুপ্রাসের প্রাবল্যে কাব্যরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে।"[৮] 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম'-এ উদ্ধৃত কালীমির্জার গানগুলি

১. 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম' ৩, ১৯৩-২০৭।

২. 'জীবনীকোষ—ঐতিহাসিক' ১, ২৬৩-২৬৪, *Freedom Movement in Bengal*, Ed. N. Sinha (1968), 71-72, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র'—১, ৪৩৮।

৩. *The Calcutta Municipsl Gazette*, 13 Sept. 1930, 775-777, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১, ৫৯-৬২, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৩, ৬১১-৬১২, *Freedom Movement in Bengal*, 71-72, *The Government Gazette*, 14 Feb. 1828; যোগেশচন্দ্র বাগল, 'মুক্তির সন্ধানে ভারত', ২২।

৪. 'বঙ্গভাষার লেখক', ১, ৩৬০, বাঙ্গালীর গান', ২১১-২১৯, S. K. De, *Op. cit.* 367-369.

৫. 'সঙ্গীত রসমাধুরী' (১২৫১), ভূমিকা, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৩, ৩৩৪, ৩৪১।

৬. 'সঙ্গীত মনোরঞ্জন' (১২৬৮); 'প্রীতিগীত', ৩৲-৩/০

৭, 'প্রীতিগীতি', ৩৲, S. K. De, *op. cit.* 365-372.

৮. রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'বাংলার গীতকার', ১২৮

পড়ে মনে হয়, তিনি সুরের প্রয়োজনে কবিতা লিখেছিলেন, কাব্যের প্রয়োজনে লেখেননি। তাঁর গানের ভাষা ও ভাব নিধুবাবুর ভাষা ও ভাবের মতো আকর্ষণীয় নয়। তাঁর গানের দুটি উদাহরণ :

(১) রাগ ভৈরব। মধ্যমান। **"নারে নারে আর তারে নারে"**। ধুয়া।
তুমি জান সই, আমি যত সই, এত কে পারে।
তোমার এমত, আমার মত, যদি সারে,
ভাঙ্গিলে কি মন, আর কি কখন, গড়িতে পারে ?[১]

(২) এমন কাম্যবাণ, কে তোমায় করেছে দান ? (ধুয়া)
হের না দর্পণে মুখ, আপনি হবে সন্ধান ॥
নয়ন অক্ষয়তুণ, তাহে কটাক্ষে নিপুণ,
যদি বিধি দিত গুণ, বধিতে অনেকের প্রাণ ॥[২]

কালী মির্জার পরেই আরেকজন উল্লেখযোগ্য গীতরচয়িতা রাধামোহন সেনদাস। ১২২৫ সালে তিনি 'সঙ্গীততরঙ্গ' প্রকাশ করেন। 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম'-এ তাঁর গান সঙ্কলিত হয়নি। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন : "অনেকে সেন মহাশয়কে [রাধামোহন সেনদাসকে] শ্রেষ্ঠ কবি মধ্যে গণনা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিতে সাহস করি না। তাঁহার যেমন রচনাশক্তি ছিল, তেমন কবিত্ব শক্তি ছিলনা"।[৩] অথচ, ১৩১০ সালে 'সঙ্গীততরঙ্গ' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় হরিমোহন লিখলেন : "তিনি যেমন সুনিপুণ সঙ্গীতকলাকোবিদ, তেমনই সুদক্ষ গীতরচয়িতা ; তিনি যেমন সুগায়ক, তেমনি সুকবি।" (১১ পৃষ্ঠা)।[৪]

'সঙ্গীততরঙ্গ' পড়লে দেখা যাবে যে, রাধামোহন ভারতচন্দ্রের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। দেশী রাগরাগিণীর চিত্রকল্প বর্ণনায় তিনি অনেকক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের রীতি অনুসরণ করেছেন। তাঁর কবিতার দুটি নমুনা দিচ্ছি।

১. 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম', ৩, ২১১
২. তদেব, ২১১
৩. 'কবিচরিত', ১০
৪. 'সঙ্গীততরঙ্গ' তিনবার প্রকাশিত হয়, যথাক্রমে ১২২৫, ১২৫৬ ও ১৩১০ সালে। রাধামোহন সেনদাসের অপর সঙ্গীতপুস্তক 'রসসারসঙ্গীত' ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

স্তন কর্ম্মী

একে তো নায়ক সঙ্গে যোগ-ভঙ্গ হয়্যাছে।
রূপের ভূষণ চোরে চুরি কর্য়্যা লয়্যাছে॥
নানাশঙ্ক নানামতে নানাবাদ সাধ্যাছে।
কদম্ব-তলায় বসি বিনাইয়া কাঁন্দ্যাছে॥

… … … …

অধর-রঙ্গিমা লয়্যা বিম্বফল বাঙ্গ্যাছে।
কুচকুম্ভ মাতাঙ্গিণী মস্তকেতে ভাঙ্গ্যাছে॥

… … .. …

খসিয়া চাচর কেশ পৃষ্ঠদেশে পড়্যাছে।
নিশ্বাস প্রশ্বাস দুই দীর্ঘাকারে বাড্যাছে॥[১]

আহিরী-রাগিণীর ধ্যান।

অপরূপ রূপকূপ আহিরী রাগিণী।
ধরাতলে ধায় বেণী ধরিতে নাগিনী॥
চন্দ্র-মুখ-কুচ-কর-পদ নিরক্ষিয়া।
নলিনী বসতি কৈল সলিলেতে গিয়া॥
মধ্যদেশ, স্বদেশের ক্ষীণতার রাজা।
সেই শোকে কেশরীর ক্ষীণ হৈল মাজা॥[২]

'বিদ্যাসুন্দর'-এ ভারতচন্দ্রের রসিকতা-মিশ্রিত প্রগল্‌ভতা 'সঙ্গীততরঙ্গ' গ্রন্থে অনুভব করা যায়। প্রাকৃতিক পদার্থ, অথবা বিভিন্ন জীবজন্তুর সঙ্গে নারীদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির তুলনা ভারতচন্দ্র যে-ভাবে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে করেছেন, সে-রকম তুলনা 'সঙ্গীততরঙ্গ' গ্রন্থে সবত্রই বিদ্যমান। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে দাশরথি রায়ের কথা বলা যায়। তিনি এই কবি-প্রথার চূড়ান্ত অপব্যবহার করেছেন, যথা :

১. **'সঙ্গীততরঙ্গ'** (১৩১০), ১৪২
২. তদেব, ২৩৯-২৪০

রূপ দেখে বিশ্বরূপি ! লজ্জায় লুকায় রূপী, বদন দেখে ভেক ভেকিয়ে যায় ॥
নাক দেখে লুকায় প্যাচা, নয়নের দেখে খাঁচা, বিড়াল বিরলে কাঁদে বসে।
ধনীর ধ্বনি শ্রবণ করি, গাধা হ'লো দেশান্তরী, মেঘের সঙ্গেতে ধনী মেশে ॥
দুটি কান দেখে কানাই, হাতীর খাতির নাই, কাননে লুকায় মনোদুঃখে।
জো নোই করিতে জোব, চরণ দেখে মানিকযোড়, উড়ে গিয়েছে উড়ের মুলুকে ॥[১]

রাধামোহনের সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞান অনস্বীকার্য। কিন্তু তিনি নিধুবাবুর মত মৌলিক কবি নন। উদ্ভট শ্লোকের ওপর ভিত্তি করে তিনি বহু গান লিখেছেন।[২] তাঁর একটি গীতের পাঠান্তর নিধুবাবুর রচনারূপে প্রচলিত ছিল। গানটি এই :

"না হতে পতন তনু,—দাহন হইল আগে। ধ্রু।
মরণের দোষ-গুণ,—সই ! আর ভার নাহি লাগে ॥
দুঃখরূপ তৃণ দিয়া, চিত্ত চিতা সাজাইয়া,
আপনি বিচ্ছেদানল, প্রজ্বলিত অনুরাগে।"[৩]

নিধুবাবুর নামে প্রচলিত এই গানের পাঠান্তর :

"না হতে পতন তরু দহন হইল আগে,
আমার এ অনুতাপ তারে যেন নাহি লাগে ॥
চিতে চিতা সাজাইয়ে, তাহে দুখ তৃণ দিয়ে,
আপনি হইব দগ্ধ আপনারি অনুরাগে ॥[৪]

এই গান সম্পর্কে দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন : "প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা রাধামোহন সেনের একরূপ একটি গান আছে। ভাষা ও ভাবে সেই গানটি সম্পূর্ণ এই গানের অনুরূপ"।[৫] 'প্রীতিগীতি' গ্রন্থেও রাধামোহন সেনকে এই গানের রচয়িতারূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[৬] গানটি নিধুবাবুর 'গীতরত্ন' গ্রন্থে নেই। তবু নিধুবাবুর রচনারূপেই সুশীলকুমার দে এই গীতটির বিচার

১. 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী', ২০৯ ২১০
২. 'প্রীতি গীতি', ২৮/-২৸/০
৩. 'সঙ্গীততরঙ্গ' (১৩১০), ৩০৫
৪. 'বাঙ্গালীর গান', ৮৩
৫. তদেব, ৮৩, পাদটীকা
৬. 'প্রীতিগীতি', ৫০৬

করেছেন।[১] চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ও দীনেশচন্দ্র সেন এই গান নিধুবাবুর রচনা রূপে উদ্ধৃত করেছেন।[২] অথচ, ১২২৫ সালে প্রকাশিত 'সঙ্গীততরঙ্গ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এই গানটি মুদ্রিত হয়। গানের পাঠান্তর সম্ভবত তার পরে হয়েছে।

'বৈঠকী টপ্পা' রচনা করে'ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দুদের নেতা আশুতোষ দেব, তিনি ছা(সা)তুবাবু নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ধনী। বহু হিন্দুস্থানী গায়কের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। তাঁর বাড়ীতে বহুবার জলসা, কবি, ও হাফ আখড়াই গান অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষ্ণানন্দ ব্যাস তাঁর গানগুলি সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম'-এর তৃতীয় খণ্ডে সঙ্কলন করেন। ছাতুবাবু ভালো সেতার বাজাতেন। রাধামোহন দাসের তুলনায় তিনি কবি হিসেবে সরল ও প্রত্যক্ষ। একটি দৃষ্টান্ত:

রজনী পোহায়, নিশাপতি যায়, কি হবে উপায়, ধরি তব পায়,
গুণমণি! দিনমণি বধে প্রমদায়॥
রজনীতে একাসনে, ছিলাম সুখ শয়নে,
প্রকাশিলে দিবাকর, কে রব কোথায়॥
কি কর! কি কর! হের, ধরি কর,
এই কর, যামিনী না যায়।[৩]

তাঁর কোন কোন গানের ভাষা কৌতূহলোদ্দীপক, যথা:

পার কি বলিতে, ললিতে, আসিবে কিনা আসিবে
তার স্বর নিরবেতে, এই ঘোর রজনীতে, হয়ে বনে উপনীতে,
মানস বিফল হবে॥
অসহ্য কুসুম শয্যা, দেখিলে শঠের চর্য্যা,
শেষানিশি অনিবর্য্য এখনি হইবে দিবে॥
প্রহার হোলো প্রহার, আর যত উপহার, কে করে ব্যবহার,
এসব বিনে কেশবে॥[৪]

১. S. K. De, *Bengali Literature*, 365
২. 'রস-গ্রন্থাবলী', ৯৪, 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' ২, ১৫৪৩-১৭
৩. 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম' (১ম সং) ৩, ১৬৭
৪. 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম', ৩, ১৬৭

আশুতোষ দেবের গীতে বৈষ্ণব প্রভাব সুস্পষ্ট। ১২৫১-১২৬০ বঙ্গাব্দে ছাতুবাবুর টপ্পার জনপ্রিয়তার কথা লিখেছেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। (বঙ্গভাষার লেখক, ৪০৭ পৃষ্ঠা)

কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবরণ অত্যন্ত দুর্লভ। 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম'-এ কৃষ্ণানন্দ ব্যাস এ-ভাবে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন: "বৈকুণ্ঠবাসী যশোরাশি ধার্মিকবর ঈশ্বর কাশিনাথ গঙ্গোপাধ্যায়স্য পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু দিগাম্বর গঙ্গোপাধ্যায় তস্য মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কালীদাস গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত গান প্রারম্ভ।"[১] 'দ্বিজ কালিদাস' ভণিতা দিয়ে বহু শাক্ত, বৈষ্ণব ও আগমনী গান লিখেছিলেন কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়। একটি দৃষ্টান্ত:

"কোথারে রহিলে প্রাণ বসন্ত সময়। গুঞ্জরিছে অলিকুল মধুকর তায়॥ প্রস্ফুটিত পুষ্পজাতি, হেরিয়ে ব্যাকুল অতি। রসোভরে রসোবতি সুধাইয়ে যায়॥[২] আর একটি গান:

"যায় যাবে প্রাণ, তারে আর সাধিব না। একে ত বিরহজ্বালা, তায় লোক গঞ্জনা॥ আপন ভাবিয়ে যাবে. প্রাণ সঁপিয়াছি ওরে। সে তো কি আমার তরে, ভাবে না যাতনা॥[৩]

গরাণহাটার কমলাকান্ত দাস সরকারের পুত্র শিবচন্দ্র দাস সরকার হিন্দিতে বহু "হোরিগান" লিখেছিলেন।[৪]

এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ। তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের অগ্রণী ছাত্র। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মতলার "Scot and Co." তাঁর ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ "The Shair and Other Poems" প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক্-এর নামে উৎসর্গীকৃত। এই ইংরেজি কবিতা সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় বৃটেনেও তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। এই গ্রন্থে মুদ্রিত তাঁর বিখ্যাত কবিতা "The Song of the Boatman to Ganga"।

১. 'তদেব', ১২৩
২. 'তদেব', ২০৫
৩. 'তদেব', ২০৫-২০৬
৪. তদেব, ১৭৭-১৯২

ডি. এল. রিচার্ডসন্-এর ইংরেজি কবিতার সঙ্কলন Selections from British Poets'-এ এই কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে। তার প্রথম পঙ্‌ক্তি :

"Gold river ! gold river ! how gallantly now,
Our bark on thy bright breast is lifting her prow,
In the pride of her beauty, how swiftly she flies,
Like a white-winged spirit, thro' topaz-paved skies"[১]

কাশীপ্রসাদ কেন যে বাংলাভাষায় এ-সব কবিতা লেখেননি, বলা মুশকিল। মন্মথনাথ ঘোষ কাশীপ্রসাদের প্রেমগীতি সংকলন 'গীতাবলী'-র গীতগুলির সঙ্গে নিধুবাবুর গানের তুলনা করে লিখেছেন : "...for sweetness and pathos [the love poems] deserve to be placed side by side with the famous love-songs of Nidhu Babu".[২]

'বাঙ্গালীর গান'-এ কাশীপ্রসাদের ২৫-টি বাংলা প্রেমের গান সঙ্কলিত হয়েছে। তার মধ্যে কিছু গানে নিধুবাবুর ভাব ও ভাষা লক্ষণীয়। একটি গান সুস্পষ্ট ভাবেই নিধুবাবুর গীত-প্রভাবিত। কাশীপ্রসাদ রচিত 'গীতাবলী' এখন দুষ্প্রাপ্য। তবে তার অধিকাংশ প্রেমের গান অবিনাশচন্দ্র ঘোষ 'প্রীতি-গীতি'-তে সঙ্কলন করেছেন। 'প্রীতিগীতি' গ্রন্থে কাশীপ্রসাদের গান আছে : "জীবন থাকিতে তারে ভুলিব কেমনে। সদত বাসনা যারে রাখিতে নয়নে ॥ শশাঙ্ক কলঙ্ক ত্যজে, তার বদনে বিরাজে। অমিয় বরিষে ঘন মধুর বচনে ॥[৩] এই গানটির সঙ্গে নিধুবাবুর রচনারূপে প্রচলিত, "তারে ভুলিব কেমনে। প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে ॥"—গানটি তুলনীয়। তাঁর গানে নিধুবাবুর গানের প্রভাব পড়েছিল ; কিছু গীতপদ উভয় কবির রচনা থেকে উদ্ধৃত করলেই তা বোঝা যায়।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ	নিধুবাবু
১. কত ভালবাসি প্রাণ বুঝাব কেমনে। (২৫৩)	কত ভালবাসি তারে সই কেমনে বুঝাব।

১. সম্পূর্ণ কবিতাটি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর *The Calcutta Municipal Gazette*-এ প্রকাশিত হয়। P. 777

২. *'The Calcutta Municipal Gazette'*, 13 Sept, 1930, 777

৩. 'প্রীতিগীতি', ৫০, ৫৩, গীতরত্ন'-তে 'তারে ভুলিব কেমনে' গানটি সঙ্কলিত হয়নি।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ	নিধুবাবু
২. এ কেমন চোর বল, তোমার নয়ন। (২১৪)	২. এমন চুরি চন্দ্রাননি শিখিলে কোথায়। হানিয়ে নয়নবাণ, হরিয়ে লইলে প্রাণ কথায় কথায়॥
৩. যায় যাবে যাউক রে প্রাণ, তাহে নাহি খেদ। (৩৪৬)	৩. হউক হে হউক, প্রাণ যায় যাউক, খেদ নাহি তাহাতে।
৪. তোমার কি দোষ প্রাণ, যে দোষ আমার। (৩৪৬)	৪. তাহার কি দুখ সখি, যে দুখ আমার।
৫. আজি কি সুদিন, সুদীনে সুদিন, তব দরশনে। (৫৮৭)	৫. আজু কি সুদিন, সুদীন জনে।
৬. আমার মনের কথা তুমি কি জান না প্রাণ। (২৫৩)	৬. তুমি কি আমার মনের বাসনা জান না ?[১]

(বন্ধনীতে প্রদত্ত সংখ্যা 'প্রীতিগীতি'র পৃষ্ঠা সংখ্যা।

জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক ছিলেন আন্দুলের জমিদার। তাঁর বাৎসরিক আয় ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। তিন পুত্র ও দুই কন্যার পিতা জগন্নাথ-প্রসাদ সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি একটি অভিধান রচনা করেন। তাঁরই রচিত 'সঙ্গীত রসমাধুরী' গ্রন্থে এই অভিধান "শব্দকল্পতরঙ্গিনী" নামে উল্লিখিত। কিন্তু 'Sahidullah Felicitation Volume'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তাঁর অভিধানটির নাম দেওয়া হয়েছে 'শব্দকল্পলতিকা'।[২] 'সঙ্গীত রসমাধুরী' প্রকাশিত হয়েছিল ১২৫১ সালে। এই বইতে ১৪ বছর বয়স থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে রচিত তাঁর গানগুলি সঙ্কলিত হয়েছে।[৩] জগন্নাথপ্রসাদের পত্নী শ্যামাসুন্দরী ছিলেন সুশিক্ষিতা মহিলা। তাঁর হস্তাক্ষর-ও সুন্দর ছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বরের 'সম্বাদ ভাস্কর'-এ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্যামাসুন্দরীর সংসারযাত্রা নির্বাহের মনোরম বর্ণনা আছে।[৪]

১. 'বাঙ্গালীর গান', ৪৩৬-৪৩৯ (কাশীপ্রসাদের গান), গীতরত্ন, পৃষ্ঠা, ৭৭, ৩৩, ১১২, ১৩৪.

২. 'সঙ্গীতরসমাধুরী', ।৶•, ॥/• , *Sahidullah Felicitation Volume*. 92

৩. তদেব, ।৶-॥/•, 'বাঙ্গালীর গান', ৪৪•,

৪. 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৩, ৬৩৪-৬৩৫ ; ৩৪১ ৩৪২.

জগন্নাথপ্রসাদ শ্যামাবিষয়ক, আগমনী ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান লিখেছেন। তাঁর রচিত প্রেমগীতির ভাষা ও ছন্দ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। প্রেমের গানের ছন্দহীনতা যে চিরস্থায়ী ছিলনা,—তার প্রমাণ জগন্নাথপ্রসাদ ও যদুনাথ ঘোষের প্রেমসঙ্গীত। প্রেমের গান ছাড়া তিনি কিছু ভক্তির গান ও 'চিত্রকাব্য' লিখেছেন। এখানে তাঁর দুটি গানের নিদর্শন দেওয়া হল। প্রথম গানটি নিধুবাবুর রচনারূপে প্রচলিত ছিল।

১. তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে॥ ধ্রু॥
হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে, যেন প্রাণ নাহি রবে॥ *
কারণ প্রলয় জ্ঞান, পলকে নিশ্চিত প্রাণ,
অবশ্য অন্তর হলে, প্রলয় হইবে তবে॥
কিন্তু তাহে ক্ষতি নাই, আমি মাত্র ইহা চাই
তুমি সুখে থাক, মম শবদেহে সব সবে॥[১]

২. নাহি যদি আসি তবে কর প্রিয়ে অভিমান॥ ধ্রু॥
আইলে বদন বাঁকা, মরি এ কোন বিধান॥ *
ভাবিতে ভাবের ভাব, এই হয় অনুভাব,
লাভ তব ভাবে ভাব, অভাবেতে সমাধান॥[২]

'গীতরত্নমালা'র প্রথম খণ্ডে জগন্নাথপ্রসাদের দুটি শ্যামাসঙ্গীত সঙ্কলিত হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'শাক্তপদাবলী' গ্রন্থেও তাঁর একটি শ্যামাবিষয়ক ও একটি আগমনী গান আছে।[৩] 'সঙ্গীতরসমাধুরী'-তে ২৪, ২৫, ২৭, ১০৫, ও ১৪৫ পৃষ্ঠায় 'বামাসুন্দরী' ও 'শ্যামাসুন্দরী'-র নামে কিছু চিত্রকাব্য দ্রষ্টব্য।

'সঙ্গীতরসমাধুরী-র ভূমিকায় জগন্নাথপ্রসাদ নিধুবাবুর উল্লেখ করেননি; তিনি রাধামোহন সেন সম্পর্কে লিখেছেন, "…সম্প্রতি অস্মদাদির জন্মভূমি বঙ্গরাজ্যে সঙ্গিতশাস্ত্র প্রচার করণের মূলাধার মহাকবি ৺ প্রাপ্ত রাধামোহন সেন মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গিত-তরঙ্গ গ্রন্থ প্রস্তুত হওনের পূর্ব্বে এতদ্দেশের

১. 'সঙ্গীতরসমাধুরী', ৪৪
২. তদেব, ১৮
৩. 'গীতরত্নমালা' ১, ৩১৩, ৪০০, 'শাক্তপদাবলী' (১৯৬১), ২৫, ১৩৬

লোক তুম্বরাকে তান্‌পুরা কহিতেন...কবীন্দ্র সেন মহাশয়ের গুণ এতদ্দেশের জনপদের হৃদয়ে শিলাঙ্ক প্রায় অঙ্কিত রহিয়াছে"।[১] কিন্তু জগন্নাথপ্রসাদের প্রেমের গানেও নিধুবাবুর প্রভাব দেখা যায়। নিচের দৃষ্টান্তগুলি থেকে তা উপলব্ধি করা যাবে।

জগন্নাথপ্রসাদ।	নিধুবাবু।
গুণে ভুলে মনঃ রূপেতে নয়ন। (৩৪-৩৫)	নয়ন রূপেতে ভুলে, মন ভুলে গুণে। (১৩৩)
পতন না হতে তনু আগে হইল দাহন। (৪৬)	না হতে পতন তনু দাহন হইল আগে। (সঙ্গীততরঙ্গ, ৩০৫)
যে গুণে ভুলালে মন, সে গুণ কি গুণমণি। (৭৩)	যে গুণে ভুলালে অবলা সরলে সে কি গুণ গুণমণি (১৩)
ধীরে ধীরে যায় কে গো হাসিতে হাসিতে। (৭৬)	ধীরে ধীরে যায় দেখ চায় ফিরে ফিরে (৩২)
(বন্ধনীতে প্রদত্ত সংখ্যা 'সঙ্গীত-রসমাধুরী'র পৃষ্ঠা সংখ্যা)	(বন্ধনীতে প্রদত্ত সংখ্যা 'গীতরত্ন'-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা)

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যদুনাথ ঘোষ গায়করূপে প্রসিদ্ধ হন। অবিনাশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন: "আমাদিগের বেশ স্মরণ হয়, বাল্যকালে ইঁহাকে একবার দেখিয়াছিলাম। তখন ইনি প্রাচীন হইয়াছিলেন, এবং গৈরিক বসন পরিধান করিতেন, কিন্তু তখনও ইঁহার শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল। যৌবনে ইনি দাঁড়াকবির একজন সুন্দর দোহার (গায়ক) ছিলেন ; তখনও ইঁহার স্বর যেমন গগনভেদী, তেমনি মিষ্ট ছিল।"[২]

সম্প্রতি "কলিকাতা" নামের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে 'এক্ষণ' পত্রিকায় পণ্ডিতদের মধ্যে বাদবিতণ্ডা হয়েছে। রাধারমণ মিত্র লিখেছেন: "আইন-ই-আকবরিতে তথা-কথিত কলিকাতার সঙ্গে 'বকোয়া' ও 'বারবাকপুর'-এর উল্লেখ আছে। এদের পরিচয় কেউ জানে?"[৩] ১২৬৮ সালে প্রকাশিত 'সঙ্গীতমনোরঞ্জন'

---

১. 'সঙ্গীতরসমাধুরী'. ။০·။/, তম্বুরার বিবরণ ; দ্রষ্টব্য : অমিয়নাথ সান্যাল, 'স্মৃতির অতলে' (জিজ্ঞাসা, ১৩৭৭), ১৬৪-১৬৫ পৃষ্ঠা, পাদটীকা।

২. 'প্রীতিগীতি', ৩/০

৩. 'এক্ষণ', ১৩৭৬, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩

গ্রন্থে নামপত্রে যদুনাথ ঘোষের ঠিকানা লেখা আছে: "হাওড়া, দরিবার—বাকপুর"। এই 'দরিবার-বাকপুরের' সঙ্গে 'আইন-ই-আকবরি'র 'বারবাকপুরের' কোন সম্পর্ক আছে কিনা, জানিনা। অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ও সুশীলকুমার দে "বেলুড"-এ যদুনাথের বাসস্থানের কথা লিখেছেন।[১]

'সঙ্গীতমনোরঞ্জন' প্রধানতঃ সঙ্গীত-শাস্ত্র-গ্রন্থ। গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে খেয়াল, গজল, টপ্পা, খেমটা "ইত্যাদি নানাপ্রকার ছন্দ ও প্রণালীতে কতিপয় গান লেখা আছে"। চতুর্থ অধ্যায়ে বৈদ্যবাটীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-যুবকের সঙ্গে স্থানীয়া এক বিধবা যুবতীর প্রণয় কাহিনী গানে বর্ণিত। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জুলাই "Act XV of 1856" অনুসারে বিধবা বিবাহ আইনত সিদ্ধ হয়। ১২৬২ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শীকদার সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা'য় (প্রথম প্রকাশ, ১৮৫৪), ১০ম সংখ্যায়, বিধবাবিবাহ বিষয়ক "শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবীর দ্বিতীয় বিবাহ করিবার আপত্তি ঘুচিয়া যায়"—এই আখ্যায় একটি কাহিনী প্রকাশিত হয়। ১২৬৯ সালে প্রকাশিত 'প্রেম নাটক' গ্রন্থে একটি সুন্দরী বিধবার প্রণয় কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এখানে নায়ক "বিপ্রতনয়", (২ পৃষ্ঠা)। 'প্রেম নাটক' আংশিক ভাবে 'পর্ণোগ্রাফিক্'। (পৃষ্ঠা, ২-৬)

যদুনাথ ঘোষের কাহিনীটি এ-ভাবে সুরু হয়েছে: "৺সুরধুনির পশ্চিম তীরস্থ বৈদ্যবাটী গ্রামে ৺নিমাইতীর্থ নামক ঘাটে বারুণীর যোগে বহুতর নরনারী গঙ্গাবারিতে অবগাহন কারণ আগমন করিয়াছেন এমত কালীন একজন দরিদ্র বিপ্রসন্তান ধনউপার্জ্জনের আশায় মহানগর কলিকাতায় যাইবার মানসে বাহির হইয়া ঐ তীর্থঘাটে আসিয়া পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এক পার্শ্বে বসিয়া লোকযাত্রা দর্শন করিতেছিলেন। এমত কালীন পরমাসুন্দরী ষোড়শী একটি রমণীর রূপলাবণ্য অবলোকনে শূন্যমনে উভয়ে অনঙ্গবাণে অভিভূত হইয়া নায়কনায়িকা গঙ্গাবারি পরিহরি প্রয়ণ সাগরের (প্রণয় সাগরের) আশা সলিলে নিজ নিজ মনকে নিমগ্ন করিলেন"।[২] 'ষোড়শী রমণী' যে বিধবা, তা তার নিজের কথাতেই জানা যাচ্ছে: "অজ্ঞানে মরিল পতি, জ্ঞানোদয়ে রতিপতি, করিছে কত দুর্গতি, না পারি কহিতে।"[৩]

১. 'প্রীতিগীতি', ২৶০, S. K. De, op. cit, 372.
২. 'সঙ্গীত মনোরঞ্জন', ১৩৩-১৫৪
৩. তদেব, ১৩৩ ১৩৪ ১৩৯

যদুনাথের গানে আদিরসের প্রাধান্য বড় বেশী। নিধুবাবু, কালী মির্জা, শ্রীধর কথক, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, আশুতোষ দেব প্রেমের গান লিখেও আদিরসের আতিশয্য এড়াতে পেরেছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রেমের গানে লাম্পট্যের ভাব তার আদিম সুষমা নষ্ট করে দিয়েছিল। যদুনাথ ঘোষের আদিরসাত্মক কবিতার দুটি দৃষ্টান্ত :

১. খাম্বাজ। জলদ তেতালা॥

বালিকা রমণীগণে স্বভাবে শরলা রয়। যৌবন সময়ে বল কি জন্যে উন্মত্তা হয়॥ না জানি কত ঐশ্বর্য্য, পেয়ে হয়েছে অধৈর্য্য। ভাব যেন চন্দ্র স্য্য. কিরণে করেছে জয়॥ অনঙ্গ রঙ্গ সাধনে, ডরে না অমরগণে। দয়া মায়া নাহি মনে, অতি কঠিন হৃদয়॥ পর্ব্বত পয়োধিপারে, বরঞ্চ যাইতে পারে। যুবতীর যৌবন ভারে, বহিতে প্রাণ সংশয়॥[১]

২. …"বিধুমুখ দেখিবার তরে, কতলোক যত্ন করে।
কুলের বাহির হলে পরে, মুখ হবে কালা গো।
কুলে আছে গৌরবিনী, জান ত কত মানিনী।
কেন হয়ে কাঙ্গালিনী, যাবে হাটখোলা গো॥[২]

প্রেমের গানের এই ধরনে স্থূলতা আসায় আর কোন কবির ক্ষতি না হোক, নিধুবাবুর যথেষ্ট ক্ষতি হয়; কারণ, বহু কুৎসিত গান তাঁর নামেই প্রচলিত হয়েছিল।

উনবিংশ শতকের খ্যাতনামা গীত-রচয়িতা শ্রীধর কথকের নিজের সম্পাদনায় কোন গীত-সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অতুল্যচরণ ভট্টাচার্য দুর্গাদাস লাহিড়ীকে শ্রীধরের "স্বহস্ত লিখিত" একটি গানের খাতা দিয়েছিলেন। "খাতাখানি জীর্ণ, নানাস্থানে কীটদষ্ট"। সেই খাতা থেকে শ্রীধর কথকের গান 'বাঙ্গালীর গান'-এ উৎকলিত হয়েছে। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৬৯টি গানের হিসেব দিয়েছেন, যথা, ১২১টি প্রেমের গান, ৩৫টি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান, ৯টি আগমনী গান, আর ৪টি শ্যামাবিষয়ক গান।[৩]

১. তদেব, ৶০, ৩১-৩২
২. তদেব, ৫৭
৩. 'বাঙ্গালীর গান', ২৭৭-৩০০, 'বঙ্গভাষার লেখক', ১, ৩৬০

প্রেমগীতি রচনার ব্যাপারে শ্রীধর কথক ছিলেন নিধুবাবুর মতোই প্রতিভাশালী। তিনিও সরল, কোমল ভাষায় প্রেমের সূক্ষ্ম অনুভূতিসমূহ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আবেদন তাঁর ভাষার প্রধান গুণ। তাঁর অনুভূতি সূক্ষ্ম ও স্পর্শাতুর; তাঁর প্রকাশভঙ্গীতে শিল্প ও রসবোধ সুপরিস্ফুট। তাঁর গানে কোথাও স্থূলতা দেখা যায়না। বরঞ্চ, তাঁর কোন কোন গান সত্যি সমাদরনীয়। শ্রীধর কথক (জন্ম, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ)[১] একজন বিস্মৃত, অবজ্ঞাত কবি। তাঁর রচনার কিঞ্চিৎ নিদর্শন :

ভালবাসিব বলে ভালবাসিনে।
আমার সে ভালবাসা তোমা বই আর জানিনে॥
বিধুমুখে মধুর হাসি, দেখিলে সুখেতে ভাসি,
তাই আমি দেখতে আসি, দেখা দিতে আসিনে॥
(বাঙ্গালীর গান, ২৮৪)

তবে কি সুখ হতো।
মন যারে ভালবাসে, সে যদি ভালবাসিত॥
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক হীনে,
ফুল হইত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত॥
প্রেম সাগরের জল, হতো যদি সুশীতল,
বিচ্ছেদ বাড়বানল, তাহে যদি না থাকিত॥ (তদেব, ২৭৯)

এমন যে হবে, প্রেম যাবে, তা কভু মনে ছিল না।
এ চিতে নিশ্চিত ছিল, এ প্রেমে বিচ্ছেদ হবেনা॥
ভেবেছিলেম নিরন্তর, হ'য়ে রব একান্তর,
যদি হয় প্রাণান্তর, মনান্তর তায় হবে না॥
এখন হলো অন্তর, পিরীতি হল অন্তর,
আঁখি ঝোরে নিরন্তর, প্রাণান্তর তায় হবে না॥ (তদেব, ২৮৬)

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য', (২ সং ১৯৬৫), ২৭, 'বাংলার গীতকার', ১২৮ (জন্মকাল, ১২২৩ সাল)

কত ভালবাসি তারে, বোলে কি জানান যায় ?
কুলমান মনপ্রাণ, সকলই সঁপেছি যায় ॥
নিতান্ত হয়েছি যার, সে বিনে কে আছে আর ?
তিলমাত্র যে আমার, মন ছেড়ে নাহি যায় ।
(সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ, (২), ১১৩৬)

বিচ্ছেদ নাহি থাকিলে, প্রেমে কি যতন হতো ।
দুঃখ সম্ভাবনা হেতু, সুখের আদর এত ।
উভয়ের বাদী উভয়ে, পরস্পর ভয়ে ভয়ে,
কত সুখোদয় সভয়ে···অভয়ে না হয় তত ॥ (তদেব, ১১৪৫)

রোষ কি সন্তোষাভাসে, প্রেয়সী যদি সম্ভাষে,
তবু তো সে মন তোষে, নাশে বিচ্ছেদ হুতাশে ॥
শীত কিম্বা উষ্ণ নীরে, নিবারে প্রবলাগ্নিরে,
রবি তাপে নলিনীরে, যথা উল্লাসে বিকাশে ॥ (তদেব, ১১৪৫)

নয়নেরই দোষ কেন, নয়নেরই দোষ কেন ?
আঁখি কি মজাতে পারে, না হ'লে মন-মিলন ॥
আঁখি কত জনে হেরে, সকলে কি মনে ধরে ?
মন যারে মনে করে সেই·· মনোরঞ্জন ॥ (বাঙ্গালীর গান, ২৯১)

হায় ! কি লাঞ্ছনা, কি গঞ্জনা, ভেবে তো প্রাণ বাঁচে না !
সে গেছে, তার প্রেম গেছে, আমার ত পিরীত গেল না ॥
কবার নয়, কব কার কাছে ?
যে দুখে ভাসায়ে গেছে,
আমার মনেতে সে যে বিনা সূতে বাঁধা আছে ॥
পিরীতির যে রীতি আছে,
তার মতন সে করে গেছে ;
চিহ্নমাত্র রেখে গেছে, লোকে কলঙ্ক ঘোষণা ॥ (প্রীতিগীতি, ৩৪৯)

করেছি পিরীতি বিসর্জন যাবত জীবন।
প্রেমতত্ত্ব উত্থাপনে আর নাই প্রয়োজন ॥
হয়েছি প্রেম সন্ন্যাসী, নিরাশা কাননবাসী,
বিচ্ছেদের ভস্মরাশি অঙ্গে করেছি ভূষণ ॥ (তদেব, ৭২২)

নিধুবাবুর খ্যাতির ঔজ্জ্বল্যে শ্রীধর কথকের পরিচয় তেমন প্রকাশ পায়নি। তাঁর প্রায় সব বিখ্যাত গান সামান্যভাবে পরিবর্তিত হয়ে নিধুবাবুর নামেই প্রচলিত ছিল। 'ভালবাসিব বলে ভালবাসিনে'-গানটি 'গীতরত্ন'-গ্রন্থে নেই ; তবু অনেকের ধারণা, এ-গান নিধুবাবু লিখেছিলেন।[১] এই 'দেখতে আসা'র গান রবীন্দ্রনাথ-ও লিখেছেন :

"আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেকদিনের পরে।
ভয় কোরো না, সুখে থাকো, বেশিক্ষণ থাকবো নাকো,
এসেছি দণ্ড দুয়ের তরে ॥
দেখব শুধু মুখখানি, শুনাও যদি শুনব বাণী,
না হয় যাব আড়াল থেকে হাসি দেখে দেশান্তরে।"
(গীতবিতান, ৪১৪ ; গীতিমালা, প্রায়শ্চিত্ত)

১৩০৬ সালে প্রকাশিত 'সঙ্গীতকোষ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে এই গানটি-ও নিধুবাবুর রচনারূপে নির্দ্দিষ্ট। 'সঙ্গীত কোষ'-এ গানটির পাঠ[illegible] এ-রূপ :

"আজ তোমারে দেখতে এলাম অনেক দিনের পরে।
ভয় নাইকো, সুখে থাক,
অধিকক্ষণ থাক্‌বো নাক,
এসেছি দু-দণ্ডের তরে,
দেখ্‌বো শুধু মুখখানি, শুন্‌ব দুটি মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে, চলে যা'ব দেশান্তরে ॥[২]

১. 'বাংলার গীতকার', ১৩
২. 'সঙ্গীতকোষ' (১৩০৬), ১।/০, ৮৩

নিধুবাবুর গান ও কুন্তিলক

সুশীলকুমার দে লিখেছেন: "বোধহয়, নিধুবাবুর টপ্পা তৎকালে এরূপ বিখ্যাত ও সর্ব্বজনবিদিত ছিল যে, তাহা স্বীয় গ্রন্থে তুলিয়া দিতে কোনও গ্রন্থকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন না; আধুনিক সময়েও এইরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক বিখ্যাত গান বিবিধ নাটক নভেলে "কোটেশন" চিহ্ন ব্যতিরেকেও (?) উদ্ধৃত হইয়া থাকে।"[১]

১২৪৭ সালে তারাচরণ দাস "বাবু নবকৃষ্ণের আজ্ঞায়" 'মন্মথ কাব্য' রচনা করেন। নবীনচন্দ্র দত্তের ধারণা ছিল, 'মন্মথ কাব্য' রাজা নবকৃষ্ণের সময়ে রচিত হয়। কিন্তু সুশীলকুমার দে তাঁর ভ্রান্তি প্রকটিত করেছেন।[২]

সুশীলকুমার দে'র মতে মুন্সী এরাদাৎ রচিত 'কুরঙ্গভানু'-র প্রকাশকাল ১২৫২। কিন্তু 'কুরঙ্গভানু'র সর্বশেষ চার চরণে বলা হয়েছে:

"দ্বাদশ সও বায়ান্ন সালের রচনা।
চৌষট্টি সালেতে ছাপি ছিল না বাসনা॥
লোকের ভৎসনা আর হানিতে প্রাপ্তি।
অঙ্কিত পুস্তক তরুণরূপে সমাপ্তি॥[৩]

তারাচরণ দাস ও মুন্সী এরাদাৎ নিধুবাবুর বহু গান সামান্য পরিবর্তন করে নিজেদের রচনায় ব্যবহার করেছেন। তারাচরণ দাসের ব্যাপার প্রথমে নবীনচন্দ্র দত্ত আলোচনা করেন; নিধুবাবুর যে-সব গান তারাচরণ কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে 'মন্মথ কাব্য'-গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি তার তালিকা দিয়েছেন।[৪] সুশীলকুমার দে মুন্সী এরাদাৎ-এর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু লিখেছেন: "এ সকল কাব্যেও গীতরত্নের অনেকগুলি গান চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে।"[৫] আমরা এখানে "চালাইয়া দেওয়ার" বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করতে চাই। 'মন্মথ কাব্যে' নিধুবাবুর গানের আক্ষরিক অনুকৃতি লক্ষণীয়।

---

১. 'নানানিবন্ধ' ১০৭
২. তদেব, ১০৮
৩. তদেব, ১০৭, 'কুরঙ্গ ভানু', ১০
৪. 'গীতাবলী', ২৫-২৬
৫. 'নানানিবন্ধ', ১০৭.

নীচের তালিকায় তা ধরা পড়বে।

প্রথম চরণ	মন্মথকাব্য, পৃষ্ঠা	গীতরত্ন, পৃষ্ঠা
ঈষৎ হাসিয়া হরিল	৩৫	২৮
প্রাণ কেমন করে কহিব কারে	৪৫	৭৪-৭৫
বসন্ত সমুদ্র সম	৫২	৬৬
মদনেরে শান্ত কর	২৭	২৮
এক ফুলে ভুলে অলি	৬৭	৩০
হউক হে হউক, প্রাণ যাউক	৮১	১১২
প্রবল প্রতাপে বুঝি প্রাণ	৮৯	১৭
দিবা অবসান হয় কখন পাব তারে	১০৭	৪
বিরহ অনল শীতল হল এতদিনে	১২০	৮১
এই কি তোমার মই ছিল রে মনে	১৩০	৩
কেন চঞ্চল বিধুমুখি	১৩৮	১০৫
যা তুমি চাহ তা তোমার	১৪৬	৩৩
উপায় কি আছে আছে আর এরূপ খেদেতে	১৬৯	৬৯
উদয় ভূতলে এ কি অপরূপ শশী	১৭৫	৭৯
আসিবে রবে এ রবে প্রাণ কি রবে ?	১৮০	৫০
কি হবে ওলো সই বাঁচিব কেমনে	১৮৩	২৬
এ দুঃখ আর না যায় সহনে	১৮৪	২৬
আইলে হে প্রাণনাথ	১৮৮	৯০
মনপুর হতে আমার হারায়েছে মন	১৯৪	৯৯
অধিক কি কব প্রাণ	২১০	৯৪ → { গীতরত্ন ১২৫৭ সংস্করণ
ঋতুরাজ নাহি লাজ[১]	৩০৬	৩০

১. 'গীতাবলী', ২৫-২৬। নবীনচন্দ্র দত্তের হিসেবে নিধুবাবু রচিত ২১টি গান 'মন্মথকাব্যে' উদ্ধৃত হয়েছে। এই সংখ্যা হবে ২০, কারণ, 'অধিক কি কব প্রাণ' গানটি 'গীতরত্ন' গ্রন্থে নেই, ১২৫৭ সালে বনমালী ভট্টাচার্য 'গীতরত্ন' মুদ্রিত করেন। সে-গ্রন্থে এই গান আছে। সুশীলকুমার দে নির্বিচারে এই হিসাব মেনে নিয়েছেন, 'নানা নিবন্ধ', ১০৮-১০৯.

'কুরঙ্গভানু'তে প্রথম বা দ্বিতীয় চরনের ঈষৎ পরিবর্ত্তন করে 'গীতরত্নের' বহুগান উৎকলিত হয়েছে। তার তালিকা দেওয়া হল।

কুরঙ্গভানু	পৃষ্ঠা	গীতরত্ন	পৃষ্ঠা
এত কি চাতুরি সহে প্রাণ তোমায় হেরি আঁখি।	২২	এত কি চাতুরী সহে প্রাণ, তোমার পিরীতে দিবে নিশি ঝুরে আঁখি	১০২
কি কারণে বিধুমুখি করিয়াছ অরুণ আঁখি	২৭	তদেব	৫১
এই কি তাহার সই ছিল গো মনে	৩৮	এই কি প্রাণ তোমার ছিল মনে	৩
আমি কি অন্তর অন্তরে।	৪০	আমি জানি প্রাণ অন্তর অন্তরে	৭১
ও কমলিনী জ্বলে কোথা জ্বলে মধুকর	৪২	জ্বলে কমলিনী জ্বলে কোথা মধুকর	২৩
বিরহী বধিতে এলো প্রবল বসন্ত	৪৫	তদেব	৬৬-৬৭
তুমি কার তরে হলে সুধামুখি পাগলিনী	৪৫	তুমি তার তরে হলে সুধামুখি পাগলিনী	৯১
এমন সময় সখী এলো না সে কেন।	৪৮	এমন সময় সই আইল না কেন	৪৬
কি করিব যামিনী পোহায়।	৪৮	কি কহিব যামিনী পোহায়	৪৬
সখী কোথারে পাব তারে যারে প্রাণ সঁপিলাম	৪৯	সখি কোথা পাব তারে যারে প্রাণ সঁপিলাম	৫৪
পিরীতি কি রীতি প্রাণ যে করেছে সেই জানে	৫১	তদেব	১৪০
মরি হে বিধি অনুকূল হইও	৫২	বিরহেতে মরি হে বিধি অনুকূল হইও	১১৬
আনিতে এখানে কেবা বারণ করিল	৫৭	আসিতে এখানে কে বারণ করিলে	৪৩
নয়ন পাগল কেন করিল আমারে	৫৯	নয়ন পাগল সই করিল আমারে	৭৫
মনে করি বারে বারে নাহিক হেরিব তারে	৬১	তদেব	১৩০
বিরহ অনল শীতল হবে এতদিনে	৬২	বিরহ অনল শীতল হলো এতদিনে	৮১

কুরঙ্গভানু	পৃষ্ঠা	গীতরত্ন	পৃষ্ঠা
ছাড় মোর হাত নাথ লোকে দেখে পাছে	৬৩	তদেব	৭১
তোমার সাধনে সাধ নাই পূরিল।	৬৩	তোমার সাধনা করি সাধ না পূরিল।	৩
আর কি দিব তোমারে সঁপেছি মন	৬৪	আর কি দিব তোমারে সঁপিয়াছি মন :	২০
দেখ প্রাণ সখি পিরীতের গুণ এমন	৬০	দেখ পিরীতের সই তুই গুণ	৫১
আগে কি জানি প্রাণ বিরহে যাবে	৬৯	তদেব	১৩৯
পিরীতি প্রতি বয় মতি অতিশয় বাসনা	৭১	তদেব	১১২
হেরিলে হরিষ চিত না হেরিলে মরি	৭৫	তদেব	১২
মন কোথা আছয় বল অন্য মন	৭৭	মন কোথা আছয়ে হে বল অন্য মন	৬
নয়ননীরে কি নিবে মনের অনল	৮১	তদেব	১২৫
সেই সে সোহাগিনী যারে প্রিয় সদত চাহে	৮৪	সেই সোহাগিনী লো যারে প্রিয় সদত চাহে	৪৯
বিরহির প্রাণ তুমি ওহে মধুকর	৮৫	কমলিনীর প্রাণ তুমি বুঝি মধুকর	৩২
মান অপমান কিছু নাহি মনে	৮৮	মান অপমান কিছু ক'রো না মনে	৩৭
বিচ্ছেদে যে ক্ষতি তার অধিক মিলনে	৯০	তদেব	১৩৭
প্রাণ সেই সে রসিক যে সুখ-সাগরে সদা বিহরে	৯০	তদেব	১১১
প্রাণ চাহলো প্রিয়সী কমল নয়নে অধীন জনে	৯০	তদেব	১১১
স আদরাদর যে আদর অধর-কম্পে কহিতে	৯৩	তদেব	৪১

কুরঙ্গভানু	পৃষ্ঠা	গীতরত্ন	পৃষ্ঠা
মন রে তারে দেখিতে পাগল কেন	৯৬	ওরে তোরে দেখিতে নয়ন পাগল কেন	১০৯
বুঝিলাম এখন মনে দুঃখিনী জনে বিধি লাভ হয় কেনে	৯৮	বুঝিলাম এখন মনে, দুখিনীজনে নিধি লাভ হবে কেনে। সই।	৮৫
মুখেতে না ধরে ধরে না কহিতে তার গুণ	৯৯	অধরে না ধরে, ধরে না কহিবারে তব গুণ	১৯

নবীনচন্দ্র দত্ত দেখিয়েছেন যে, 'আগে জানিতাম যদি ভালবাসায়'—এই প্রথম চরণ যুক্ত গীতটি বেনওয়ারীলাল রায় রচিত 'যোজন গন্ধা' কাব্য গ্রন্থে আছে। এই গান নিধুবাবুর 'গীতরত্নে' নেই, কিন্তু ১২৫৭ সালে বনমালী ভট্টাচার্য "গীতরত্নের" যে-সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাতে আছে। 'যোজনগন্ধা'য় নিধুবাবুর অন্য কোন গান দেখা গেলনা। সুশীলকুমার দে এই বিশেষ তথ্য বিচার না করে 'কুরঙ্গ ভানু'র মতো 'যোজনগন্ধা' কাব্যেও নিধুবাবুরগান "চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে", এই মত প্রকাশ করেছেন।[১]

'গায়নহৃদকুমুদ' বটতলায় ছাপা হয়। বংশীধর শর্মা ১২৮৭ সালে এই সঙ্গীত-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায়, যথাক্রমে ৮০ ও ৮১ সংখ্যক গান দুটি, নিধুবাবুর দুটি গানের পরিবর্তিত রূপ। 'গায়নহৃদকুমুদ' গ্রন্থে গান দুটি এ-ভাবে আছে :

১. একি তোমার মানের সময়? সম্মুখে বসন্ত! (গীতরত্ন ২৯)
ভ্রুভঙ্গে তনু কেন অক্ষয়ে নূতন জ্ঞান।
কটাক্ষের শরজালে পুলকে নূতন ॥ } গায়ন হৃদ্‌কুমুদ

২. দ্রুত গমনে কি এত প্রিয়োজন, এ কি প্রয়োজন। (গীতরত্ন ২৭)
ওহে অন্তরে অন্তরে অন্তর।
কিসে হয় স্থির ॥
রহ রহ করি দরশন ওহে প্রাণ!
খাবার আশায় কে বল কাতর হয়।
অনায়াসে যায় নাহি দেখে,
তার দুঃখ বরং তাহা সহা ওহে ॥ } গায়ন হৃদ্‌কুমুদ

প্রথম চরণ ছাড়া এই দুটি হেঁয়ালীর ভঙ্গীতে রচিত গীতে নিধুবাবুর রচনা প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে বিকৃত।

---

১. **'গীতাবলী'**, ২০, ২৭ ; **'নানা নিবন্ধ'**, ১০৯.

উনবিংশ শতাব্দীতে 'নিধুর টপ্পা'-র ইতিহাস (১).

এককালে নিধুবাবু ছিলেন 'বাবু'। শুধু 'বাবু' বললেই সবাই বুঝত 'নিধুবাবু', কালক্রমে তিনি হয়ে গেলেন শুধু 'নিধু'। তাঁর টপ্পার নাম দেওয়া হলো 'নিধুর টপ্পা'। তাঁর আসল নাম অনেক বড় বড় পণ্ডিতই ভুলে গিয়েছিলেন। পরলোক-প্রাপ্তির ২০/২৫ বছর আগেই তিনি সত্যি সত্যি বেঁচে আছেন কিনা, তা-নিয়ে সংশয় দেখা দেয়।[১]

যিনি ছিলেন রামনিধি গুপ্ত এবং 'বাবু', তিনি হয়ে গেলেন শুধুই 'নিধু।' কেন এমন হোলো ?

নিধুবাবুর প্রতিভা ছিল, কিন্তু কাব্যে ব্যাপ্তি ছিলনা। তিনি শুধু প্রেম সম্পর্কেই ছোট ছোট টপ্পা লিখেছেন। ফলে, পুনরাবৃত্তি ছিল অপরিহার্য, ক্লান্তিকর একঘেয়েমি ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাঁর গানে সমকালীন জীবনের পরিচয় সামান্যই। নিধুবাবুর গান টপ্পা হিসেবে ছিল অসাধারণ। কিন্তু তার গানের বাণী ছিল সরল ও প্রত্যক্ষ ; ছন্দ ছিল গানেরই ছন্দ, কবিতার নয়। মাইকেল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যের আড়ম্বর ও ঘন-নিনাদের মধ্যে নিধু-বাবুর করুণ তরুণীদের দুর্ব্বল, মিনতি-মাথা ডাক শোনা যায়নি। ছিলেন যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি ; অথচ তাঁর একটি গানে-ও সেই সন্ধিক্ষণের চেতনা ছাপ ফেলল না। নিধুবাবু লিখলেন বিরহ-মিলনের গান ; শ্রোতা নব্য ধনী 'গবোমুন্সী' ও 'পুঁটে তেলী'। তাঁর প্রেমের গান প্রচল নির্ভর, যে-পরিস্থিতি থেকে প্রণয়িনীর বিরহ বেদনা বা মিলনের মুগ্ধতা টপ্পায় প্রকাশ পাচ্ছে, তা অত্যন্ত কৃত্রিম। কোটি কোটি মানুষের জীবনে যে-সংকট তখন ঘনিয়েছিল, টপ্পায় কোথাও তার ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। "বিনে স্বদেশীয় ভাষা, পুরে কি আশা ?" এই একটি মাত্র কথায় নিধুবাবুর স্বদেশ-প্রীতির অস্পষ্ট ছাপা দেখা যায়। কিন্তু শুধু নিধুবাবুকেই বা এ-জন্য দোষ দিয়ে লাভ কি ? কবিতায় স্বাদেশিকতার পরিচয় ক'জন কবি সে যুগে রাখতে পেরেছিলেন ?

প্রায় আশি বছর ধরে গান লিখেছিলেন নিধুবাবু। সে-সব গান মুদ্রিত করার ব্যাপারে নিধুবাবুর অনীহা ছিল। সর্বপ্রথম সঙ্কলন মুদ্রিত হলো ১২৪৪

১. **'কবিজীবনী'**, ১২৫, 'গীতরত্ন' (১২৭৫), ৮০

বঙ্গাব্দে। ইতিমধ্যে তাঁর অসংখ্য গান হারিয়ে গিয়েছিল। বহু গান অন্য কবির রচনারূপে প্রচলিত হয়েছিল। ১২৫৭ বঙ্গাব্দে জনৈক বনমালী ভট্টাচার্য বে-আইনি ভাবে 'সুধসিন্ধু যন্ত্রে' হঠাৎ 'গীতরত্ন'-এর একটি সংস্করণ ছাপিয়ে দিলেন। এ-সঙ্কলনে অন্যান্য কবির গানও সঙ্কলিত হয়। ১২৬৩ বঙ্গাব্দে 'গীতরত্ন'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপাল গুপ্ত। এই সংস্করণের ভূমিকায় তিনি দু'জন 'তস্করের' কথা লিখেছেন, যারা 'গীতরত্ন'-এর অননুমোদিত সংস্করণ ছাপাবার চেষ্টা করেন।[১] কিন্তু তিনি নিজেও গানগুলি শুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত করতে পারেননি; "লোক পরম্প্রায় মুখে মুখে শিখিয়া রাখা গীত",[২] তা-ও আবার ছাপার দোষে অশুদ্ধ! এতগুলো দুর্ঘটনা এক সঙ্গে ঘটলে কবি ও তাঁর কবিতাকে বাঁচিয়ে রাখাই মুশকিল। নিধু-বাবুকে ভুলে যাবার এই কারণগুলো সামান্য নয়। কিন্তু তা-ছাড়াও আরো কতগুলো কারণ হয়তো ছিল।

যে-বিশেষ পরিবেশে, বিশেষ একটি অবক্ষীয়মান শ্রেণীর চিত্ত-বিনোদনের জন্য নিধুবাবু ও অন্যান্য কবিরা প্রেমের গান লিখেছিলেন, সেই বিশেষ পরিবেশ ও শ্রেণীর অপচিতির সঙ্গে সঙ্গে নিধুবাবু ও সমধর্মী কবিদের খ্যাতি ও প্রভাব ম্লান হয়ে যেতে থাকে। ভারতীয় কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এ-রকম ঘটনা নূতন নয়। সংস্কৃত ভাষায় যাঁরা শুধু অভিজাত শ্রেণীর প্রয়োজনে ধর্ম ও প্রেম বিষয়ক শ্লোক রচনা করেছিলেন, তাঁদের অনেকের পরিচয় পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে।[৩]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই নানা কারণে সহুরে ধনী ও শিক্ষিত বাঙালিদের জীবন-ধারায় ও মূল্যবোধে একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা দেখা যায়। এই পরিবর্তনকে 'বাঙালি রেণেসাঁস্' বলা রীতি-সম্মত; কিন্তু 'রেনেসাঁস্' বলা যায় কি-না,-তা-নিয়েও প্রশ্ন আছে।[৪] একটি প্রবন্ধে আচার্য যদুনাথ সরকার ১৭৯০ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে দুটি

১. 'গীতরত্ন', (১২৬৩), ·১-২

২. তদেব, ৪, 'গীতরত্ন' (১২৭৫), ৸৶৹

৩. *Subhasitaratnakosa* (H O.S) *Intro. LX*, D.H.H. Ingalls, *Sanskrit Poetry*, (H. U. P, 1968), 45-46.

৪. *History of Bengal* (C.U.), See 3, 472-73; Arabinda Poddar, *Renaissance in Bengal: Quests and Confrontations* (Simla, 1970)

যুগ-বিভাগ দেখিয়েছেন : একটি যুগ 'Dark Age of Modern India ;' অপরটি 'Period of Secdume'. কিন্তু একজন আধুনিক ঐতিহাসিক এ-সময়ে কোনো অন্ধকার যুগের অস্তিত্বই খুঁজে পাননি।[১] আচার্য যদুনাথ বর্ণিত এই যুগেই নিধুবাবুর উত্থান হয় ; এই সময়েই তিনি 'বাবু' থেকে 'নিধু'-তে পরিণত হন। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, এ-যুগে নাগরিক বা আধা-নাগরিক বাঙালিদের জীবন ধারায় ও মূল্যবোধে নূতনের আবির্ভাব।

বিষয়টি মতামত কণ্টকিত ও জটিল ; কিন্তু টপ্পা ও বাংলা প্রেম-সঙ্গীতের ইতিহাস আলোচনায় বাঙালি নবজাগরণ-প্রসঙ্গ পরিহার করা যায় না। টপ্পা ও প্রেম-সঙ্গীত নিধুবাবুর যুগে প্রচলিত দেশী জীবনধারারই অংশরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত। দেশী জীবনধারার ওপর পাশ্চাত্য কৃষ্টির সংক্রাম সম্পর্কে তিনটি সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়।

১. ইংরাজ শাসকগণ উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও দেশী কৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকারি ভাবে কোনো মৌল পরিবর্তন ঘটাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেননি। কিন্তু পাদ্রি ওয়ার্ড কিংবা জেমস্ মিল্-এর মতো কোনো কোনো সভ্যতা-ভিমানী সাহেব তাদের বড় বড় বইতে[২] দেশী-জীবনধারা ও কৃষ্টি সম্পর্কে নিন্দাবাচনে মুখর হয়ে ওঠেন।

২. সমকালীন বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা প্রগতি চেয়েছিলেন, বাঙালি মানসে বিদেশী ভাবধারার সংক্রামের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন না।

৩. রক্ষণশীল বাঙালিরা এ-যুগে 'সব উচ্ছন্নে গেল' বলে হৈ-চৈ করেছেন ; বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কৃষ্টির সম্পর্ক বজায় রেখেও যে দেশী ভাবধারা সমৃদ্ধ করে তোলা যায়, তা তারা সহজে উপলব্ধি করতে চাননি।

এই তিন রকমের পরস্পর-বিরোধী ভাব-সংঘাতের ফলে একটি সাংস্কৃতিক ডামাডোল দেখা যায়। তাতে প্রায় সব-রকম দেশী শিল্প-ঐতিহ্য বিপন্ন হয়ে

১. J. N. Sarkar, 'The Renaissance in India in the 19th century' *Modern Review* (June, 1924), 668-70 : Amitabha Mukherjee, *Reform and Regene-ration in Bengal* (1968), XIV

২. *The British Discovery of Hinduism in the 18th century* (ed) P. J. Marshall. (C. U. P. 1970.) Intro. ch. 1-3, W. Ward, *A View of the History, Literature and Religion of the Hindus*. 2 Vols. Serampore, 1818 ; James Mill, *op. cit.* Vols I, II.

পড়ে। আখড়াই গান হঠাৎ অপ্রচলিত হয়ে যায়। টপ্পাতে আসে হাল্‌কা খেমটার সুর। 'কামিনীকুমার' ধরণের 'পর্নোগ্রাফিক্' কাব্য লেখা হতে থাকে। 'কামিনীকুমার' সম্পর্কে সুশীলকুমার দে লিখেছেন: "There is evidence to show that from the end of the 18th to the middle of the 19th century this prolific literature, outrageous as it is to all taste, obtained considerable favour and currency."[১] উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা গানের অবনতি সম্পর্কে কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় ও ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন।[২] নিধুবাবু ও সমকালীন গীত-রচয়িতাগণ সঙ্গীতে আদিরসের পূর্ব-প্রাধান্য কমাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যখন নানাকারণে দেশী শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে দ্বিতীয় দশকের সুরু থেকেই একটা 'ঘৃণাত্মক' মনোভাব দেখা দিল, তখন থেকেই সাংস্কৃতিক নির্বেদের ফল রূপে গানে ও বিশেষ ধরণের কাব্যে নৈতিক মূল্যবোধের অভাব পরিস্ফুট হতে থাকল।

১৮১৩ সালে শিক্ষা-খাতে সরকারিভাবে ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। কিন্তু, ১৮২৩ সালের ১৭ই জুলাই পর্যন্ত সে-টাকা, ও আরো কিছু পাওনা টাকা খরচ করার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। ইংরাজ সরকার শিক্ষার বিস্তারে আদৌ উৎসাহ দেখায়নি। দেশী কৃষ্টি ও জীবনধারায় কোনো মৌল পরিবর্তন ঘটাবার ইচ্ছা-ও তাদের ছিল না। যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে অধিকারভুক্ত ঔপনিবেশিক অঞ্চলে তাদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, ততদিন হয় তাঁরা নির্লিপ্ত থাকতে চেষ্টা করেন, নয়তো ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কিংবা ওয়েলেসলি'র ধরনে 'ভারতবিদ্যা' নিয়ে মেতে ওঠেন। 'সুদৃঢ় শাসন'-এর প্রয়োজনেই যে 'ভারতবিদ্যার' উৎপত্তি হয়, তা ঐতিহাসিকগণ অধুনা মেনে নিয়েছেন।[৩]

কিন্তু, 'মানবতাবাদী' চার্লস্ গ্রাণ্ট্ ও উইল্‌বারফোর্স, পাদ্রি ওয়ার্ড, এবং 'উপযোগবাদী' জেমস্ মিল্-এর মতো প্রভাব ও ক্ষমতাশালী ইংরাজগণ এই সরকারি নিশ্চেষ্টতা সমর্থন করেননি। তাঁরা ভারতের 'অসভ্যতা' দূর করার

১. *Bengali Literature*, 393.

২. 'দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত', ১৮৭-৮৮; 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র' (১৩৬৩) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ১৬৬-৬৭

৩. *The Oxford History of India*, Part III, 513.

জন্য বিশেষ ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। তাঁদের সমালোচনায় ও রচনায় ভালো-মন্দ এক হয়ে গিয়েছিল। 'প্রাচ্যবিদ্যা' বনাম 'ইংরাজি শিক্ষা'-র মতাদর্শের দ্বন্দ্বের ইতিহাস এখন আর অজ্ঞাত নয়। বিদেশী শাসকদের সরকারি সাংস্কৃতিক নীতির নির্ধারণ সম্পর্কে এই দ্বন্দ্বে রাজা রামমোহন রায় জড়িত হন। রাজা রাধাকান্ত দেব ও তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল অন্যান্য রক্ষণশীল ও নাগরিক বাঙালিরা ইংরাজি শিক্ষার প্রয়োজন অস্বীকার করেননি; অথচ, ইংরাজি শিক্ষা-প্রসারের বৈপ্লবিক পরিণতি সম্পর্কে তাঁদের আশঙ্কা ছিল অন্তহীন। এঁদের কার্য-কলাপ ও ধ্যান-ধারণায় যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। ইংরাজি শিক্ষা প্রসারে আগ্রহী হয়েও এঁরা তার অনিবার্য ফল-স্বরূপ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন স্বীকার করেননি, বরঞ্চ নিজেদের কায়েমি স্বার্থের তাগিদে তাকে ঠেকিয়ে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। এঁদের তুলনায় রাম-মোহন রায়ের সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা ও কর্ম-পদ্ধতি ছিল অনেক বেশি যুক্তিসিদ্ধ।

কিন্তু এ-কথাও না মেনে উপায় নেই যে, "...পূর্ণ জাগরণের স্বরূপ বা গভীরতর কারণ, এবং সেই জাগরণের ফলে পরবর্তীকালের জটিলতর সমস্যা ও তাহার সমাধান—এ সকলের কিছুই যে [রামমোহন] নিরূপণ করিতে পারেন নাই, তাহার প্রকৃষ্ট ও প্রচুর প্রমাণ ঐ যুগের ক্রম-পরিণতি লক্ষ্য করিলেই মিলিবে।"[১] গ্রান্ট্, ওয়ার্ড ও মিল্-এর লেখার প্রভাব রামমোহনের ওপর পড়েছিল। কোনো কোনো রচনায় রামমোহন স্বদেশী সংস্কৃতি বিশেষ ঐতিহ্য সম্পর্কে, এবং অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে নিজের দেশের লোক-চরিত্র সম্পর্কে মিল্ বা ওয়ার্ড-এর মতোই ক্রোধ ও বিদ্রূপ-মিশ্রিত কটু মন্তব্য করেছেন। লর্ড আমহার্স্টের কাছে লেখা চিঠিতে সংস্কৃত ব্যাকরণ, ন্যায় ও বেদান্ত সম্পর্কে তিনি প্রচুর ব্যঙ্গোক্তি করেছেন।[২] অথচ, এ-চিঠিতে ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা প্রচলনের কথাও পরিষ্কার ভাবে বলা নেই। ভারতীয় লোক-চরিত্র সম্পর্কে তাঁর অশ্রদ্ধা একটি লেখায় সুপরিস্ফুট। R. K. Dasgupta দেখিয়েছেন, এখানে রামমোহন মেকলে সাহেবের মতো অসঙ্গত সাধারণীকরণ-এ প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। খোঁজ করে দেখা গেল, জেমস্ মিল্-ও অনুরূপ একটি কটু মন্তব্য

---

১. মোহিতলাল মজুমদার, 'বাংলার নবযুগ' (১৯৬৫), ১০

২. Sharp, *Selections from Educational Records* (Cal. 1920). I, 98-101.

করেছেন।[১] (দ্রষ্টব্য: *The English Works of Raja Ram Mohan Ray*, Panini Office, Allahabad, 1906, 295-96.)

নাগরিক বাঙালিদের সাহেবি ভাষা বা সংস্কৃতির ভক্ত হওয়ার পেছনে তাঁদের তথাকথিত দেশপ্রেম ও আদর্শবাদের কথাই বেশি করে আলোচিত হয়ে এসেছে। অথচ, এ-কথা ভুললে চলবে না যে, ঐ সুদৃঢ় ভক্তির একটা অন্যতম কারণ ছিল সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক। বিলেতি ঢং-এ বাংলো তৈরি করা, বাগানে ক্যুপিড্ ও পরীর মূর্তি রাখা, বা, দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলে বেলগাছিয়া ভিলায় ইউরোপিয় চিত্রশিল্পের সমারোহ ও "ছুড়ি-কাঁটার ঝন্‌ঝনি" ইত্যাদির পটভূমি ছিল লর্ড কর্ণ্‌ওয়ালিস্-প্রবর্তিত 'Native Exclusion Act' (১৭৯১ খ্রী:), এবং তার ফলে বাধ্য হয়ে সাহেবদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জমি ও লগ্নী-র ব্যবসায়ের সুযোগ-সন্ধান।[২]

রামমোহন রায়, কিংবা রাধাকান্ত দেব,—দ্বিতীয় দশকের দুই 'প্রতিনিধি' বাঙালি—দীর্ঘকাল ধরে সাহেবদের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা করে এমন একটা মানসিক স্তরে পৌছেছিলেন যে, মিল বা ওয়ার্ডের জঘন্য ভারতবিদ্বেষ প্রচারের বিরুদ্ধে তাঁরা নিজেদের জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কোনোরূপ আন্দোলন করেননি। মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত মিল্টন্ সিঙ্গার 'Cultural Broker' নামে এক শ্রেণীর লোকের কথা বলেছেন।[৩] উনিশ শতকের প্রথম-ভাগে দেশী 'Cultural Broker'রা আধিপত্য করে গেছেন। বাপ্‌টিষ্ট, মিশনারিদের নির্দেশে রামরাম বসু মূর্তিপূজার নিন্দা করে 'জ্ঞানোদয়' লিখেছিলেন। প্রথম বা দ্বিতীয় দশকে জোড়াসাঁকোর কমল বসু 'ফিরিঙ্গি' নামে পরিচিত হন (দ্রষ্টব্য: Lal Behari De, *Recollections of My School Days*, Editions Indian, Cal. 1969. Ch. V. P. 475). ঐ-সময় হরিমোহন ঠাকুরের বাগান বাড়ী ইতালিয় রীতি-তে সজ্জিত হয়। 'পাষণ্ড-পীড়ন'-এর ভাষায় 'যবনবেশধারক' রামমোহন টেবিলে বসেই 'নৈশ

১. *Historians of India, Pakistan and Ceylon*, ed. C.H. Philips. (London, 1967), 235-236; Mill and Wilson, *The History of British India*, (1858), II, 150.

২. 'রামতনু লাহিড়ী' ইত্যাদি, ৯৪; A. Tripathi, *Trade and Finance in the Bengal Presidency* (1956), 239

৩. David Kopf, *op. cit.* 60-61

ভোজ' সম্পন্ন করতেন ; সাহেবিয়ানার দ্রুত প্রচলন হয় নাগরিক ও অভিজাত বাঙালি সমাজে। ইংরাজ শাসক ও বাঙালি অভিজাত ব্যক্তিদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর 'বেলগাছিয়া ভিলা'-য় 'মিস্ ইডেনের জন্য ভোজসভার আয়োজন করেন ('মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী', ২৫৭)। একটু বিচার করলেই দেখা যাবে, এ-অবস্থায় প্রচলিত স্বদেশী শিল্প-সাহিত্যের দীর্ঘজীবন লাভ করার সম্ভাবনা ছিল না। ইংবাজি-শিক্ষিত নব্যবঙ্গ মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কট্টর সাহেব হয়ে উঠলেন। রামমোহন রায় ও সে-কালের কলকাতার ধনী ও বিখ্যাত বাঙালিগণ সাহেবিয়ানার প্রশ্রয় দিলেও স্বদেশী গান-বাজনার শত্রু ছিলেন না। ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত 'সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম'-এর তৃতীয় খণ্ডে "কিস্বাহস্তাক্ষরকারিণা নামানি" শীর্ষক অধ্যায়ে পাঁচ পৃষ্ঠা ধরে 'রঙ্গিন গান'-এর 'patron'-দের নাম ছাপানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে 'শ্রীমতি রাজরাজেশ্বরী কুইন বিকটোরীয়া' থেকে শুরু করে 'রাইচরণ বসু'-র নাম পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় 'রামগোপাল ঘোষ' ছাড়া আর কোনো সুপরিচিত 'নব্যবঙ্গ'-এর নাম দেখা যায় না।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "...an objective and a dispassionate enquiry will show how tremendously valuable the English language has been for the intellectual advancement of India and for the modernisation of the Indian mind".[১] ইংরাজি শিক্ষার ফলে ভারতের মানসিক উন্নতি যে হয়েছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কিন্তু প্রশ্ন, সে-উন্নতির সূত্রপাত হয়েছিল কখন ?

ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে এ-দেশে একদল সাংস্কৃতিক বর্ণ-সঙ্কর উৎপন্ন হয়, এটাই তো ছিল মেকলের উদ্দেশ্য।[২] 'ওল্ডক্লাস' বাঙালি সাহেবদের দৈনন্দিন জীবনের একটি বর্ণনায় হুতোম-প্যাঁচা এই বর্ণ-সঙ্করদেরই বিদ্রূপ করেছেন।[৩]

শোনা যায়, ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের যুক্তিবাদী ও বিদ্রোহী করে তোলেন। ঐ-বিদ্রোহ ইংরাজদের শোষন ও কুশাসনের বিরুদ্ধে তেমন অভিব্যক্ত

১. *Bengal Past and Present.* (Supplement, Diamond Jubilee No. Jan-June, 1968), 13

২. *British Paramountcy etc.* II. 46.

৩. 'সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী' ১, ১৮-১৯

হয়নি, যেমন হয়েছিল দেশী ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য ও লোক-ব্যবহারের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহীদের ভালো-মন্দ, লঘু-গুরু জ্ঞান ছিল না। বিদ্রোহের অন্যতম প্রকাশ ছিল মদ্যপান, সাহেবি খানা খাওয়া, হিন্দু পৌত্তলিকতার নিন্দা ও ইংরাজিতে কথা বলা। দেশী সাহিত্যের অবনতি ছিল ইংরাজি শিক্ষার অপর একটি কু-ফল। এই অবনতি দেখে মিশনারি সাহেবরা পর্যন্ত ব্যথিত হন। ১৮৩৫ সালে ফেব্রুয়ারি-তে Calcutta Christian Observer এ-সম্পর্কে মন্তব্য করেন: "The English Language has been cultivated to the neglect of the languages of the country···Those who have been educated under it form an isolated class in the Community." তার-ও পূর্বে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই 'isolation', কিংবা আধুনিক ভাষায় 'alienation'-এর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। (১২ মে, ১৮৩১)। যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' (১৯৬৩)-গ্রন্থে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে যে-সব তথ্য দিয়েছেন, তার বিস্তৃতির মধ্যে দেশী শিল্প-সাহিত্য-সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা বা আলোচনা সম্বন্ধে খুব কম তথ্যই দেখা যায়। ১৮৩০ সালে নব্যবঙ্গের উৎসাহে সাতটি আলোচনা চক্র বা Association স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে দু'-তিনটিতে বাংলা ভাষায় বাংলা সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা হ'তো বলে জানা যায়, কিন্তু এই সভাগুলির বিবরণ অজ্ঞাত।[১] নব্যবঙ্গ দলভুক্ত যুবকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-১৮৭৩)। তাঁর কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

'নব্যবঙ্গ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন: "তখন শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী দেশের শিল্প-সাহিত্য ইতিহাস ও ধর্ম সম্বন্ধে নিজেদের দৈন্য কল্পনা করিয়া লজ্জা বোধ করিতেছিল, এবং সকল বিষয়েই পাশ্চাত্য অনুকরণই উন্নত Culture বলিয়া স্থির করিয়াছিল।"[২] তাঁদের সাহিত্যচিন্তা সম্পর্কে অনাথকৃষ্ণ দেবের মন্তব্য; "···উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী মাত্র ভাবিতেন, বঙ্গ-

---

১. P. C. Mitra, *A Biographical Sketch of David Hare* (1877), 16-17; Thomas Edwards, *Derozio* (1884), 32; যোগেশচন্দ্র বাগল, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' (১৯৬৩), ১৪৩, ১৪৫-৪৬

২. প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬২), ২৮১-৮৪

সাহিত্যে আছে কি ?"[১] সুশীলকুমার দে লিখেছেন : "There was a time when the value of these writings (কবি, পাঁচালী, টপ্পা etc) was totally forgotten or ignored. They appeared contemptible in the eyes of the so-called Young Bengal of the last century..."[২]

'নব্যবঙ্গ'-এর এই ধারণা পুষ্টিলাভ করেছে ভারতবিদ্বেষী ইংরাজ লেখকদের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারে। ওয়ার্ড ও মিল্-এর 'View' এবং 'History'-র ফল যে কতদূর গড়িয়েছিল, বড়লাট উইলিয়াম বেণ্টিংক-এর তাজমহল নিলামে বিক্রি করে দেওয়ার ব্যর্থ পরিকল্পনার ইতিহাসে তা দেখা যায়।[৩]

১৮৪৪ সাল থেকে Calcutta Review পত্রিকা দেশী শিল্প-সাহিত্যের গায়ে কালি ছিটানোর ব্যাপারে অগ্রগামী হয়। এ-পত্রিকার একাদশ খণ্ডে প্রকাশিত বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের ওপর একটি প্রবন্ধের সুরুতেই বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে বিদ্রূপ করা হয়েছে।[৪] পঞ্চদশ খণ্ডে অপর একটি প্রবন্ধে বাঙলা যাত্রাগান সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে : "It would require the pencil of a master-painter to pourtray the killing beauty of the fairies of the Bengali Stage. Their sooty complexion, their coal-black cheeks, their hagard eyes, their long-extended arms, their gaping mouths and their puerile attire excite disgust." পাঁচালী সম্পর্কে এই লেখকের বক্তব্য : "The manner of singing is one of which Young Bengal may well be ashamed."[৫] এদের দেখাদেখি নব্যবঙ্গ-পরিচালিত 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর্'-এ কবিগান সম্পর্কে লেখা হয়েছিল : "It is said that the idol is pleased to hear the vulgar expressions used in Kubees and other hateful songs..."[৬] ১৮৫২ সালে

১. 'বঙ্গের কবিতা', ১, ৫.

২. S. K. De, *op. cit.* 270-71.

৩. *Proceedings of Indian History Congress* (1963), 23-24, *British Paramountcy etc.* II, 405 , *Oxford History of India*, 587, fn.

৪. *The Calcutta Review*, XI. Jan-June, 1849, 493-522 , 350

৫. *Ibid*, XV, 349-50.

৬. 'কবিজীবনী', ৪৯

৮ই এপ্রিল 'বীটন্ সোসাইটি'র একটি অধিবেশনে রামবাগানের হরচন্দ্র দত্ত ও কৈলাশচন্দ্র ঘোষ বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যে-প্রবন্ধ পাঠ ও তার আলোচনা করেন, তাতে 'অশ্লীলতা'-র প্রসঙ্গই বেশি করে তোলা হয়।[১]

লক্ষণীয়, নব্যবঙ্গ দলভুক্ত বাঙালিদের শ্লীলতা বিষয়ক চেতনা, 'ধর্মসভা' দলভুক্ত নেতাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংঘর্ষের ফল। এই চেতনাব অপর কারণ, ব্রাহ্ম নৈতিক আদর্শবাদের ও বিশুদ্ধিমার্গের প্রচলন। তৃতীয় কারণ ছিল মধ্য ভিক্টোরিয় পিউরিটানিজম্, বৃটেনে যার ব্যাপক প্রভাব সত্ত্বেও পর্ণোগ্রাফি দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল।[২] নব্যবঙ্গ নৈতিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে ঈশ্বর গুপ্তের মতো কবি ও লেখককেও নির্বাসিত করার চেষ্টা করে।[৩] অথচ, দেশী শিল্প-সাহিত্যের নামে যাঁরা সে-সময়ে নাকের ডগা কুঁচকে ফেলতেন, তাঁদের মধ্যে 'নিমচাঁদ'-জাতীয় চরিত্রের অভাব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের সাহিত্যিক মূল্যবোধকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন 'বাংলা সাহিত্যের আদর'।[৪]

এই ব্যঙ্গ-রচনার আরম্ভেই 'উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীবাবু' তার স্ত্রী-কে বাঙলা বই সম্পর্কে বলেছেন: "ছাইভস্ম বাঙ্গালাগুলো পড কেন?... ওগুলো সব immoral, obscene, filthy···" এ-অভিযোগের উত্তরে স্ত্রী স্বামীর 'ব্রাণ্ডি-পান', এবং 'ডিনারের পর' বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে থিস্তি-খেঁউড-এ মেতে উঠবার পাল্টা অভিযোগ এনে বলেছেন: "তাহাতে আপনার চরিত্রের জন্য কোন ভয় নাই—আর আমি গরীবের মেয়ে, একখানা বাঙ্গালা বই পড়িলেই গোল্লায় যাব?"[৫]

বাঙালি লোকরঞ্জক শিল্পীগণ 'বাবু'-দের এ-মনোভাবের কথা জানতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাবুদের আক্রমণ করেছিলেন।

দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে সর্বত্র বাবুরাই লম্পট। তিনি বাবুর বর্ণনা করে লিখেছেন:

১. 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৩৫৮), ৬, ৩৪, *The Calcutta Review*, Jan-June, 1852.

২. Ivan Bloch, *Sexual Life in England* (Corgi 1965), ch. IX, XVII-XIX.

৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য' ১৯১

৪. 'বঙ্কিম রচনাবলী' ২, ৪৪-৪৫.

৫. 'বঙ্কিম রচনাবলী' ২, ৪৪-৪৫

"মুখে করি হুট্ হুট্, জলপান আমার বিস্কুট
লোকের পোঁদে দিয়ে বেরাই খোঁচা ॥"[১]

তাঁর সৃষ্ট একটি চরিত্রের নাম, "বাবুরাম লোচ্চা"। রূপচাঁদ পক্ষী-ও বাবুদের সম্পর্কে লিখেছিলেন :

"ইংরাজী পড়ে পাত দু'চার,
সরাটা দেখেন ধরার আকার,
মদগর্বে অহঙ্কার,
জীবে ভাবেন তৃণবৎ ॥"[২]

মনোমোহন বসু লিখেছিলেন :

"পূজো-আচ্ছা, নেম্-নিমেষা, সকলি হোল রদ।
রাতদিন কেবল রব শুনি, দে মদ, দে মদ ॥
বাঁকা তেড়ি, বাঁকা ছড়ি, পায়ে বাঁকা বুট।
বাঁকা মেজাজ, বাঁকা মুখে, ড্যাম্ হুট্ হুট্ ॥
ওয়াচ গার্ড গলায় ঝোলে, ট্যাঁকে ওয়াচ ঘড়ি।
জোটেনা বাবুদের কেবল দড়ি কলসীর কড়ি ॥"[৩]

এ-রকম আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ইংরাজ-ভাবাপন্ন বাঙালি বাবুদের দাশরথি রায় ও রূপচাঁদ, মনোমোহন বসু বা প্যারীমোহন কবিরত্ন যে-ভাষায় নিন্দা করেছেন—তা প্রেমগীতি-রচয়িতাদের কলম থেকে বার হোতো না। নব্যবঙ্গের অবহেলা ও ঘৃণা সত্ত্বেও গ্রাম-বাংলায় ঢপ্, তর্জা, কবি ও কীর্ত্তনের ক্ষতি হয়নি। ক্ষতি হয়ে ছিল নিধুবাবুর ও সমধর্মী কবিদের, কারণ, টপ্পা ও আখড়াই যে নাগর পরিবেশে উদ্ভাবিত হয়, ১৮৩০ সালের পরে সে-পরিবেশ ছিল না। প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কেন নিধুবাবুর 'গীতরত্ন'-এর ও রাধামোহন সেনদাসের 'সঙ্গীততরঙ্গ'-এর যথাক্রমে তিনটি ও দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হলো উনিশ-শতকেই? এ-তে কি তাঁদের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয় না? এর

১. 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী', ৭১২, ১৮৬ ৭৮৮
২. 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৪, ৯৫২-৫৩
৩. 'মনোমোহন গীতাবলী' ১৬৩

উত্তরে বলা যায়, জনপ্রিয়তার জন্য নয়, কুম্ভিলকদের সর্বগ্রাসী লোভ থেকে তাঁদের গানগুলো রক্ষা করার জন্যই একাধিকবার 'authentic' সংস্করণ প্রকাশ করা হয়।[১] আরো লক্ষণীয়, লোক-রঞ্জন-শিল্পে দীর্ঘকাল ধরে সূক্ষ্মতার বিরুদ্ধে স্থূলতার সংগ্রাম চলেছিল। সাধারণ ভাবে শিক্ষার প্রসার না হওয়ায় এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের এ-সম্পর্কে অবহেলার ফলে, শেষ পর্যন্ত এ-সংগ্রামে স্থূলতাই জয়লাভ করে। আখড়াই গান অপ্রচলিত হয়; স্থূল হাফ আখড়াই লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে। টপ্পার বিরুদ্ধে, বিশেষভাবে নিধুবাবুর টপ্পার বিরুদ্ধে স্থূল কবিদের বিদ্রূপ বর্ষিত হতে থাকে। দাশরথি রায় লিখেছিলেন :

"এখনো গেল না বেটীর লুকিয়ে জল খাওয়া।
জুতোর চোটে ঘুচাব তোর নিধুর টপ্পা গাওয়া॥"
অথবা, "বেশ্যার আলয়ে যাও বধু হে, নিধুর টপ্পা গাও।"[২]

পাঁচালীকার ব্রজমোহন রায়ের একটি গানে দুশ্চরিত্র বাবুদের নিধুর টপ্পা গাইবার উল্লেখ আছে।[৩] প্যারীমোহন কবিরত্ন "বিধুমুখে নিধুর টপ্পা"র শ্রোতা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে ব্যঙ্গ করেছেন।[৪] অমৃতলাল বসু স্ত্রী-স্বাধীনতা-বিষয়ক একটি গানে যুবতীদের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন :

"আমরা সব কলেজ যাবো, নলেজ পাব,
টপ্পা গেয়ে করব সুখে বাবুয়ানা।"[৫]

স্বয়ং ঈশ্বরগুপ্ত টপ্পা গাওয়ার ওপর কবিতা লিখেছেন।[৬]

বঙ্কিমচন্দ্র টপ্পা সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করতেন, তা জানা যায় না। কিন্তু, পাঁচালী, হাফ আখড়াই ও বিদ্যাসুন্দরের গান সম্পর্কে তাঁর ভালো ধারণা ছিল না। তিনি লিখেছিলেন : "পাঁচালী, হাফ আখড়াই অশ্লীলতার জন্যই

১. গীতরত্ন' (১২৬৩ ও ১২৭৫) ভূমিকা, 'সঙ্গীত তরঙ্গ', (১৩১০), ভূমিকা
২. 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী', ৭১৮, ৭২৩, ৬৭৯.
৩. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য' (১৩৭১), ৭৩
৪. 'সঙ্গীতকোষ' (১৩০৬), ১০২৮
৫. তদেব, ১৩০২
৬. 'বঙ্কিম রচনাবলী', ২, ৮৫২

রচিত।"[১] একটি লেখায় তিনি রাম বসু, হরু ঠাকুর ও নিতাই দাস কবিওয়ালাদের রচিত কোনো কোনো গান ভারতচন্দ্রের রচিত কবিতা থেকেও ভালো বলে মত প্রকাশ করেছেন। শেষে লিখেছেন: "কিন্তু কবিওয়ালাদের অধিকাংশ রচনা, অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই।"[২]

একটি প্রবন্ধে তিনি নিধুবাবুর নাম ভুল করে লিখেছেন "রামনিধি সেন (নিধুবাবু)।"[৩] 'বিষবৃক্ষ'-উপন্যাসের এক জায়গায় আছে: "কোন এক লজ্জাহীনা যুবতী বলিল: নিধুর টপ্পা গাইতে হয় ত গাও, নহিলে শুনিবনা" (বঙ্কিম রচনাবলী, ১, ২৭৩)। অমরেন্দ্রনাথ রায় ও সুশীলকুমার দে এই উল্লেখ থেকে ধরে নিয়েছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব নিধুবাবুর টপ্পা-সম্পর্কে কঠোর ছিল।[৪] কিন্তু শুধু এই সামান্য উদ্ধৃতির সাহায্যে এ-ধরনের সিদ্ধান্তে আসা বোধ হয় ঠিক নয়। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, প্রথম যৌবনে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের দু-একটি কবিতায় 'পয়োধর'-এর আদিরসাত্মক বর্ণনা দেখা যায়। সে-বর্ণনা কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ স্থূল ভাবে আদিরসাত্মক।[৫] 'দুর্গেশ-নন্দিনী' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হলে একজন সমালোচক 'সোমপ্রকাশ'-এ লিখেছিলেন: "...মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা দোষেরও বিন্দুপাত হইয়াছে."[৬]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রাচীন বাংলা প্রেমের গানের রীতি বজায় রেখে নিজেও অনেক প্রেম-গীতি রচনা করেছিলেন। প্রাচীন রীতিতে রচিত হলেও তাঁর গানে নিজস্ব কবি-প্রতিভা ফুটে উঠেছে।[৭] টেকচাঁদ ঠাকুর 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ "বেণীবাবু", "প্রেমনারায়ণ মজুমদার" এবং "বেচারাম বাবু"-র এক সময়ে এক সঙ্গে তিন সুরে তিন রকমের গান গাওয়া সম্পর্কে একটি হাস্য-রসাত্মক দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। "প্রেমনারায়ণের" কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছিল সে-যুগের এই "আধুনিক" গানটি:

১. তদেব, ৮৫৩
২. তদেব, ৮৮৫
৩. তদেব, ৮৪৭
৪. 'নারায়ণ', (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩), ৭৩২-৩৩, S.K.De, *op. cit* 359, fn.
৫. 'বঙ্কিম রচনাবলী,' ২, ৯৭৬, ৯৭৯ প্র°
৬. 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৪, ৬৩৭
৭. 'বাঙ্গালীর গান' ৪৯২ ৪৯৪, 'প্রীতিগীতি', ১৮, ২০০, ৪৩৩, ৮৮

"বাবলার ফুল লো, কানে লো দুলালি।
মুড়ি মুড়কির নাম রেখেছো রূপলি সোনালি।"[১]

টেকচাঁদ ঠাকুরের পিতা রামনারায়ণ মিত্র 'সঙ্গীততরঙ্গ' রচনা করার ব্যাপারে রাধামোহন সেনদাসকে সাহায্য করেন।[২]

এখানে বলা প্রয়োজন, যাঁদের জন্য প্রেমের গান লিখে ও গেয়ে নিধুবাবু ও সমকালীন গীতকারগণ দুর্নাম কিনেছিলেন, সেই রাজা-মহারাজা-দেওয়ানদের মধ্যে কবিত্ব যাঁদের ছিল, তাঁরা প্রায় সকলেই লিখেছিলেন ভক্তিরসের গান। মহারাজা সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর অবশ্য প্রেম-সঙ্গীত রচনা করেন।[৩]

'হুতোম পেঁচা' হাফ আখড়াই ও আখড়াই গান সম্পর্কে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর 'নকশায়' এক জায়গায় শ্রীধর কথকের প্রশংসা দেখা যায়। তাঁর সৃষ্ট একটি ঘুষখোর, নিষ্কর্মা কেরানি-চরিত্র গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর গান, "মদন আগুন, জ্বলচে দ্বিগুণ, কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী," দু'বার গেয়েছে।[৪]

বিগত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকে নূতন ধরনের প্রেমের কবিতা রচিত হতে থাকে। এই কবিতা সম্পর্কে জনৈক সমালোচক তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে লিখেছেন :

"কবিগান ও টপ্পাকে এক কথায় বলা চলে বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার ইতর সংস্করণ।" তারপরেই তিনি লিখেছেন : "একটি ক্ষেত্রে কবিগান ও টপ্পা বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র মর্যাদা দাবী করে। অধ্যাত্ম প্রভাবমুক্ত লৌকিক প্রেমের অকুণ্ঠ দৃপ্ত আত্মঘোষণা এই গানগুলিতে লক্ষ্য করা যায়।"[৫] কবিগান ও টপ্পা এক জিনিস নয়। টপ্পা যদি "বৈষ্ণবপ্রেম কবিতার ইতর সংস্করণ"-ই হয়, তবে তা কি-ভাবে "অধ্যাত্ম প্রভাবমুক্ত" হতে পারে ? বাংলা "ইতর" কথার পরে "অকুণ্ঠ", "দৃপ্ত"-বিশেষণ প্রয়োগ যেন কেমন কেমন ঠেকে।

এ-যুগে বিহারীলাল চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার বড়াল, স্বর্ণকুমারী দেবী, বলদেব

১. 'সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী' ১, ২৫০
২. 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' ১, ১১৬
৩. 'বাঙ্গালীর গান', 'রাজা-মহারাজার গান', ৪৫৪-৪৯১
৪. 'সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী', ১, ৩০-৩১, ৩৮-৪০, ১৩০
৫. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য' (১৩৬৭), ৬৫

পালিত, মুন্সী কায়কোবাদ, গোবিন্দচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কবিগণ শুধু 'দেহাতীত' প্রেমের কবিতা লেখেননি, অথবা প্লেটনিক প্রেমের বর্ণনায় প্রেমের 'ঊর্ধায়ন' নিয়ে-ও ব্যস্ত থাকেননি। বলদেব পালিত 'পয়োধর' নিয়ে আদিরসাত্মক কবিতা লিখেছিলেন (কাব্যমালা, 'পয়োধর')। মুন্সী কায়কোবাদ 'প্রণয়ের প্রথম চুম্বন' সম্পর্কে কবিতা লিখেছেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতায় 'সুরসুন্দরী'-র 'কটিতটে' সংলগ্ন হবার বাসনা প্রকটিত হয়েছে ('কলবেদনা')। স্বয়ং বিহারীলাল লিখেছেন: "ধিক্ রে অধম ধিক্। ভালবাসা প্লেটনিক।"[১] গোবিন্দচন্দ্র দাসের "আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ"-স্মরণীয়। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন: "অতিশয় প্রাকৃত প্রেমের সংস্কার এই কাব্যের ভিত্তিভূমি।[২] বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এ (অগ্রহায়ণ, ১২৭৯, ৩৮৫-৮৬) বলদেব পালিতের 'কাব্যমালা'-র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন:

"তাঁহার দ্রব্যগুলিন একে তেলেভাজা তায় বাশী"

নিধুবাবুর গানে নারীর রূপ বর্ণনায় ঘন কেশ ও কাজল মাখা দুটি চোখের উল্লেখ দেখা যায়। কোথাও 'পয়োধর'—এর বর্ণনা নেই। একটি গানেও খোলাখুলিভাবে সম্ভোগ-শৃঙ্গার প্রাধান্য পায়নি। অথচ, সমকালীন সমালোচক-দের মতে, তিনি-ই না-কি অশ্লীল।

১৮৭৭ সালে রমেশচন্দ্র দত্ত 'Literature of Bengal' (Cultural Heritage of Bengal, Punthi Pustak, Cal. 1962) লিখেছিলেন। তাতে নিধুবাবুর নামই ছিল না। কৈলাশচন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন: "নিধুবাবুর অধিকাংশ গীতই অশ্লীলতাদুষ্ট।"[৩] চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমী ঢং-এ রায় দিয়েছিলেন: নিধুবাবুর টপ্পা "আত্ম বিসর্জনে পরাঙ্মুখ, আত্মোৎসর্গে কুণ্ঠিত, ভোগ বিলাসে কলুষিত, আত্মসুখান্বেষণে অপবিত্র"।[৪] এই ভাবধারা চন্দ্রশেখরের নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের। বঙ্কিমচন্দ্র দু'বার দু'টি প্রবন্ধে লিখেছেন:

১. তদেব, ৬৮, ৭১, ৭৬, ৮৪, ১০৪,

২. অরুন কুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৯৪

৩. 'নানানিবন্ধ', ১১৯

৪. 'রসভাণ্ডার' (বসুমতী, ১৩০৬), ৵০ ৶০

"এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্টি হইল।"[১] চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় কাব্য বিচারে সর্বত্রই আত্মবিসর্জন, আত্মোৎসর্গ ও নৈতিক সংযম খোঁজ করেননি। অক্ষয়কুমার বড়াল রচিত "ভুল" (১২৯৪) সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: "…কবিতাবলীতে কেমন একটা অর্ধশ্রান্ত, অর্ধনিদ্রিত, স্বপ্নাবেশময় ভাব আছে, তাহা বড়ই হৃদয়গ্রাহী।"[২] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো প্রখ্যাত পণ্ডিত-ও নিধুবাবুর গান সম্পর্কে নিন্দাত্মক মন্তব্য করে পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করেন।[৩]

রাজ্যেশ্বর মিত্র লিখেছেন: উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কিছু সম্ভ্রান্ত বাঙালি 'টপ্পা দমন' আন্দোলন শুরু করেন। "এই… আন্দোলনে একবারও ভেবে দেখা হয়নি যে এ-সব গানে প্রকৃত সম্পদ কতখানি আছে।… হিন্দু সমাজের পৌত্তলিকতা বিরোধী দল সুকৌশলে সুকুমার প্রণয়-সঙ্গীত পুত্তলিকাকে অপসারিত করে সেখানে নিরাকার নির্বিকার ধ্রুবপদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।"[৪] 'টপ্পা-দমনের' একটি প্রমাণ রূপে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (১০৮৬ খ্রীঃ) 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী'-র প্রথম খণ্ড উল্লেখযোগ্য। এই সঙ্কলনে ১৫৮০টি গান আছে; নিধুবাবুর একটি গান-ও এখানে উৎকলিত না হওয়ায় কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী'-পত্রিকা এবং নববিভাকর' পত্রিকা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ দেয়। সে-বছরেই 'সঙ্গীত মুক্তাবলী'-র দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হয়। তাতে নিধুবাবুর নামে প্রচলিত কিছু প্রেমের গান ছাপা হয়েছিল।[৫]

'নিরাকার নির্বিকার ধ্রুবপদ'-এর প্রতিষ্ঠা স্থায়িত্ব অর্জন করতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ। ব্রহ্ম-সঙ্গীতে টপ্পার সুর প্রচলিত থাকে। এ-সম্পর্কে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন: "ইদানীং ব্রহ্মগীত প্রায়ই টপ্পার সুরে রচিত হইতে দেখা যায়। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায়। ইহা সঙ্গীততত্ত্বে অজ্ঞতা ও অনুন্নত রুচির ফল।"[৬]

১. 'বঙ্কিম রচনাবলী', ২, ১৯১, ৮৮৬
২. শ্যামাপদ চক্রবর্তী, কাব্যচয়নিকা পরিক্রমা' (১৯৭০), ৩৩
৩ 'নানানিবন্ধ,' ১১৮, পাদটীকা।
৪. 'বাংলার গীতিকাব', ১২১
৫. 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী', ১, ১৲-১/০, ১৷০-১৷/০
৬. কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গীতসূত্রসার' (৩সং ১৯৩৪), ১, ৮২

উনবিংশ শতাব্দীতে 'নিধুর টপ্পা'-র ইতিহাস। (২)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালি রক্ষণশীলতা নানা কারণে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। রক্ষণশীল বাঙালি হিন্দুরা সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধতা করেছে, কৌলিন্য প্রথা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, জাতি-বিচার বজায় রেখেছে এবং বিধবা-বিবাহের প্রচলনের ব্যাপারে বাধা দিয়েছে। রক্ষণশীল বাঙালি নেতারা বুঝেছিলেন, সমাজ-সংস্কারের গতিবেগ দুনিবার হয়ে উঠলে তাঁদের নানা রকম কায়েমী স্বার্থ বিনষ্ট হবে।

কিন্তু এ-কথাও অনস্বীকার্য যে, এক সময় জাতীয়তার ভাবধারা রক্ষণশীলতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ফিরিঙ্গির স্পর্শে শরীর অপবিত্র হওয়া, ফিরিঙ্গির ভাষা বর্জন করা, ফিরিঙ্গির খাদ্য না খাওয়া, ফিরিঙ্গির চাল-চলন বরদাস্ত না করা—রক্ষণশীলতায় উৎপন্ন এ-সব নঞর্থক ব্যবহারে এক ধরণের জাতীয়তাবাদের ছাপ দেখা যায়। এই জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বেন্থামের দর্শন, মিল্টনের কাব্য, কিংবা ফরাসি বিপ্লবের সম্পর্ক ছিল না।

উনিশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে দেশী শিল্পধারাকে বাঁচিয়ে রাখার কিছু কিছু চেষ্টা হয়। সে-প্রচেষ্টার সঙ্গে রক্ষণশীল বাঙালিরা-ও যুক্ত ছিলেন। ১৮২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'গৌড়ীয় সমাজ' অথবা 'The Hindu Literary Society'। এই সমাজের সভ্য ছিলেন রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমানন্দন ঠাকুর প্রভৃতি বাঙালি নেতাগণ। এই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল, অন্যান্য ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করে বাঙলা ভাষার উন্নতি সাধন। দু'হাজার টাকা চাঁদা উঠেছিল। কিন্তু ১৮২৪ সালের পরে 'গৌড়ীয় সমাজ'-এর বিবরণ পাওয়া যায়নি[১] ১৮৩৬ সালে রামলোচন ঘোষ কলকাতায় 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' প্রতিষ্ঠা করেন; ১৮৩৯ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর হিন্দু কলেজে 'বাংলা পাঠশালা' স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হন; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪০ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' চালু করেন। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর আদালতে

১. যোগেশচন্দ্র বাগল, 'বাংলার নব্য সংস্কৃতি' (১৯৫৮), ৭, Amitabha Mukherjee, op. cit. 118-119

ফার্সির বদলে বাঙলা ভাষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। ঐ-বছরে ২৮শে জানুয়ারী তাঁর চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'হিন্দু থিয়েটার'। এ-ব্যাপারে অবশ্য তাঁকে সাহায্য করেছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র মাধবচন্দ্র মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও হরচন্দ্র ঘোষ।[১]

দেশী কবিতা ও গান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন হিন্দু কলেজেব ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ। প্রবন্ধটি ১৮৩০ সালে ইংরাজি ভাষায় রচিত হয়, এবং ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে Literary Gazette-এ মুদ্রিত হয়। আখ্যা ছিল, "On Bengali Works and Writers'. এই নিবন্ধে কাশীপ্রসাদ অন্যান্য প্রাচীন কবিদের সঙ্গে রাধামোহন সেনদাস রচিত গানের আলোচনা ও ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন। ১৮৩০ সালেই প্রকাশিত হয় তাঁর "The Shair and Other Poems'.

তারপর উল্লেখযোগ্য ঈশ্বর গুপ্তেব কবি-জীবনলেখ্য-সংগ্রহ 'কবিজীবনী'। এই সংগ্রহ তাঁর প্রতিভা ও স্বদেশ প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন। 'কবি-সাহিত্য' লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল ; ঈশ্বর গুপ্ত-ই সর্বপ্রথম তাকে কালের গর্ভ থেকে উদ্ধার করেন। নিধুবাবুর যে-জীবনী তিনি লিখেছিলেন, এখনও তা প্রামান্য। আখড়াই গান সম্পর্কে তিনি যে বিবরণ দিয়েছেন, ঐতিহাসিক বিচারে তা অত্যন্ত মূল্যবান। অথচ, একমাত্র মনোমোহন বসু ও বৈষ্ণবচবণ বসাক ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর অন্য কোনো লেখক সে-সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ করেননি।[২]

বাংলার বিস্মৃত কবিদের কাব্য ও জীবনী উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর গুপ্ত অর্থব্যয়ে ও দৈহিক ক্লেশ স্বীকারে কুণ্ঠিত হননি। এ-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন ঃ

"দুঃখের কথা লিখিতে হইলে চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হয়, আমরা এ বিষয়ে যেরূপ দায়গ্রস্ত হইয়াছি, মা-বাপ মরিলে লোকে ইহার অপেক্ষা কি অধিক দায়গ্রস্ত হইতে পারেন...(কবিতা সংগ্রহের জন্য) পায়ে ধরিয়াছি, হাতে ধরিয়াছি, কত বিনয় করিয়াছি, স্বয়ং গিয়াছি, লোক পাঠাইয়াছি, পত্র

১. যোগেশচন্দ্র বাগল, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা,' ১০৯-১১০ ; ১০৬, ২৭, ১৮

২. 'সোমপ্রকাশ'—এ রূপচাঁদ পক্ষীর জীবনী ও গানের সঙ্কলন মুদ্রিত হয়। দ্রষ্টব্য, 'কবিওয়ালাদিগের গীত সংগ্রহ' (১৮৬২), গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; 'প্রাচীন কবি সংগ্রহ' (১২৮৪)

লিখিয়াছি,...যাহা করিবার তাহা করিয়াছি ও যাহা না করিবার তাহাও করিয়াছি। অবশেষে দেশে জলাঞ্জলি দিয়া জলে ভাসিয়াছি, কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি, আহার নিদ্রার সুখে বঞ্জিত হইয়াছি, প্রাণের প্রতি প্রত্যাশা ছাড়িয়াছি...”[১]

ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগরের অবদানও উল্লেখযোগ্য। মেবারের গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৭৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। ‘প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব’ নগেন্দ্রনাথ বসু ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে একদা তাঁকে শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে বসে থাকতে দেখেছিলেন। তখন তাঁর বয়স নব্বই বছর হলেও তাঁকে ৫০।৬০ বছর বয়সের স্বাস্থ্যবান, গৌরবর্ণ, সুদর্শন বৃদ্ধের মতো দেখাচ্ছিল। ৩২ বছর ধরে সারা ভারতে ঘুরে ঘুরে কৃষ্ণানন্দ গীত সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর কাছে থাকতো এক বোঝা পুঁথি-পত্র। ৪৫ রকম কথ্য ভাষার গান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। নগেন্দ্রনাথের অনুরোধে ৯০ বছরের এই অসাধারণ বৃদ্ধ গায়ক রাজপুত বন্দীর পোষাক পরে গেয়ে শুনিয়েছিলেন একটি অবিস্মরণীয় বীরগাথা। কৃষ্ণানন্দ ছিলেন সে-কালের জাতীয় সংহতি-চর্চার মূর্ত্ত প্রতীক। তিনি চার খণ্ডে ‘সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম’ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ‘রঙ্গীন গান মজমুয়া’ ১২৫২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড। তখনি তার দাম ছিল “নছরর রুপৈয়া ২৫”, আর “চারখণ্ডকা জুমলে রুপেয়া ১০০”; গ্রন্থটির গদ্যভাষা হিন্দি। তৃতীয় খণ্ডে আছে ১২ জন বাঙালি-কবি রচিত গানের সঙ্কলন। তাঁরা হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, রাজকৃষ্ণ দেব, আনন্দনারায়ণ ঘোষ, আশুতোষ দেব, শিবচন্দ্র দাস সরকার, কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র রায়, কালী মির্জা ও রামনিধি গুপ্ত। নগেন্দ্রনাথ বসু ‘সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম’-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯১৬ সালে। এ-ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। কৃষ্ণানন্দ “নিধুবাবু মহাশয়ের বিরচিতা গীতাবলী”-র উল্লেখ করেছেন। ‘গীতাবলী’ বোধহয় ১২৪৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘গীতরত্ন গ্রন্থ’।[২]

প্রাচীন কবিদের বিরুদ্ধে ‘নব্যবঙ্গ’-প্রবর্তিত জেহাদের বিরুদ্ধে কলম

১. ‘কবিজীবনী’, ৩৪৯-৫০

২. ‘সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম’ (১৯১৬), ৩, ১-৭, ২০০-৩১২; তদেব (১২৫২), ১৪৫-২৩৬ + ১-১৬

ধরেছিলেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' রচনা করেন। এখানে নিধুবাবু সম্পর্কে রঙ্গলাল লিখেছেন: "...কোন কোন টপ্পা এরূপ স্বভাবপূর্ণ যে, তাহাতে বিশেষ কবিত্ব প্রকাশও পাইয়াছে। নিধুবাবুর ভাষা সহজ প্রকার হওয়াতে তিনি অধিকাংশ লোকের প্রিয় হইয়াছিলেন।" রাধামোহন সেনদাসের গান সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: অধিকাংশই সংস্কৃত শ্লোক বা কবিতার "অনুবাদ মাত্র।"[১]

Rev. J. A. Long-এর 'Catalogue'-এ টপ্পার কবিতা সম্পর্কে আলোচনা নেই, তবে নিধুবাবুর ও 'গীতরত্ন'-এর উল্লেখ আছে। Long 'বিচারসারসঙ্গীত' (১৮৩২), 'সঙ্গীতরসমাধুরী' ও মহতাপচাঁদ রচিত 'সঙ্গীতাবলী'-র উল্লেখ করেছেন।[২]

'বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২-৭৩)-এ রামগতি ন্যায়রত্ন, এবং 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'য় (সংবৎ ১৯৩৫) রাজনারায়ণ বসু নিধুবাবুর উল্লেখ করেছেন। রামগতি ন্যায়রত্নের মতে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নিধুবাবুর মৃত্যু হয়। রাজনারায়ণ নিধুবাবুকে 'কবিওয়ালা' রূপে বিচার করেছেন, কিন্তু আখ্যা-পত্রে 'নানান দেশে নানান্ ভাষা' গানটির প্রথম দুই কলি মুদ্রিত করে কবির প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন।[৩]

ঈশ্বর গুপ্তের পরে প্রাচীন কবি ও গীতকারদের সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর 'কবিচরিত' (প্রথম ভাগ)। এ-বইয়ের সমালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন 'Popular Bengali Literature'. 'কবিচরিত'-এ (১০-১১ পৃ.) রামনিধি গুপ্ত ও রাধামোহন সেনদাসের উল্লেখ আছে। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে হরিমোহন দু'খণ্ডে কবিজীবনী-সহ প্রকাশ করেছিলেন 'সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ'। এ-সঙ্কলনের দ্বিতীয় ভাগে নিধুবাবুর বহু গান মুদ্রিত হয়েছে। ১৩১০ বঙ্গাব্দে তাঁর সম্পাদনায় ছাপা হয় রাধামোহন সেনদাস রচিত 'সঙ্গীত তরঙ্গ'-এর তৃতীয়

১. 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৩৫৮), ৬, ৩৪

২. A Descriptive Catalogue of Bengali Books (1855), ed. D. C. Sen, 678

৩. 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৩৪২), ১৭০-৭২; 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা', ৪৪-৪৫

সংস্করণ। ১৩১১ বঙ্গাব্দে তিনি 'বঙ্গভাষার লেখক' (প্রথম খণ্ড) প্রকাশ করেন। এ-বইতে নিধুবাবু ও শ্রীধর কথক সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য আছে। ১৩১৭ সালে তিনি প্রকাশ করেন 'গোপাল উড়ের টপ্পা' (বঙ্গবাসী প্রেস)।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—এর পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠান 'Bengal Academy of Literature' নিধুবাবুকে অবহেলা করেনি। এই 'আকাদেমি'-তে (১১ই নভেম্বর ১৮৯৩ খ্রী:) বরদাপ্রসাদ দে ইংরাজি ভাষায় রচিত নিধুবাবুর জীবনচরিত পাঠ করেন।[১]

প্রাচীন গানগুলির সংরক্ষণের ব্যাপারে 'বটতলা'-র অবদান ছিল অসাধারণ। 'নব্যবঙ্গ', এবং উন্নাসিক সাহিত্যরথিদের অবহেলার ফলে, মুদ্রণের ব্যাপারে নানারূপ অসুবিধার জন্য, প্রেমের গান শেষ পর্যন্ত বটতলায় আশ্রয় নিয়েছিল। বটতলার নৃত্যলাল শীল 'গীতরত্ন'-গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ১২৭৫ বঙ্গাব্দে। ১২৮৩ বঙ্গাব্দে বটতলায় ছাপা হয় নবীনচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'গীতসার সংগ্রহ'। সেখানেই ছাপা হয় 'মজলিসি সঙ্গীত', 'গায়নহৃৎকুমুদ' (১২৮৭), 'প্রেমহার' (১৮৮৬), 'প্রেমসঙ্গীত' (১২৯৪), 'প্রেমগাথা ও আদিরস সঙ্গীত', 'সঙ্গীতরত্নভাণ্ডার' (শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী), এবং হরিশ্চন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'সঙ্গীত তানসেন'; এ বইতে মুন্সী বিলায়েৎ হোসেন রচিত ১২৭-টি গান সঙ্কলিত হয়েছে।

১৩০৩ বঙ্গাব্দে বৈষ্ণবচরণ বসাক নিধুবাবুর গীতসঙ্কলন 'গীতাবলী'-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। জয়গোপাল গুপ্ত সম্পাদিত 'গীতরত্ন' (১২৬৩, ১২৭৫), এবং 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম' (১২৫২)-এর তৃতীয় খণ্ড থেকে 'গীতাবলী'-তে নিধুবাবুর গান উৎকলিত হয়েছে। গীত-সংগ্রহ সবত্র সুচিন্তিত নয়; এ-ব্যাপারে বৈষ্ণবচরণের বিশেষ দোষ নেই। কারণ, জয়গোপালের 'গীতরত্ন'-তে-ও অন্ততঃ দুটি গান আছে, যা আনন্দনারায়ণ ঘোষ ও 'ঈশ্বরচন্দ্র' বিরচিত। (দ্রষ্টব্য, এই সঙ্কলনের ৫৫৩ ও ৫৬৪ সংখ্যক গীতদ্বয়) 'গীতাবলী'-র প্রামাণিকতা সম্পর্কে সুশীলকুমার দে প্রশ্ন তুলেছেন, এবং আশুতোষ ঘোষাল সম্পাদিত 'বঙ্গীয় সঙ্গীত রত্নমালা অথবা কবিবর নিধুবাবুর গীতাবলী'-র (কলেজ ষ্ট্রীট, ১২৯৩) সঙ্গে তার একীকরণ যুক্তিসিদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন।[২] কিন্তু বৈষ্ণবচরণ মূল 'গীতরত্ন' দেখেছেন, এবং নিধুবাবুর

১. J. B. A. L, I, (1894), No. 6.

২. S. K. De, *op cit.* 357 fn.

গানগুলিকে বাছাই করার চেষ্টাও করেছেন। ভূমিকায় কবি, আখড়াই ও হাফ আখড়াই সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, এবং নিধুবাবুর জীবনী সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য-ও দিয়েছেন। তিনি নিধুবাবুর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ খণ্ডন করেছেন, এবং আশুতোষ ঘোষালের সম্পাদিত গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "ইহাতে প্রায় ১৬০টী গীত আছে। এই পুস্তকখানি বড়ই রহস্যজনক। ইহার প্রায় সমস্ত গীতগুলি অপরাপর লোকের রচিত।··· আশুবাবু নিধুর গীতের ইতিবৃত্ত ও জীবনী লিখিতে গিয়া তাঁহার চরিত্রগত দোষের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বড়ই অপদস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন।"[১]

বৈষ্ণবচরণের অপর সঙ্কলন-গ্রন্থ 'সঙ্গীতকল্পতরু'। নরেন্দ্রনাথ দত্ত, অথবা স্বামী বিবেকানন্দের যুগ্ম সম্পাদনায় এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৪-র ভাদ্রমাসে। ১২৯৪-৯৫ বঙ্গাব্দে 'সঙ্গীতকল্পতরু'-র আরো দুটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। তৃতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৯/০+৫৮৬।[২] বৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত 'বিশ্ব সঙ্গীত'-এর ত্রয়োদশ সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়েছে: "অনেকেই বিদিত আছেন যে, সঙ্গীতকল্পতরু নামক এইরূপ একখানি সঙ্গীত গ্রন্থ আমরা (নরেন্দ্রনাথ দত্তের উল্লেখ নেই—সম্পাদক) সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করি।···"সঙ্গীতকল্পতরু"-র বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া, অনেক নীচ প্রকৃতির লোক ·· নামের অনুকরণ করিয়া কয়েকখানি অসার সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশ করায় ৪র্থ সংস্করণে গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন উচিত বিবেচনায়, ইহার নাম বিশ্ব-সঙ্গীত রাখা হয়··· "সঙ্গীতকল্পতরু'-র ইহাই সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ এবং অতঃপর "সঙ্গীতকল্পতরু" আর মুদ্রিত হইবে না। বসাক এণ্ড সন্স।"[৩]

লক্ষণীয়, 'বিশ্ব-সঙ্গীত'-এর সম্পাদক রূপে আখ্যাপত্রে শুধু 'ভূতপূর্ব রঙ্গভূমি পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক'—এর নামই ছাপা হয়েছে; নরেন্দ্রনাথ দত্ত এ-গ্রন্থে অনুল্লিখিত।

১. 'গীতাবলী', ২১

২. নলিনীকুমার ভদ্র, "সঙ্গীতকল্পতরুতে অজানা তথ্য", 'বেতার জগৎ", (শারদীয়, ১৯৬৯), ১৪৮-৪৯; দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, 'সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীতকল্পতরু' (জিজ্ঞাসা কলিকাতা)

৩. 'বিশ্বসঙ্গীত' (ত্রয়োদশ সং, বসাক এণ্ড সন্স, মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা), ৪৮

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর সুরুতে প্রাচীন বাংলা গান সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার প্রমাণরূপে কয়েকটি বড় বড় সঙ্কলন-গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়, যে-গুলো কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'সঙ্গীত-কোষ' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। এই সঙ্কলন সুচিন্তিত নয়; অনেক গানের রচয়িতার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন 'শ্রীযুক্ত চন্দ্র কিশোর রায়, গুণসাগর'। ১৩০৩ সালে অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় 'গীতরত্নমালা'র প্রথম ভাগ প্রকাশ করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কালী মির্জার 'গীতলহরী'। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে বাঙলা প্রেমের গানের সুবৃহৎ সঙ্কলন 'প্রীতিগীতি' প্রকাশ করেন অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। অবতরণিকায় তাঁর একটি বড় নিবন্ধ আছে। নিবন্ধের বিষয় প্রেম। প্রবন্ধটির উপসংহার ভাবোচ্ছ্বাসময়:

> "বাস্তবিক বঙ্গের প্রত্যেক গৃহস্বামী ঘরে আসিয়া প্রেম প্রতিমা গৃহিণীর মুখখানি দেখিলেই বাহিরের সকল জ্বালা ভুলিয়া যান এবং আনন্দে গান করেন: তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি, হোক্‌গে এ বসুমতী, যার খুসি তার। যদি আমাদের কোন জাতীয় সঙ্গীত থাকে, তবে তাহা এই।"[১]

'প্রীতিগীতি'-তে নিধুবাবুই প্রাধান্য পেয়েছেন। ১৩১২ সালে "ভূতপূর্ব্ব অনুসন্ধান সম্পাদক" দুর্গাদাস লাহিড়ীর সম্পাদনায় বঙ্গবাসী প্রেস থেকে 'বাঙ্গালীর গান' প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় সম্পাদক বাংলা গানের ৭টি যুগের কথা লিখেছেন; তার মধ্যে "চতুর্থ যুগ-টপ্পা।"[২] সুবিপুল এই গ্রন্থে পরিচয়সহ ২২৫ জন বাঙালির গান সঙ্কলিত হয়েছে। কবিদের মধ্যে আছেন তানসেন, নিধুবাবু, রবীন্দ্রনাথ, এমন কি লোকা ধোপা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৪৮। 'বাঙ্গালীর গান'-এ রামপ্রসাদের পরেই নিধুবাবুর প্রাধান্য লক্ষণীয়।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় শিশিরকুমার ঘোষ সঙ্কলিত 'শিশির স্বরলিপি'। এ-সঙ্কলনে স্বরলিপিযুক্ত বাংলা, হিন্দি ও উর্দু গীতের সংখ্যা ৫১৫। নিধুবাবুর নামে প্রচলিত ৬টি গানের স্বরলিপি আছে। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে

১. **'প্রীতিগীতি'** ৩./•

২. **'বাঙ্গালীর গান'** ।।/-॥৶•

প্রকাশিত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সঙ্গীত চন্দ্রিকা'-র দ্বিতীয় খণ্ডে নিধুবাবুর নামে প্রচলিত 'তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে'-গানটির স্বরলিপি আছে। (পৃষ্ঠা, ৫৬১-৫৬২)

অনাথকৃষ্ণ দেব 'বঙ্গের কবিতা'-য় (১৩১৭) নিধুবাবুর গান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন (২৯২-২৯৫ পৃষ্ঠা)। কিন্তু নিধুবাবুর টপ্পার দৃষ্টান্তরূপে তিনি জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক রচিত 'তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা যাবে'—গানটি উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত: "প্রেমস্নিগ্ধ এ সকল গানের মাধুর্য্য শুধু পাঠে উপলব্ধি করা যায় না।" নিধুবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর নামে প্রচলিত ৭টি গানের ইংরাজি অনুবাদ আছে দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 'History of Bengali Language and Literature' (Cal. University, 1911)-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে (pp. 755-757)। তাঁর 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়'-এ (২য় খণ্ড) নিধুবাবুর নামে প্রচলিত ৩৪টি গান সঙ্কলিত হয়েছে। সঙ্কলন সুচিন্তিত নয়। দীনেশচন্দ্র সেন প্রদত্ত নিধুবাবুব কালপঞ্জি সুকুমার সেন (বাঙ্'লা সাহিত্যের ইতিহাস ১৯৪০ খ্রীঃ, ১০৪৮ পৃঃ) ভূদেব চৌধুরী (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ১৯৬০ খ্রীঃ, ২য় ভাগ, ৪২ পৃঃ) ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১৩৭৫, ৩৫৭-৬৬ পৃঃ) গ্রহণ করেননি।

নিধুবাবু ও সমকালীন কবিদের সম্পর্কে সুদীর্ঘ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন সুশীলকুমার দে। তাঁর নানারকম মতের কথা আগে বার বার উল্লিখিত হয়েছে। কবি, টপ্পা, পাঁচালী প্রভৃতি গান সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত: "...it afforded a healthy antidote against the unchecked alienation of literature from national sensibilities...it left its enduring vitality in the current of national thought and feeling, unmistakable influence of which may be traced even in the literature of to-day."[১]

১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় 'নারায়ণ'-এ প্রকাশিত 'নিধুগুপ্ত' প্রবন্ধটি-ও উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধটি লিখেছেন অমরেন্দ্রনাথ রায়। তিনি রবীন্দ্র-কাব্যে নিধুবাবুর প্রভাব খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু যে-গানগুলো উদ্ধৃত করে তিনি আলোচনা করেছেন, সে-গুলো নিধুবাবুরই গান কি-না, সন্দেহ

১. S. K. De, op cit. 269.

আছে। নিধুবাবুর গান সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : "নিধুর গান যে এত ঝরঝাপ্টা খাইয়াও টিকিয়া আছে, সে শুধু তাহার রসের গুণে।"[১] প্রেম-সম্পর্কে নিধুবাবুর ধ্যান-ধারণা তাঁর মতে "প্রকৃত, পবিত্র ও অমূল্য"।[২]

আধুনিক গবেষকদের মধ্যে অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত 'কবিজীবনী'-র 'অবতারণা'-অংশে পাঁচটি প্রবন্ধে এবং শেষে আনুষঙ্গিক তথ্য পরিবেশনে ঈশ্বর গুপ্ত উল্লিখিত প্রাচীন কবিদের সম্পর্কে, বিশেষভাবে নিধুবাবু সম্পর্কে সুপ্রচুর তথ্য দিয়েছেন। তিনি ব্যাপক এবং গভীরভাবে সমকালীন পরিবেশের কথা আলোচনা করেছেন।

ইতিহাস-প্রসঙ্গে কালীকিঙ্কর দত্ত রচিত 'Survey of India's Social Life and Economic Condition in the 18th Century, 1707-1813' (Cal. 1961) গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের ভূমিকায় (page X) রামনিধি গুপ্তের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এ-ভাবে : "…Songs of Ram Nidhi Raya (1741—1834), popularly known as Nidhu Babu's tappa". এ-বইতে আর কোথাও নিধুবাবুর উল্লেখ নেই।

বরোদা-প্রবাসের প্রারম্ভে অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ) নিধুবাবুর ২০টি গান ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদগুলো 'Poems From Bengali'-গ্রন্থে (August, 1956, pp. 2-41) প্রকাশিত হয়েছে। নিধুবাবুর গান ছাড়া শ্রীঅরবিন্দ হরুঠাকুরের ৭টি গান, জ্ঞানদাসের ৮টি কীর্ত্তন, ও চণ্ডীদাসের ৩টি পদাবলীর অনুবাদ করেছেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত অতুলচন্দ্র ঘোষের 'Deathless Ditties'-এ 'এমন যে হবে, প্রেম যাবে, তা কভু মনে ছিল না'—গানটির ইংরাজী অনুবাদ আছে। অনুবাদের আখ্যা, "Disillusionment (From Nidhu Babu)" (P. 33)।

বিশেষভাবে নিধুবাবুর গানের সুর ও তার বিশিষ্টতার বিষয় আলোচনা করেছেন রাজ্যেশ্বর মিত্র ('বাংলার গীতকার' ১৯৬৩)। রামপ্রসাদ, দাশরথি রায় ও গোপাল উড়ের গান সম্পর্কেও তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। 'বাংলা গানে মানবতন্ত্র' ও 'বাংলার টপ্পা', তাঁর রচিত দুটি ভাবগর্ভ নিবন্ধ। তিনি লিখেছেন : "বাংলার মতো এমন মনোহর টপ্পা আর কোথাও পাওয়া যাবে?"[৩]

১. নারায়ণ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩), ৭৩৭
২. তদেব, ৭৩৩, ৭৩৫
৩. 'বাংলার গীতকার', ১০৭

প্রাচীন বাংলা গানের, বিশেষভাবে টপ্পার সাধক ছিলেন কালীপদ পাঠক। গত বছরে ১৫ই নভেম্বর ৮০ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেছেন। "তাঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে চণ্ডীদাস মাল, মায়া রায়, রাজ্যেশ্বর মিত্র, ভূপাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।"[১] 'রূপদর্শী'-র মতে, ৯টি tape-এ তাঁর গাওয়া ২৬টি গানের রেকর্ড সঙ্গীত-নাটক আকাডেমি-তে রক্ষিত আছে। (দেশ, বিনোদন সংখ্যা, ১৩৭৭, ৯০ পৃঃ)। দু'বছর আগে তাঁর গাওয়া 'ভালবাসি বলে ভালোবাসিনে' ও 'মনোহর নয়ন তোমার'-গানদুটি HMV সংস্থা রেকর্ড করেন। (7EPE. 1041) তাঁর দুটি পুরাতন টপ্পা গানের রেকর্ডঃ Senola QS3/OMG 1480-1481, 'যার প্রাণ তারি কাছে', এবং 'নয়নে আমার বিধি'।

বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে নিশ্চয় সঙ্গীত রসিকগণ নিধুবাবুর টপ্পার খবর রাখতেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইছামতী' (১৩৫৮) উপন্যাসে ১৫৯ ও ৩৫০ পৃষ্ঠায় দু'জন মহিলার উল্লেখ করেছেন, যাঁরা দেড়শ' বছর আগে যশোহর জেলার পল্লীগ্রামে থেকেও সখী-সমাজে নিধুবাবুর টপ্পা গাইতেন। প্রথমা প্রগল্ভা প্রৌঢ়া বিধবা, নাম 'বিধুদিদি'; দ্বিতীয়া স্বৈরিণী যুবতী, নাম 'নিস্তারিনী'। এঁরা উভয়েই একটি গান গেয়েছিলেন; গানটি নিধুবাবুর নয়, গোপাল উড়ের। বিভূতিভূষণ গানটির প্রথম দুই কলি তুলে দিয়েছেন। সম্পূর্ণ গীতটি এই:

"ভালবাসা কি কথার কথা? (সই)
মন যার মনে গাঁথা।
শুকাইলে তরুবর, বাঁচে কি জড়িত লতা?
প্রাণ যার প্রাণে গাঁথা॥
হলে পরে বারিহীন, থাকিতে পারে কি মীন?
ছেড়ে কভু নবঘন, থাকে কি বিদ্যুতলতা?"[২]

১. 'অমৃত' (সাপ্তাহিক) ৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭, ২২৭

২. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, 'গোপাল উড়ের টপ্পা' (১৩১৭), ৩৪, গানটি 'সুন্দর' গেয়েছিলেন। 'সঙ্গীতকোষ' ৯৪; প্রথম চরণের পাঠান্তর, 'ভোলা যায় কি কথার কথ'/মন যে মনে গাঁথা। 'প্রেমগাথা ও আদিরস সঙ্গীত', ৫৯-৬০.

গীতরত্ন

প্রথম সংস্করণ (১২৪৪)-এর ভূমিকা

পশ্চাতের লিখিত গীত সকল বহু দিবসাবধি স্থন্দররূপে ব্যক্ত থাকাতে কোন প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে বাসনা ছিল না এক্ষণে সময়ক্রমে এই কারণবশতঃ সর্ব্বসাধারণ গুণগ্রাহিগণের অবগতি জন্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল। এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার হইতে লাগিল, কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহা হইতেও অধিকাংশ ভুরি ভুরি বর্ণাশুদ্ধি এবং অশুদ্ধ পদে পরিপূর্ণিত করিয়া প্রচার করিল। এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম মৎকৃত সঙ্গীতসকল এক্ষণেও যদ্যপি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপ প্রকাশিত না হয় তবে হানি আছে এই আশঙ্কা প্রযুক্ত প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকান্তর্গত গীতসকল আত্মবন্ধুগণের এবং গানে আমোদিত ব্যক্তিদিগের তুষ্টির কারণ রচনা করিয়াছিলাম এক্ষণে প্রচার করণের সেই মানস রহিল। বঙ্গভাষায় এতাদৃশ গানের পুস্তক যদ্যপি সম্পূর্ণরূপে অভিনব নহে তথাপি এ ভাষায় এমত গ্রন্থ অন্যের পুস্তকের দৃষ্টান্তমত কহা যাইতে পারে না, এবং এই গীতসকলে আলাপাচারির দ্বারা যে সকল তান বসিয়াছে তাহা কোন হিন্দুস্থানী খ্যাল ও টপ্পার স্থরে গীত রচনা করিয়ে দেওয়া এমত নহে, অথচ গান করণ মাত্র রাগরাগিনীর রূপ অবিকল বুঝাইতেছে। সঙ্গীতবিদ্যার সমুদয় রাগ ও রাগিণী অতি বিস্তর, কালে কালে তাহার অনেক লোপ হইয়া আসিয়াছে এইক্ষণে যাহা আছে তাহাও অনেকে জ্ঞাত নহে, যাহা হউক এই পুস্তকে সঙ্গীতশাস্ত্রসম্মত এবং সঙ্গীতে পণ্ডিতগণের কল্পিত নানা প্রকার রাগরাগিণীতে গানসকল প্রকাশিত হইল। এতদ্ভিন্ন রাগদ্বয়ে এবং রাগিনীদ্বয়ে মিলাইয়া কতক গীত প্রকাশ করিলাম আর নির্ঘণ্ট পত্রিকাতে ঐ রাগ এবং রাগিণীর সময় নিরূপণ করিয়া ভৈরবাদি রাগসকল রীতিক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করিলাম অনুমান করি যে ইহাতে পাইঠবর্গের (পাঠকবর্গের-সম্পাদক) কিঞ্চিৎ উপকার দর্শাইতে পারিবেক।*

(রামনিধি গুপ্ত)

* ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবি-জীবনী'-তে উদ্ধৃত রামনিধি গুপ্ত রচিত কার পাঠে কিছু গরমিল দেখা যায়। 'কবিজীবনী'। ১৯৫৮ সংস্করণ। (পৃ. ১১৬-১১৭)

॥ রাগ-রাগিণী সূচী ॥

রাগ-রাগিণী	সময়	পৃষ্ঠা
খাম্বাজ-বাহার	বেলা দেড় প্রহরের পর	৬৭
খাম্বাজ	সন্ধ্যার পর	১১৩
গারা-ঝিঁঝিট	সন্ধ্যার পর	৮৬
গারা-কাফি	তদেব	৯৭ ১১২
গুর্জরী-টোড়ি	বেলা এক প্রহরের পর	৩৫
গৌড়	দিবারাত্র	১২৫
গৌড় মল্লার	দিবারাত্র	১২৫
গৌড়ী	সায়ংকাল	৩৫
ছায়ানট	চারদণ্ড রাত্রের পর	৩৯
জয়জয়ন্তী	রাত্রি এক প্রহরের পর	১১৭
জয়েজ ঝিঁঝিট	উষাকাল	৮৭
ঝিঁঝিট	দিবারাত্রি	৭৪
টোড়ি	বেলা এক প্রহরের পর	৩৩
দরবারি-টোড়ি	তদেব	৩৪
দরবারি কানাড়া	বেলা দেড প্রহরের পর	৯২
দেশকার	চার দণ্ড রাত্রি থাকিতে	১২৬
দেওগিরি	দিবার প্রথম প্রহর	৫০
দেও গান্ধার	সূর্যোদয়ের পর	৫১
ধানেশ্রী-পূরিয়া	বেলা আড়াই প্রহরের পর	১২১
পরজ	মধ্যরাত্র	১১৮
পরজ কালাংড়া	রাত্রি এক প্রহরের পর	১৯
পাহাড়ী-ঝিঁঝিট	দিবারাত্রি	৮২
পূরবী	দিবার শেষ প্রহরে	৪৮
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	—	১৪২
বিভাস	প্রভাত	১১
বিভাস কল্যাণ	এক প্রহর রাত্রি থাকিতে	১১
বাগেশ্বরী	চার দণ্ড রাত্রির পর	৪০
বাগেশ্বরী-টোড়ি	তদেব	৩৫

গীতরত্ন ও পরিশিষ্ট

গীত-রত্ন

১. ভৈরব ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১

অরুণ সহিতে করিয়া অরুণ আঁখি উদয় প্রভাতে।
কমল বদন, মলিন এমন, না পারি দেখিতে ॥
উচিত না ছিল তব প্রভাতে আসিতে।
দুঃখের উপর, দুঃখ হে অপার, তোমারে হেরিতে ॥ ১ ॥

২. ভৈরব ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১

দেখ না সই, প্রভাতে অরুণ সহ উদয় শশী।
গেল বিভাবরী, কাতর চকোরী,
এখন শশীরে পেয়ে রহিল উপোষী ॥
প্রফুল্ল নীরে কমল,
মলিন হৃদি কমল।
সময়ের গুণ,
কি কব এখন।
মিলনে অধিক দুঃখ হইল প্রিয়সী ॥ ১ ॥

৩. ভৈরব ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১-২

উদয় অরুণ মলিন হৃদয় কমল।
ভাবিতে শশিরে নিশি শশী সনে গেল ॥
বিভাবরী পোহাইল,
অনেক হরিষ হল।
আমার হতেছে বোধ দিনমণি কাল ॥ ১ ॥

৪. ভৈরব ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২

দেখ না সই ! এ কি বিষম হইল পিরীতি মোরে ।
কহিতে সে দুঃখ, বিদরয়ে বুক,
নয়ন নীরেতে ভাসে অনল অন্তরে ॥
রাখিতে কুলের ভয়, ত্যজিতে প্রাণ সংশয় ।
গন্ধমুখী মুখে, হরি হরি-ডাকে ।
ত্যজিলে নয়ন যায়, খাইলে সে মরে ॥ ১ ॥

৫. ভৈরব ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২

বিনয়েব বশ যদি হইত যামিনী ।
প্রভাত প্রমাদ তবে সহে কি কামিনী ॥
পরশে প্রাতঃ সমীর,
চঞ্চল অন্তর মোর,
কেমনে রাখিব আর শুন গুণমণি ॥ ১ ॥

৬. ভৈরব ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২

এমন পিরীতি প্রাণ জানিলে কে করে । (হে)
সুখ আশে ভাসে সদা দুঃখের সাগরে ॥
সতত চাতুরী করি জ্বলাবে আমারে ।
তবে কি যতনে প্রাণ সঁপিহে তোমারে ॥ ১ ॥
বিরহ জ্বালায় মন করি ত্যজিবারে ।
ছাড়িলে না ছাড়া যায়, কি হলো আমারে ॥ ২ ॥

৭. ভৈরব ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩

যুগল খঞ্জন হেরি বদন কমলে । (প্রাণ)
ভূপতি না হয়ে প্রাণ যাইছ বিফলে ॥

সবেধন মন ছিল, হেরিয়া তা হারাইল।
লাভ ত হইল ভাল, গেল বিনি মূলে ॥ ১ ॥

৮. ভৈরব ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩

তোমার সাধনা করি সাধনা পূরিল।
মনের যে সাধ তাহা মনেতে রহিল ॥
তোমা বিনা কোন জন,
তুষিবে আমার মন।
জানিয়া না কর তুমি বিষম হইল ॥ ১ ॥

৯. ভৈরব ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩

কেন পিরীতি করিলাম ! মজিলাম হায়।
পিরীতি করিয়া সখি, এ কি হল দায় ॥
কহিতে সে সব দুঃখ প্রাণ বাহিরায়।
মনে করি, না ভুলিব তাহার কথায় ॥
দেখিলে তাহার মুখ, দুঃখে হাসি পায় ॥ ১ ॥

১০. ভৈরব ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩

এই কি তোমার প্রাণ ছিল (হে) মনে ?
যাঁচিয়া যাতনা দিবে, জানিব কেমনে ?
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে।
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধা বচনে ॥ ১ ॥

১১. ভৈরব ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩

নয়ন অন্তরে অন্তরে তোরে নিরখি মন নয়নে
চাক্ষুষে যতেক সুখ, তত হয় কি মননে ॥ ১ ॥

১২. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪

নয়নঘরে দেখরে প্রবল বিরহানল।
জলে হুতাশন, জ্বলয়ে দ্বিগুণ, না হয় শীতল ॥
ইহার উপায় বিধি, কি বা সেই প্রাণ নিধি, বোধেরে হইল।
বাসনা পূরিবে,, দুঃখ দূরে যাবে, নিভিবে অনল ॥ ১ ॥

১৩. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪

দিবা অবসান হয়, কখন পাব তারে ?
নিশিতে পাইলে দেখ, নহেত সুখেরে,
নীব মধ্যে বাস মোর, আঁখি ভাসে নীবে।
তারে না হেরে অনল, জ্বলিছে অন্তরে ॥ ১ ॥

১৪. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪

নয়ন কাতব কেন, তাহারে না দেখিলে।
চতুর্ভুজ হই বুঝি সে মুখ হেরিলে ॥
নয়ন আপন মতে মনেবে আনিলে।
বিনা দবশনে দুঃখ, যায় কি করিলে ॥ ১।
কেমন নয়ন মোর, না ভুলে ভুলালে।
কহে আর সুখ কিবা, সে নিধি নহিলে ॥ ২ ॥

১৫. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪

নয়নেরে দুঃখদিয়া মনেতে সদা উদয়।
দরশন দিতে প্রাণ কেন হে এত নিদয় ॥ ১ ॥

১৬. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪

আমি কি কখন তোমা বিনা সুখী।
যেরূপ করয়ে প্রাণ, যতক্ষণ নাহি দেখি ॥ ১

১৭. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫

ভয় রবে, রাগ, নিদয় করো না।
তোমাতে থাকিলে ভয়, আর কি ভাবনা॥
অবলার কি বা বোধ,
তাহাতে করিছ ক্রোধ।
বুঝালে হে আর মত, কখন হবে না॥ ১ ॥

১৮. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫

বিলাসে অলস রস কি হবে?
যামিনী কাহার বশ বিনয়ে কি রবে?
নিদ্রাবশে গেল কালো,
সুখ তো করিলে ভালো।
এখন চেতন হও, আর কে কহিবে॥ ১ ॥

১৯. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫

আর কি সহে প্রাণ বিচ্ছেদ অনল?
অনেক দিবসান্তে পাইয়া হয়েছি শীতল॥
নয়ন নিকটে থাক,
কার নাহি দেখি দেখ।
তিল অদর্শন হলে হয় নয়ন সজল॥ ১ ॥

২০. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫

সুজন সহিত প্রেম, কি পরমাধিক সুখ, করেছে সে জানে।
চকোরের প্রীত, চাঁদের সহিত,
শশীও তেমতি তারে তোষে সুধাদানে॥
শীতল হইবে বল্যা, পতঙ্গ অনলে জ্বল্যা, ত্যজয়ে জীবন।
যার যেবা ভাব, সেইরূপ লাভ,
শঠের স্বভাব ভাল না হয় কখন॥ ১ ॥

২১. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫-৬

মন কোথা আছয়ে হে বল অন্যমন। (প্রাণ),
যা আছে তোমার কাছে তুমি কি না জান ॥
তব ধ্যান দিবানিশি,
করি, এই অভিলাষী।
ইহা বিনা প্রিয় আর না জানি কখন ॥ ১ ॥

২২. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬

তুমি হলে রাজেন্দ্র, আমি তব দাসী।
তোমার অধিনী হয়ে থাকি ভালবাসি ॥
করি অনেক সাধন,
এমন হয়েছে মন।
ইহাতে সদয় থাক, সুখী দিবানিশি ॥ ১ ॥

২ . ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬

তুমি মোর সুখের কারণ প্রিয়সি !
সদা উল্লসিত চিত হেরি মুখশশী ॥
রাজেন্দ্র লো যদি আমি,
রাজেন্দ্রাণী হলে তুমি।
উভয় পিরীতে হয়, দাস কেহ দাসী ॥ ১ ॥

২৪. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬

না বল্যা গেলে কেনে (গেলে কেমনে), মনেরে প্রবোধি কেমনে
বিচ্ছেদ বিষ অনলে জ্বলি দুই জনে ॥
বলা না বলিতে বটে,
বিচ্ছেদ ইহাতে ঘটে।
তথাপি কারণ জানি, থাকি আনমনে ॥ ১ ॥

২৫. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬

একপল বিপল না হেরি,
ওলো, হতো তোব নয়ন সজল।
অধিক বিলম্বে এবে, সে জল শুকায়ে গেল ॥
অন্তরে জ্বলিছে অতি বিরহ অনল।
নিশ্বাস পবন তাহে সহকাবি করে ভাল ॥ ১ ॥

২৬. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭

এই কি করিতে উচিত অবলা সবলা সনে? (প্রাণ)
দরশন সুখে দুঃখ করহ কি নিদর্শনে ॥
এমন করিবে যদি জান মনে মনে।
কপট বিনয় ছলে ভুলাইলে কেনে।
এই হলো, যায় প্রাণ, ক্ষতি কি? হের নয়নে ॥ ১ ॥

২৭. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭

আমি হে তোমার মত না হইলাম।
এত সাধে এই হলো,—কুলে কলঙ্ক কিনিলাম ॥
মন সাধনা অতীত, বুঝি হে তোমারে,
নহিলে সদয় তুমি হইতে আমারে ॥
দিবানিশি তব ধ্যান জ্ঞান করিয়া দেখিলাম ॥ ১ ॥

২৮. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭

মনেতে উদয় যাহা, না পারি কহিতে।
হৃদয়নিবাসি তুমি হয় হে বুঝিতে ॥
আমার মনের মত করিতে উচিত।
অধিক কথন আর না যায় লাজেতে ॥ ১ ॥

২৯. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭

আমার এ যাতনা কে কবে তারে ?
না থাকিলে কুলভয়, তবে কি সাধি কারে ?
তারে পেলে যত সুখী,
জানে মোর মন আঁখি।
লাজ প্রতিবাদী হয়ে মজালে মোরে ॥ ১ ॥

৩০. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭-৮

আমি লো তাহার, তাহাব মনে।
সে আমার, মোর মনে।
দেখ দেখি কত সুখ, উভয়ে প্রেম দুজনে ॥ ১ ॥

৩১. ভৈরব ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৮

কাজল নয়নে আর দিও না কখন।
শরে কেবা নাহি মরে ? বিষ যোগ তাহে কেন ?
তোমার কটাক্ষে কেহ না বাঁচিত প্রাণ।
বাঁচিবার এক হেতু তাহা আছে শুন ॥
সুধা, হলাহল, সুরা—নয়নের তিন গুণ ॥ ১ ॥

৩২. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা গী. র. ৮

মনে বুঝি প্রাণ পড়েছে মোরে।
তেঁই সে এসেছ নাথ, এতদিন পরে ॥
পিরীতি করিয়ে প্রাণ,
কে কোথা এসে পুনঃ,
ভুলিয়ে এসেছ বুঝি, মন রাখিবারে ॥ ১ ॥

৩৩. ভৈরবী ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৮

অন্তরে অন্তর (অন্তর অন্তরে) অন্তর হবে কেন ?
ঊর্দ্ধে দিনমণি, সালিলে নলিনী, মনে মনে একই মনঃ।
চক্রবাক চক্রবাকী,
নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি।
অন্তরে অন্তর দেখ পিরীতের এই গুণ ॥ ১ ॥

৩৪. ভৈরবী ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ৮

যদি সুখে থাকিবে হে, শুন মন রাজন।
অহঙ্কার দূর্ কর, ক্রোধ নিবারণ ॥
প্রেমের প্রিয় জানিবে,
মোহ নিকটে না যাবে।
বিরহে যত জ্বলিবে, তত সুখ জান ॥ ১ ॥

৩৫. আশা ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৯

এত কিরে জানি, হরিয়ে লইবে মন হাসিতে হাসিতে। প্রাণ।
কিছুই নাহিক দোষ, কেবল সে বিধুমুখ. দেখ দেখিতে দেখিতে ॥
কিবা দিবা বিভাবরী,
পাশরিতে নাহি পারি,
আঁখি অনিমিষ পথ হেরিতে হেরিতে ॥ ১ ॥

৩৬. ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. ব. ৯

যতনে রতন লাভ শুন মনোমোহিনি।
অযতনে প্রেমধন কোথা হয় ধনি।
যে ভাবে ভুলায়ে মন,
হরিয়ে লইলে প্রাণ,
সে ভাবে অভাব লাভ ভাব বিনোদিনি ॥ ১ ॥

৩৭. আশা ভৈরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৯

উভয়ে মিলন সুখ পিরীতি রতন।
একের যতনে দুঃখ না যায় কখন ॥
মনোমনেতে মিলন,
হলে সুখী হয় প্রাণ।
ইহাতে অন্যথা হলে ভাবহ কেমন ॥ ১ ॥

৩৮. খট্ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০

বিষম হইল সখি, কি করি ইহাতে।
না দেখিলে ঝুরে আঁখি, না হেরে মানেতে ॥
প্রবল মন অনল,
নয়ন সদা সজল।
দ্বিগুণ দহিছে প্রাণ দোঁহার রীতিতে ॥ ১ ॥

৩৯. খট্ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০

প্রেম সুখের সাগর, জানি প্রথমেতে।
যতন করিয়ে প্রাণ সঁপিলেম তাহাতে ॥ ২
হইল রতন লাভ,
কথায় কত কহিব।
দুঃখ উপজিবে ইথে, ছিল না মনেতে ॥ ৩

৪০. খট্ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০

মনের যে আশা, তাহা যদি না পূরিত।
তবে কি পরাণ কেহ রাখিতে পারিত ?
দেখ না চাতকী ঘন,
দিবানিশি করে ধ্যান।
বারিদানে তোষে তারে না রাখে তৃষিত ॥ ১

তার সাক্ষী প্রদীপ, পতঙ্গ আসিত।
হইয়ে আগেতে দেখ, হয় প্রজ্বলিত ॥ ২ ॥
তার আশা পূরাইতে,
পতঙ্গ পুলক চিতে,
আপনি জ্বলয়ে তাতে, রাখিতে পিরীত ॥ ৩ ॥

৪১. বিভাস ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০

তুমি মোর প্রাণ ধন মন সকল ওলো।
এই যে কারণে আমি হইলাম রাজেন্দ্র ॥
নির্ভয় শরীর মোর, উল্লাসিত অন্তর,
হৃদয়ে উদয় সদা প্রেম পূর্ণচন্দ্র ॥
জ্বলিয়ে বিরহানলে, এবে মিলন সলিলে, হয়েছি সুস্থির।
রিপুগণ নিজজন, দুই এবে প্রিয়জন,
এমন সময়ে মন, দেখ না কি সুন্দর ॥ ১ ॥

৪২. বিভাস কল্যাণ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১

মঙ্গলাচরণ কর সখিগণ!
আইল মনোরঞ্জন, গাও এমনকল্যাণ ॥
নয়ন কমল মোর, আনন্দ সলিল পূর।
ভূরু আম্র শাখা তাহে রাখান ॥
কেহ কর অধিবাস,
কেহ শঙ্খে পূর শ্বাস, হয়ত বিধান ॥
কেহ শুভ ধ্বনি কর,
যৌতুক-স্বরূপ মোরে দেহ দান ॥ ১ ॥

৪৩. ললিত বিভাস ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১

এমন সুখের নিশি কেন পোহাইল।
কহিতে না পারি আমি, কত খেদ উপজিল ॥

নিশির তিমির গুণ, তাহে মন সুখী ছিল।
তমোহন্তি দিবাকর, হেরি মনঃ কালী হল ॥ ১ ॥

৪৪. শ্যাম ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১

মানে কারো সমাদব থাকে কি কখন?
ইথে মনোভার, বল না তোমার, হইল কেন?
জ্বলিলে মান আগুণ,
কেমন করয়ে প্রাণ,
বোধ নাহি থাকে তখন।
তুমি যত সাধ, উপজয়ে ক্রোধ, বোঝ বচন ॥ ১ ॥

৪৫. শ্যাম ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. ব. ১১-১২

একেবারে ভুলিলে কি প্রাণ! অধিনী জনে?
দেখ দেখি অহর্নিশি, তুমি মোর মনোবাসি নাহি তব মনে ॥
চাক্ষুষ বিহনে তুঃখ, কহিতে বিদরে বুক,
এবে নিবেদন মোর, মনো হইতে অন্তর, হয়ো না বেনে ॥ ১ ॥

৪৬. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২

হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরি।
কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি ॥
মনঃ তার মনে মিলে,
প্রাণ লয়ে সমর্পিলে।
নয়ন তৃষিত সদা, দিবা বিভাবরী ॥ ১ ॥

৪৭. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২

বদন শরদ শশী পাষাণ হৃদয়।
অমিয় সমান ভাষি মৃদু হাসি তায় ॥

লইয়ে যে কুন্তল ফাঁসি, আঁখি চোর আছে বসি।
মনের গলেতে দিয়ে প্রাণ হরে লয় ॥ ১ ॥

৪৮. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২

মুকুরে আপন মুখ সদত দেখো না ধনি।
আপনার রূপ, দেখি অপরূপ, অধীনে ভুল কি জানি ॥
দেখ, আপনার ধন,
সদত দেখে যে জন,
করিতে যে ব্যয়, তার হয় দায়, সকলের মুখে শুনি ॥ ১ ॥

৪৯. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২-১৩

মুকুবে আপন মুখ হেরিলে যে হই সুখী।
নয়ন আমার, বাস হে তোমার, এই সে কারণ দেখি ॥
আদর্শে দর্শন মুখ,
সৌন্দর্য্য হয় অধিক।
রূপেব যতন, তোমাব কারণ, জানে হে তোমার আঁখি ॥ ১ ॥

৫০. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩

মিলনে যত সুখ, মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই, নিধি ত্যজা যায় না ॥
চাতকীর ধারাজল, যাহাতে হয় শীতল;
সেই বারি বিনা আর অন্য বারি চায় না ॥ ১ ॥

৫১. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥

মনে মনে মান, করিলে হে প্রাণ, প্রকাশ বদনে
হুতাশন আচ্ছাদন হয় কি বসনে ?

যে যার অন্তরে থাকে,
অন্তরে অন্তরে দেখে,
মান কি কখন, প্রাণ, থাকয়ে গোপনে ॥ ১ ॥

৫২. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩

হেসে হেসে প্রাণ, করিলে পয়ান, হানিয়া নয়নে
সেই অবধি মোর মন গেল কোনখানে ॥
আসার ভরসা করি,
শূন্য দেহ আছি ধরি।
সচেতন হব তবে পুনঃ দরশনে ॥ ১ ॥

৫৩. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩

যে গুণে ভুলালে, অবলা সরলে, সে কি গুণ, গুণমণি ?
আমার কি আছে গুণ, বুঝিব তোমার গুণ, নিজগুণে বল শুনি ॥
শয়নে স্বপনে আর,
অদর্শনে নিরন্তর।
মননে দেখি তোমারে, ভুলি আমি আপনারে,
চাক্ষুষে সুখে তেমনি ॥ ১ ॥

৫৪. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩

অনিবারে দহে মন।
না হেরে তব ও বিধুবদন ॥
হেরিলে কি সুখী হই, না যায় কখন।
আপনারে ভুলে আমি থাকি হে তখন ॥ ১ ॥

৫৫. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৪

যার এত গুণ সই, সে কেন এমন ?
কখন কখন ইথে খেদান্বিত মনঃ ॥

বুঝি এইরূপ হবে করি অনুমান।
কমলে কণ্টক আছে বিধির বিধান ॥ ১ ॥

৫৬. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৪

সরস বদন তব কমল নয়ন।
মন ষটপদ মম অচল চরণ ॥
রতন যতন কর, মন ধন অতঃপর,
অপদ অবল বল হয় অযতন ॥ ১ ॥

৫৭. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৪

শশধর ধরে, আপন উপরে, বশিশশী কমলিনী।
ভুরু ভঙ্গ মধুপান, করে কর দরশন, মোহিত দিবারজনী ॥
কেশ ঘন ঘন রূপ, কিবা শোভা অপরূপ, শিখি সখা অনুমানি ॥১॥

৫৮. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৫

নিবিড় নীরদ সহ উদয় শারদ শশী।
দেখ সৌদামিনী, তাহাতে বাখানি, তার মৃদু মৃদু হাসি ॥
যুগল বন্ধন তায়, বোধ হয় অভিপ্রায়,
কি, কমলদল, শোভিয়াছে ভাল, মৃগ আঁখি ভালবাসি ॥১॥

৫৯. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৫

ও কেরে লুকায়ে মোরে যাইছে দ্রুত গমনে?
মনোনয়ন প্রহরী, তুমি তার কাছে চুরি করিব বল কেমনে?
আশা সহ মোর মনঃ, রক্ষক তব কারণ, অন্য ভাব কেন?
যেখানে থাক যখন, আমি সেখানে তখন, বুঝে দেখ মনে মনে ॥১॥

৬০. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৫

চল, যাইলো সখি ! যেখানে মনোহরণ ।
চিত না ধৈরজ ধরে, নয়ন রোদন করে, কাতর অতি পরাণ॥
লোকের গঞ্জনা ভয়, করিলে কি প্রাণ রয়, বুঝ না এখন ।
অতএব ত্বরান্বিত, হইতে হয় উচিত, বিলম্বের নাহি গুণ ॥১॥

৬১. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৫

গুণের সাগর তুমি হে গুণ নিধি ।
তোমার যতেক গুণ, কহিতে আমি নির্গুণ, জানে কি বিধি?
কি কব তোমার গুণ, যে গুণে মোহিত মন, মোর নিরবধি ।
তব গুণে যত সুখ, কুলের কপালে ধিক্ করেছে বিধি ॥ ১ ॥

৬২. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৫

সরোজ উপরে দেখ শোভে কুমুদিনী ।
তারপরে মধুকর মোহিত অমনি ॥
' দিবাকর নিশাকর,
তার মধ্যে শোভাকর ।
অরুণ অধোতে শশী নিরখ অমনি ॥ ১ ॥

৬৩. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৬

অলাভ জালিলে কেহ কারে সঁপে প্রাণ ।
(অতি সুখ হবে বোধ তাহার তখন ॥)
কতজন গঞ্জন করে, দেখরাত্রি দিন ।
সে কথা শ্রবণে না শুনে কখন ॥ ১ ॥
সুজনে সুজনে সুখ, কুজনে সুজনে দুখ ।
মত মত বিণা চিত সদা জ্বালাতন ॥ ২ ॥

৬৪. কালাংড়া ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ১৬

লোকলাজ, কুলভয় কি করে মনো মজিলে।
যারে সদাক্ষণ, প্রাণ, প্রাণ প্রাণ করে, বাঁচে কি তারে ত্যজিলে?
দেখিবারে যার মুখ,
নয়ন পাগল দেখ, বচন শ্রবণে ভুলালে।
পরশে পরশে, নাসিকা সুবাসে, রসের রসনা শেষ শুনিলে ॥ ১ ॥

৬৫. কালাংড়া ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ১৬

রতিপতি অতি দুঃখী হে সখি! মম দুঃখেতে।
জানি মনোমত, তথাপিহ নাথ, এত চাতুরী করে কেমতে ॥
কি কহিব মনোজেরে,
দুঃখ দেয় অবলারে, কি সুখ তাহার ইহাতে।
পুরুষের ভয়,
হয় অতিশয়, এই হয় মোর মনেতে ॥ ১ ॥

৬৬. কালাংড়া ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ১৬

অনেক যতনে তোমারে পেয়েছি।
বিরহ অনলে আমি সদা জ্বলেছি ॥
জনরব বিষধর,
খাইয়াছি নিরন্তর,
মিলন অমিয় পানে এবে বেঁচে আছি ॥ ১

৬৭. কালাংড়া ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ১৬-১৭

আমি যে তোমার, তুমি তো বুঝিয়াছ
ভাবনা ইহাতে মোর দূরে রেখেছ ॥

আমি হে তোমার প্রাণ,
জানাইতে প্রাণপণ,
করেছিলাম যেমন,—তুমি জেনেছ ॥ ১ ॥

৬৮. কালাংড়া ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ১৭

প্রবল প্রতাপে বুঝি প্রাণ ! তুমি কি ভূপতি হলে ?
আমার আশারে তুমি অনা'সে বান্ধিলে ॥
আশা উদ্ধারিতে মন,
গেল হে তব সদন ।
সেই পথ হল সেও, তারে কি করিলে ? ॥ ১ ॥
লাজ ভয় শান্ত মতি,
বিরহ প্রবল অতি,
ইহারে দমন কর, রাজা যে বলালে ॥ ২ ॥

৬৯. কালাংড়া ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ১৭

মৃদু মৃদু হাসি প্রাণ ! মনের তিমির নাশে ।
এরূপ দেখিয়ে হৃদি-কমল প্রকাশে ॥
পাছে তব রোষ হয়, সদা মোর ওই ভয়,
প্রাণ কি কখন সুখী তোমার বিরসে ? ॥ ১ ॥

৭০. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৭

সেই সে পিরীতি প্রাণ, পারে লো রাখিতে ।
দুখে সুখ অনুভব যাহার মনেতে ॥
প্রেম করা নাহি দায়,
রাখিতে কঠিন হয় ।
মান অপমান ভয়, নাহি যার চিতে ॥ ১ ॥

৭১. কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৭-১৮

তিমির কি থাকে ওলো শশীর কিরণে ?
উৎপত্তি যা অদর্শনে, নাশ দরশনে ॥
মুদিত কমল যদি, হেরলো (হেরেলো) অরুণে।
প্রফুল্ল হয় তখনি, বুঝলো মননে ॥ ১ ॥

৭২. পড়জ কালাংড়া ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১৮

আল্যা প্রাণ, আল্যা আল্যা হে, মম গৃহে অনুগ্রহ করিয়ে।
শীতল হইলাম আমি, বিরহে জ্বলিয়ে ॥
কত সুখ উপজিল তোমারে হেরিয়ে।
বুঝাতে না পারি তাহা কথায় কহিয়ে ॥ ১ ॥

৭৩. পড়জ কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৮

কহিতে তাহাব কথা উপজে সুখ অপাব।
তখন অন্য ভাবনা থাকে না আমাব ॥
কহিবারে তার গুণ, এক মনো হয় মনঃ,
রসনা অবশ নহে, কহি যত বাব। ॥ ১ ॥

৭৪. পডজ কালাংডা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৮

ভাবিতে ছিলাম যারে, সেই আসি প্রকাশিল।
দুখানল হাতে মনঃ সুখেতে ডুবিল ॥
বিচ্ছেদ বিষজ্বালায়,
অস্থির ছিলাম তায়।
হেরিয়ে তাহার মুখ সে যাতনা গেল ॥ ১ ॥

৭৫. পড়জ কালাংড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১--১৯

সটের পিরিতি রীতি ঐ দেখ না সই কপট অন্তরে।
লইয়ে দর্পণ, দেখহ যেমন, রাখিলে রহিল দূরে ॥

৮৪. সরফর্দা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২১

এখন কোথা তারা নাথ বিহনে ?
নিদ্রা রিপু হয়ে, মারিত জ্বালায়ে, এবে না আইসে যতনে ॥
কোথা সেই হাসি গেল, কোথা গেল মান ?
এবে সে এই হইল, লাভ হে রোদন ॥
অঙ্গে আভরণ, না সহে এখন, দহিছে কেবল মদনে ॥ ১ ॥

৮৫. সরফর্দা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২১

বলনা আমারে সই বাঁচিব কেমনে ?
প্রাণ সঁপিলাম যারে না হেরি নয়নে ॥
এমন হইবে আগে, নাহি জানিতাম ।
জানিলে এমন প্রেম নাহি করিতাম ॥
পিরীতে এই ত সুখ, সংশয় জীবনে ॥ ১ ॥

৮৬. সরফর্দা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী, র. ২১

বিচ্ছেদেতে যায় প্রাণ, না পারি রাখিতে ।
কাতর নয়ন মনে, লাগিল কহিতে ॥
শুনি মন করে ধ্যান, প্রাণেরে বাঁচাতে ।
চাক্ষুষ বিহনে নাহি উপায় ইহাতে ॥ ১ ॥

৮৭. সরফর্দা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২২

অলিরাজ ! যেখানে বিরাজ, ভুল না কমলে ।
দিবাবিভাবরী, তব ধ্যান করি, ভাসি হে সলিলে ॥
এ রীতি তোমার আমি ঘুচাইতে পারি ।
তুমি ভাসিবে নয়ন জলে ।
ইহাতে অধিক, আমার যে দুঃখ,
কি হবে কহিলে ॥ ১ ॥

৮৮. সরফর্দা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২২

কমলিনি কেন অভিমানী অধীন ভ্রমরে। ও।
নয়ন অন্তর, হইলে অন্তর, সতত কাতরে॥
অন্য অন্য ফুলগণ, আমি সকলের প্রাণ, তুষিতে উচিত সবারে।
তুমি মোর প্রাণ, বিরসে মরণ, কি কব তোমারে ॥১॥

৮৯. সরফর্দা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২২

তব অবিশ্বাসে, ঘন ঘন শ্বাসে, দহে সদা মন।
বিষম হইল মোরে, কিসে বুঝাব তোমারে, তুমি মোর প্রাণ॥
নিঃসন্দেহ করিতে হয়,
সন্দেহ তাহে উদয়।
বারে বারে কতবার, জানাব আমি তোমার, তুমি মোর প্রাণ ॥১॥

৯০. সরফর্দা ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ২২-২৩

শুন, শুন, শুনলো প্রাণ! কেন তুমি হও কাতর?
মম প্রাণ আঁখি, যারে দেখে সুখী, তাহাবে বোষ কি হয় আমার?
আসা আশাকরি,
কেবল তোমারি,
বুঝলো বিচারি কারে হেরি।
লয়ে তব মন, মন পুরে মন, করে রস পান, আশা আমার ॥১॥

৯১. সরফর্দা ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ২৩

আইস, আইস হে প্রাণ! বইস! আমি বশ তোমার।
করিয়ে যতন, সঁপিলে যে প্রাণ, তার পর কেন, বোষ তোমার॥
অন্তরে অন্তর, দহে নিরন্তর, নয়নে নীর নাহি মোর।
আশা আশা হাতে, নাহি দেয় যাতে,
আর কোন পথে, আশা তোমার ॥ ১ ॥

২২. এলাইয়া ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ২৩

জলে কমলিনী জ্বলে; কোথা মধুকর।
বিবস অনল জলে, জ্বলে নিরন্তর ॥
বিচ্ছেদের শরজালে ডুবিল আকার।
ভাসিছে নয়নজলে জলে অনিবার ॥ ১ ॥
কার মন্ত্রণা শুনি প্রাণ ভুলিলে অধীনে ?
আমি তব ধ্যানে থাকি, না হের নয়নে ॥ ১ ॥

২৩. এলাইয়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২৩

তুমি যারে চাহ, সে তোমার জান।
ইহাতে অন্যথা কভু ভেবো না লো প্রাণ ॥
না বুঝিয়া খেদ কর, উপায় কিবা ইহার,
সন্দেহ, আপনজনে, কোরো না কখন ॥ ১ ॥

২৪. এলাইয়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২৪

আমি যারে চাহি, সে না রাখে মান।
এমন পিরীতে বল, কিবা প্রয়োজন ॥
অতএব এই হয়, দেখ, কেহ কার নয়,
আপন বলিব তাঁরে, বাঁচায় যে প্রাণ ॥ ১ ॥

২৫. এলাইয়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র.২৪

নিশি পোহাইয়ে প্রাণনাথ প্রভাতে আইলে। (হে)
আমার আশার সুখ কারে বিলাইলে ॥
যেরূপে যামিনী গত,
সে দুঃখ কহিব কত ?
জানিলাম প্রাণনাথ, কি হবে কহিলে ॥ ১ ॥

কামিনী সহিত তুমি,
রতিপতি সহ আমি।
ইহা বুঝি অনুমানি মনে না করিলে ॥ ২ ॥

২৬. যোগিয়া ললিত ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২৪

প্রত্যয় না হয় তারে, যে সঁপিল পরাণ।
প্রাণ লয়ে অবিশ্বাস, এ আর কেমন ॥
দিবানিশি যার ধ্যান, যাব গায় গুণ।
সে ভাবয়ে অবিশ্বাসী, বিচাব এমন ॥ ১ ॥

২৭. যোগিয়া গান্ধার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২৪-২৫

যেখানে থাকহ প্রাণ, ভুল না অধিনী জনে।
অস্থি মোব জব জর, লোকের গঞ্জনে ॥
তোমা বিনা কেহ যদি অন্য নাহি জানে।
ক্ষতি কি তোমার হবে তাহার দেখনে ॥ ১ ॥

২৮. যোগিয়া গান্ধার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২৫

কেমনে রহিবে প্রাণ, না দেখিয়ে তোমারে।
চকোরী কি হয় সুখী, না হেরে শশীরে ?
প্রাণ বিনে শূন্য দেহ থাকে কি প্রকারে ?
শশী বিনে নিশি কোথা বল শোভা করে ॥ ১ ॥

২৯. ভাটিয়ারী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২৫

আমি হে তোমার, প্রাণ, অতি সোহাগিনী।
যখন দেখহ মোরে, পাও কত মনি ॥
যদি থাকহ অন্তর, তোমার বিরহ শর,
বলে মোর কানে কানে—সুখে থাক ধনী (ধনি) ॥১॥

তোমার প্রিয় বচন, শুনিলে সুখী শ্রবণ,
তব আদরে শরীর হরষিত জানি ॥ ২ ॥

১০০. ভাটিয়ারী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২৫

আমার মনোমোহিনী তুমি, আমি জানি।
হরিয়ে লইয়ে মনঃ হ'লে সোহাগিনী ॥
মনের অধিক ধন,
আর কোথা আছে জান,
সে ধন তোমার কাছে আছে বিনোদিনী ॥ ১ ॥
করিলে অতি যতন,
তবে ত থাকে রতন।
অযতনে ধন কোথা থাকে ওলো ধনি ॥ ২ ॥

১০১. মালকোষ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. ব. ২৬

কি হবে ওলো সই বাঁচিব কেমনে ?
বিষম বসন্ত, মদন দুরন্ত, বিবাদী নিতান্ত,
বিরহী জনে ॥
ফণির (ফণীর) স্বভাব হয়,
দংশিলে পরে পলায়।
বসন্তের দূত, ফণী বিপরীত বান্ধিয়া যে চিত,
দংশে সঘনে ॥ ১ ॥
শশধর হরভালে,
নয়ন অনলে জ্বলে।
আপনি জ্বলয়, পরেরে জ্বালায়, তাহাতে কি হয়,
ভালকখনে ॥ ২ ॥

১০২. মালকোষ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২৬

এ দুঃখ আর না যায় সহনে।
এবার জনম, লইব এমন, বধিব জীবন, ঋতু রাজনে॥
বসন্তের সেনাগণ, প্রধান তাহে মদন।
হর আরাধিব, মদনে মথিব, রতিরে রাখিব, বিরহ বনে॥১॥
শশীর উদয় দায়, বিষম হ'ল আমায়।
রাহু যে হইব, বিধু গরাসিব, চকোর দেখিব, বাঁচে কেমনে॥ ২ ॥
অলিকুলের ঝঙ্কারে, সদা অচেতন করে।
কুসুম কানন, করিব ছেদন, অলি দহে যেন মধু বিহনে॥ ৩॥
বিষরবেতে কোকিল, হৃদয়ে হানয়ে শেল।
হইব যে ব্যাধ, করিব যে বধ, তবে মোর সাধ, পূরিবে মনে॥ ৪ ॥

১০৩. মালকোষ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২৬

হিম শিশিরান্তে বসন্তে ব্যাকুল বিরহিণী।
সনে প্রাণকান্ত তথা রতিকান্ত দহে দিবসরজনী॥
রবির সমান সম,
কুসুম কৃশাণু সম, চন্দনেরে ওই গুণে বাখানি।
মলয়া সমীর,
কোকিলের স্বর, হলাহলাধিক শুনি॥ ১ ॥

১০৪. মালকোষ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২৭

পলকে পলকে মান সহিব কেমনে?
সদা প্রফুল্লিত হেরি, বাসনা মনে
মলিন মুখ কমল,
হেরিলে হৃদি কমল,
বুঝে দেখ, বিকসিত হইবে কেনে॥ ১ ॥

১০৫. মালকোষ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ২৭

হাসিতে হাসিতে মান সহনে না যায়।
করিয়ে অমিয় পান, বিষ কোথা খায় ॥
বিধুমুখে মৃদু হাসি,
সদা আমি ভালবাসি।
ইহাতে বিরস হ'লে প্রাণ বাহিরায় ॥ ১ ॥

১০৬. মালকোষ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ২৭

দ্রুত গমনে কি এত প্রয়োজন? একি প্রয়োজন নহে?
অন্তরে অন্তর, কিসে হবে স্থির, রহ রহ রহ, করি দরশন ওহে ॥
প্রাণ যাবার সময়, কে বা কাতর না হয়?
অনায়াসে যায়, নাহি দেখ তায়।
দুঃখ অতিশয়, বরং কখন সহে ॥ ১ ॥

১০৭. মালকোষ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ২৭

প্রেম অন্তর কি হয়? প্রিয়জন প্রতি নয়ন অন্তরে।
নয়নের মত, দেখিতে সতত, বল বল বল, এমত কে পারে কারে?
অন্তরেতে ভাবান্তর,
হলে যে হয় কাতর।
ভাবের ভাবনা, ভাবিয়ে দেখনা, সেথায় যন্ত্রণা,
কে কোথায় দেয় কারে? ॥ ১ ॥

১০৮. মালকোষ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ২৮

মনে করি, ভুলে তোরে থাকিব সুখেতে।
না দেখিলে দহে প্রাণ, মরিহে দুঃখেতে ॥

কি জানি, কেমন আঁখি,
না দেখিলে সদা দুখী
প্রাণ কহে, বল দেখি, করি কি ইহাতে ॥ ১ ॥
নিদয় হইয়ে কেন,
চাতুরী করহে প্রাণ ?
আপন হইলে তারে, হয় কি ত্যজিতে ? ২ ॥

১০৯. মালকোষ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ২৮

নয়ন জালে ঘেরিলে সকল, ও মৃগনয়নি !
মন করী মোর, পলাবার পথ তার, নাহি হেরি বিনোদিনি !
হেতু নিজ প্রয়োজন, যদি করিলে এমন .
সহাস্য বদনে, তোষ অমিয় বচনে, উচিত হয় লো ধনি ॥ ১ ॥

১১০. মালকোষ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ২৮

মদনেরে শান্ত কর, কান্ত সরস বসন্ত ।
করে মলয়া মারুত, মনোজেরে রোষান্বিত, এমন দুরন্ত ॥
কোকিল মন্ত্রিণী তায়, যার খায়, তার গায় তাহারি নিতান্ত ।
ফুলগণ দেয় তাল, অলিকুল কোলাহল, সকলি অশান্ত ॥ ১ ॥

১১১. মালকোষ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ২৮

ঈষৎ হাসিয়ে হরিল আমার প্রাণ বিধুবদনী ।
কিবা শোভা তার, কুন্তলের ভার, নিবিড় নীরদ জিনি ॥
ভূরু শরাসন, তাহে কাম গুণ, পঞ্চবাণ বিমোদিনী ।
আকর্ণ পূরিয়ে, ভুজ বিনে প্রিয়ে সন্ধান করিছে ধনী ॥ ১ ॥
প্রভাতে অরুণ যেন দীপ্তিমান, শ্রবণে কুন্তল গুণি ।
হেরে যে কুন্তল, হৃদয় কমল, প্রফুল্লিত হয় তখনি ॥ ২ ॥

১১২. মালকোষ ॥ তালহরি ॥ গী. র. ২৯

নয়ন মনঃ ডুবিল প্রাণ, নয়নে তোমার।
ত্রিবেণী নয়ন বেগ অতি ঘন, বহে তিন ধার ॥
পলকে পবন বয়, যমুনা প্রবল হয়।
প্রলয়ে যেমন, তরল তেমন, অপার পাথার ॥ ১ ॥

১১৩. মালকোষ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ২৯

এ কি তোমার মানের সময়? সম্মুখে বসন্ত!
দেখ, কুসুম কাননে, বিহরয়ে অলিগণে, হরিষ নিতান্ত ॥
মন্দ মন্দ সমীরণ, বহে অতি ঘনে ঘন, মদন দুরন্ত।
মনেতে বুঝিয়ে দেখ, বাহেতে উদয় দেখ, যামিনীর কান্ত ॥ ১ ॥
অতি সুমধুর রব, করয়ে কোকিল সব, হও হরষিত।
ইথে যদি থাকে মান, ঋতুরাজের অপমান, জানহ নিতান্ত ॥ ২ ॥

১১৪. মালকোষ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ২৯

কণক লতা বিনে, লতা কি লতায় দাঁড়ায়ে হোথা?
দামিনী হইত, যদি না হোতো স্থিরতা ॥
ইথে বোধ হয়,-এই হবে স্বর্ণলতা ॥ ১ ॥

১১৫. মালকোষ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ২৯

মধুর বসন্ত ঋতু! হে কান্ত! যাবে কেমনে?
হেরি ঋতুরাজ, প্রবল মনোজ, বুঝ হে মনে ॥
মলয়া মারুত, বহিছে সদত, কোকিল কাননে।
তার কুহুস্বরে, বিরহিনী শরে জ্বলিত প্রাণে ॥ ১ ॥

১১৬. মালকোষ ॥ একতালা ॥ গী. র. ২৯-৩০

আইলে হে বিরহিণীর প্রাণ।
আনন্দ সাগরে মোর ভাসিছে নয়ন ॥

সুখমুখ নিরখিয়ে, দুখ গেল দুখী হয়ে।
সন্তোষভবনে আশা করিল পয়ান ॥ ১ ॥

১১৭. মালকোষ ॥ একতালা ॥ গী. র. ৩০

বহু দিনান্তে বসন্ত উদয়, নিদয় নাথ।
এমন সুদিন! আমি যে সুদীন! সুখী হলেম যথোচিত ॥
আগমনে ঋতুপতি,
রতিপতি নিশাপতি, বিনে পতি জনেরে জ্বলাইত।
হেরি মম পতি, হলো সুখোৎপতি, (পত্তি),
বহে মলয় মারুত ॥ ১ ॥

১১৮. মালকোষ ভৈরব ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩০

এক ফুলে ভুলে অলি, নহে নানানে।
মনঃ রসরাজ, সতত বিরাজ, সরোজাননে ॥
রতন অধিক যারে, যতন করে তারে,
ত্যজে অন্তরে থাকিতে কি পারে?
মণি বিনে ফণি (ফণী), কভু নাহি শুনি, সুখী কাঞ্চনে ॥ ১ ॥
মীন বেশে জীবনে জীবন, তার জীবন জীবন,
বিহনে তার বাঁচে কি জীবন?
যার যেবা বিধি, দেয় সেই নিধি, তার গণনে ॥ ২ ॥

১১৯. মালকোষ-বসন্ত ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩০-৩১

ঋতুরাজ! নাহি লাজ, একি রাজনীত?
পরিবার যত, হয় এক মত, কামিনীর চিত, দহিতে উচিত?
বল দেখি কোন রাজা,
বধ করে নারী প্রজা?

তবে রাজা জানি, যদি পতি আনি, বাঁচাও কামিনী,

মদনের হাত ॥ ১ ॥

আপনার বিরহেতে,

আপনি জ্বলেছি তাতে।

শুনরে কোকিল, বধ কেন বল, কার (কর) কোলাহল,

যথা প্রাণকান্ত ॥ ২ ॥

১২০. মালকোষ-বসন্ত ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩১

কি চিত্র বিচিত্র কুসুম ঋতুর চরিত্রগুণ।

রতি পতি সেনাপতি, অনঙ্গ যাহার খ্যাতি, জ্বালাতনে করে

জ্বালাতন ॥

দেখ, এমন পবন, জগত জনজীবন,

ঋতুগুণে বিপরীত, হ'য়ে হুতাশন বত,

দহে সদা বিরহিনী জনে ॥ ১ ॥

কোকিল মধুর স্বরে, অন্তর উল্লাস করে।

পথিকজনরমণী, ওই স্বর কর্ণে শুনি, বলে,—

বিষ শর নাশে পরাণ ॥ ২ ॥

১২১. মালকোষ-বাহার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩১

এই ত মধু ঋতু বসন্ত।

ঋতু রাজনের রীত, বহিবারে অদভূত, খেদ যথোচিত ॥

অলি করে মধুপান, মত্ত কোকিলগণ, তরুগণ ঘূর্ণিত।

পথিক পততি তলে, যুবতী মূর্চ্ছা সকলে, বিরহী রোদিত ॥ ১ ॥

১২২. মালকোষ বাহার ॥ তালহরি ॥ গী. র. ৩২

অতিসুখময় দেখ উপনীত ঋতুরাজন।

কুসুম কানন, আর বন উপবন, সকলের হলো সুদিন ॥

ভ্রমর গুঞ্জর করে, কোকিল মধুর গান।
রতিপতি উনমত্ত, মত্ত করে মনঃ, বহিছে মলয় পবন ॥ ১ ॥

১২৩. শোহিনী মালকোষ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩২

কমলিনীর প্রাণ তুমি বুঝি মধুকর।
না হলে হে কেনে, বিনে দরশনে, জ্বালাও অন্তর ॥
মানেতে মনেতে করি, তব মুখ নাহি হেরি।
হেরিলে পুনঃ, উপজে তখন আনন্দ অপার ॥ ১ ॥

১২৪. শোহিনী মালকোষ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩২

ভ্রমরার প্রাণ তুমি শুন কমলিনী (নি)।
যথা তথা ফিরি, তব ধ্যান করি, অন্য নাহি জানি ॥
পিরীতে আমি যেমন, তোমারে ভাবি লো প্রাণ,
তার নিদর্শন, কর দরশন, ভুজঙ্গের মণি ॥ ১ ॥

১২৫. টোড়ী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩২

ধীরে ধীরে যায় দেখ, চায় ফিরে ফিরে।
কেমনে আমারে বল যাইতে ঘরে ॥
যে ছিল অন্তরে মোর বাহ্যে দেখি তারে।
নয়ন অন্তর হলে পুনঃ সে অন্তরে ॥ ১ ॥

১২৬. টোড়ী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৩

যা তুমি চাহ তো তোমার।
মন চঞ্চল হলে তুমি বা কাহার ॥
চিরসুখে থাক যাতে, চলা ভাল সেই পথে।
ইথে চঞ্চল হলে সুখ কি কাহার ॥ ১ ॥

১২৭. টোড়ী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৩

এমন চুরি, চন্দ্রাননি ! শিখিলে কোথায় ?
হানিয়ে নয়ন বাণ, হরিয়ে লইলে প্রাণ, কথায় কথায় ॥
মনেরে বান্ধিল কেশ, তুমি মৃদু মৃদু হাস, ইথে কি উপায় ?
চোরের নাহিক ভয়, সাধুজন ভীত হয়, বিচার হে তায় ॥ ১ ॥

১২৮. দরবারি টোড়ী ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৩৪

কেমনে রহিব ঘরে মন মানে না ।
হেরি মোর দুখানল, লাজ ভয় পলাইল কলঙ্ক বারণ করে না ॥
লোকের কথায় আর, কেমনে হইব স্থির, ঘুচিবে অস্থির যাতনা ।
বিনে তার দরশন, অশেষ মত যতন,
উপায় করিতে পারে না ॥ ১ ॥

১২৯. দরবারি টোড়ী ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৩১-৩৪

মোনের (মনের) বাসনা মোর সই সে কি জানে না ?
জানিয়ে দেখ না মোরে, সঁপিয়াছে দুঃখনীরে,
সহিতে বিরহ যাতনা ॥
মিলনে অসাধ কার, তার ত আছে অপার,
তথাপি সে ত বুঝে না ।
হলে নয়ন অন্তর, অন্তরে সে নিরন্তর, কি জানি !
কে মম মন্ত্রণা ॥ ১ ॥

১৩০. দরবারি টোড়ী ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৩৪

যবে তারে দেখি, অনিমিখ হয় আঁখি, হয় লো তখনি ।
সুখে অচেতন, হয় মোর মন, শুন লো সজনি ॥
তৃষিত চাতকী যেন, নিরখয়ে নবঘন ।
বিনা বারি পানে, কত সুখা মনে, কে জানে না জানি ॥ ১ ॥

১৩১. দরবারি টোড়ী ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৩৪

নয়নে না দেখে কারে, বিনে তারে, যারে প্রাণ সঁপিলাম।
প্রবোধ না মানে, করয়ে রোদনে, এতেক বুঝালাম ॥
মন নয়নের বশ, প্রাণ আছে তার পাশ,
ইহাতে সদয়, যদি সেই হয়, উপায় দেখিলাম ॥ ১ ॥

১৩২. গুর্জরী টোড়ী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৪

তোমায় নয়ন বঙ্কক আমার, ও মৃগনয়নি ।
মৃগের গমন দ্রুত, আমি পলাইব কত, পথ নাহি পাই ধনি ॥
তাহার সহিত হাসি, দেখ আর কেশ ফাঁসা,
শ্রবণেরে তব আখি কহে কি না জানি ।
আমি হইয়াছি ভীত, ভরসা বচনামৃত, বাঁচিবার হেতু জানি ॥ ১ ॥

১৩৩. বাগেশ্বরী টোড়ী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৪-৩৫

বিনাদরে অনাদরে কে কার বশ ?
করিলে আদর, হয় হৃদয় কমল প্রকাশ ॥
রাখিতে একের মন, করে যদি এক মন, হইয়া উল্লাস ।
দুই মন, দুই মন। এক কি হয় কোন ভাষ ? ॥ ১ ॥

১৩৪. গৌরী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৫

যেমন আমারে ভাসালে নয়ন জলেতে ।
তেমতি নয়ন, করি বরিষণ, হইবে প্রাণ ! তোমারে ভাসিতে ॥
কত সুখ আশা করি
তোমার হাতেতে ধরি, প্রাণ দিলাম হাসিতে হাসিতে ।
মোর বশ মন, নহে ত এখন, কাতর নয়ন, কাঁদিতে কাঁদিতে ॥ ১॥

১৩৫. গৌরী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৫

অনেক সাধের তুমি প্রাণনাথ! এই সে কারণ, রক্ষক নয়ন।
করিয়াছি জান, মনের সহিত॥
অন্তর হইতে, প্রাণ, পারিবে না কদাচন।
তুমি মোর মনোমত॥
অমূল্য রতন, পেলে কোন জন, ত্যজয়ে কখন।
নহে ত যে মত॥ (এ মত)॥ ১॥

১৩৬. শোহিণী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৫-৩৬

সখি! দেখ লো আমারে কি হল।
পরেরে পরাণ সঁপে পরাণ যে গেল॥
দিবানিশি সেই রূপ সদা পড়ে মনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে, পাসরি কেমনে॥
প্রাণের অধিক তারে ভাবিতে হইল॥ ১॥

১৩৭. শোহিণী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৬

পিরীতি বিচ্ছেদ দুঃখ কি সে নিবারিব?
ইহাতে উপায় সখী (সখি)বল কি করিব॥
সুখ আশে মন প্রাণ, করে তারে সমর্পণ,
এখন পাশরে (পাসরে) তারে কেমনে রহিব?॥ ১॥

১৩৮. শোহিণী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৬

বিধু মুখে মৃদু হাসি ভালবাসি প্রাণ।
বিষাদে প্রমাদ হয় কাতর নয়ন॥
অধিনী জনেরে কেন কর এত অভিমান,
তুষিতে উচিত তারে এই ত বিধান॥ ১॥

১৩৯. শোহিণী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬

তোমার পিরীতে এই হইল।
অবলা সুখের আশে দুঃখেতে ডুবিল ॥
নহি সুখ অভিলাষী, পিরীতে তোমার।
কর, যাহাতে এ দুঃখ যায় হে আমার ॥
ইহাতে সদয় হয়ে হও অনুকূল ॥ ১ ॥

১৪০. শোহিণী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৬

চঞ্চল কেন, চঞ্চল নয়নি, আসিতেছে তব মনোহরণ।
এখন যামিনী আছে মুক্তা কিরণ ॥
আসিবে আশয়ে মন,
উল্লাসিত রাখ, শুন,
সময় থাকিতে দুখ ভাব অকারণ ॥ ১ ॥

১৪১. শোহিণী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৩

শশীমুখী মৃগ আখি হানি চলিল।
প্রাণ মোর যায়, করে হায় হায়, যদি কেহ হও আপন সকল ॥
প্রাণের আকার কেহ দেখেছ?
কেবল মোর প্রাণের, এরূপ বিধি নিরমিল ॥
সন্দেহ ইহাতে, যদি হয় চিতে, আমার আখিতে দেখিতে হইল ॥১॥

১৪২. শোহিনী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৭

মান অপমান কিছু কর না মনে।
সকলি সহিতে হয় সময়ের গুণে ॥
পিরীতি এমন ধন, করিতে হয় যতন।
• ধৈরজ ধরিতে হয় উচিত এখানে ॥ ১ ॥

১৪৩. শোহিণী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৬

কি দোষ তার, আপনার দোষ।
কেন বা সঁপিলেম প্রাণ, কেন করি রোষ ॥
সদা বারি পূর্ণ মোর নয়ন কলস।
অন্তরে বিরহানল, হয় মুখ শোষ ॥ ১ ॥

১৪৪. শোহিণী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৭

শশীমুখী হাসি হাসি বলিছে মোরে।
শুন প্রাণনাথ, ধন, প্রাণ, চিত, আমার হে যত,
সঁপেছি তোমারে ॥
ইহাতে অন্যথা কেহ ভেব না অন্তরে।
দেওনে বিস্ময় কিবা, বুঝ না বিচারে।
যাচকের মান, রাখিতে রাজন, ক্ষতি কি কখন, মনেতে করে ? ॥১॥

১৪৫. শোহিণী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৮

কি হল আমারে সই, বল কি করি।
নয়ন লাগিল যাহে কেমনে পাসরি ?
হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরি ॥ ১ ॥
তৃষিত চাতকী যেন থাকে আশা করি।
ঘনমুখ হেরি সুখী, দুখী বিনে বারি ॥ ২ ॥

১৪৬. শোহিণী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৮

মন চঞ্চল হলে সাধিলে কি হবে ?
দিনে ছায়াবাজী কেন দেখিতে পাইবে ?
মন আপনার,
তারে বশ কর
মন বশ না হইলে, বশ কে হইবে ? ॥ ১ ॥

১৪৭. শোহিণী কানাড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৮

পিরীতের রীত যে, থাকিলে অন্তরে, দোঁহে দোঁহার অন্তরে।
চক্রবাক চক্রবাকী, তার সাক্ষী দেখ সখি, বুঝাব কি তোমারে॥
বিচ্ছেদ দুঃখেতে দুখী হয় দুই জন,
কেহ সুখী, কেহ দুখী, না হয় কখন।
মিলনে দেখ অধিক, হৃদয়ে দোঁহে পুলক, ভাসে সুখ সাগরে ॥ ১ ॥

১৪৮. ছায়ানট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৮-৩৯

সতত বাসনা যারে হৃদিয় হেরিতে,
যাহার বদন, বিরস কখন, না পারি দেখিতে ॥
জীবন বিহীন মীন, কোথা হুতাশনে,
শীতল হইতে কেহ দেখছ কখনে ?
সুধাহারী জন, কভু বিষপান, পারে কি করিতে ? ॥ ১ ॥

১৪৯. শ্যাম পূরবী ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৩৯

ঐখানে রহিও হে নিদয় প্রাণনাথ। এত শঠতা কেন ?
লাজ গেল ভয় গেল, কুল গেল, শীল গেল,
এখন কি ভয় বল, ত্যাজিতে এ জীবন ?
তুমি এমন রতন, দুঃখিনীর হবে কেন ?
না বুঝে করে যতন, ফল পেলেম তেমন,
কি মনে করি এখন, করেছ আগমন ? ॥ ১ ॥

১৫০. শ্যাম পূরবী ॥ তালহরি ॥ গী. র. ৩৯

কমলবদনি লো ! চঞ্চল মৃগবৎ এত অধৈর্য্য কেন ?
এই বোধ হয় মোর, হতেছ যে অস্থির,
সাদৃশ্যের গুণ বুঝি, তব মৃগ নয়ন ?

রাত্রি দিন যারে ভাব,
সে জন নিতান্ত তব,
বৃথায় সন্দেহ করি, কাতর হও সুন্দরি,
তোমার এরূপ হেরি, দুখিত মম মন ॥ ১ ॥

১৫১. বাগেশ্বরী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৩৯-৪০

তারে আর সাধিব না সই, সাধিলে আদর বাড়ে।
বটে অনাদরের নয়।
অধিক আদর পেলে কে ছাড়ে ?
এতেক যতন করি,
মতে চলিতে পারি
অতি নিম্ন হলে পর, অতি দুখ দিবে, মনেতে পড়ে ॥ ১ ॥

১৫২. বাগেশ্বরী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪০

তুমি বুঝি জান না হে প্রাণ, বেঁধেছি প্রেমের ডোরে।
কেমনে ছাড়াবে তুমি, আশা আশা ধরে আপন জোরে
হৃদয় মন্দিরে রাখি, রক্ষক করেছি আঁখি।
সেখানে প্রবেশ কার, তোমা বিনা আর, রাখিব কারে ॥ ১ ।

১৫৩. বাগেশ্বরী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪০

আইলে হে বিরহিনীর প্রাণ প্রিয়, এতদিন পরে !
কি সুদিন ! সুদীনের সুদিন ! শূন্য দেহে প্রাণ,
অসিবে ছিল কি মনেরে ?
প্রথম মিলন, অমিয় পান, করিয়ে জীবন করেছি ধারণ।
বিচ্ছেদের ছেদ মোর, অন্তর ছিল জ্বর জ্বর,
ঘুচিল পাইয়ে তোমারে ॥ ১ ॥

১৫৪. বাগেশ্বরী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪০

এতদিন পরে নিবিল আমার মনের অনল সখী (সখি)
দেখ, যতদিন ছিল তুই জ্ঞান সতত ঝুরিত আঁখি ॥
ভাবিয়ে তাহার রূপ,
আমি হলেম সেই রূপ।
কুমিরকে আরশুল ভেবে এই হলো, সে ভয়ে, এ সুখে দেখি ॥১॥

১৫৫. বাগেশ্বরী আড়ানা ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৪০-৪১

আরে তোরে জানি নির্মোহি।
এই সে কারণ রাত্রি দিন আমি দহি ॥
জ্বলিতে জ্বলিতে শেষ, তবু কার নহি।
শীতল করিতে তোমা বিনে আর নাহি ॥ ১ ॥

১৫৬. বাগেশ্বরী আড়ানা ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৪১

হাসি ভালবাসি সুধামুখি।
বিরস বদন হেরি সদা ঝুরে আঁখি ॥
সতত বাসনা মোর হৃদয়েতে রাখি।
তুমি নাহি দেখ, আর কারে নাহি দেখি ॥ ১ ॥

১৫৭. বাগেশ্বরী কানাড়া ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৪১

রাত্রিদিন একত্র প্রকাশ, দেখ রাত্রিদিন।
কেশেরে বুঝহ নিশি, বদন অরুণ ॥
তপন মুখ বলিতে, সন্দেহ নাহিক ইথে,
হেরি হে হৃদি কমল, প্রকাশে তখন ॥ ১ ॥
কামিনীর মন সুখ, নিশিতে হয় অধিক।
কেশেরে তার অধিক, করয়ে যতন ॥ ২ ॥

১৫৮. বাগেশ্বরী কানাড়া ॥ তাল হরি ॥ গী .র. ৪১-৪২

স আদরাদর যা আদর অধর কম্পে কহিতে।
দরশনে পরশনে, অমিয় বচনে, শরীর শ্রবণ সুখী, আঁখি সহিতে॥
যখন দেখে আমারে, নিধি পাই মনে করে, ভাসে আনন্দেতে।
রাখিয়ে কমল কর, কমল উপর, মুখে সুধাদান করে সুখেতে॥১॥

১৫৯. বাগেশ্বরী কানাড়া ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৪২

এই মনেতে ছিল হে প্রাণ আমার হবে।
জানিনে কখন নয়ন নীরে মোরে ভাসাবে ॥ ১ ॥

১৬০. বাগেশ্বরী কানাড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪২

রতন পাইয়ে কেবা যতন না করে?
হেরিতে যাহারে হরিষ অন্তরে, মনের তিমির হরে ॥
তিলেক অদর্শন হলে কাতর প্রাণ,
ভুজঙ্গ যেমন, মণির কারণ, আমিও তাহার তরে ॥ ১ ॥

১৬১. বাগেশ্বরী মূলতানী ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৪২

আইল বসন্ত হে নাথ! কি সুখ দেখ না।
পূরাইতে মনজের (মনোজের) মনের বাসনা ॥
বিকস কুসুম বন, মধুকর মধুপান,
ভ্রমরী সহিত সুখে করিছে যাপনা ॥ ১ ॥
কোকিলের কুহুধ্বনি, হৃদয় পুলক শুনি,
বিরহী এ রবে বড় পেতেছে যাতনা ॥ ২ ॥

১৬২. বাগেশ্বরী বাহার ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৪৩

আসিতে এখানে কে বারণ করিলে?
অবলা বধের ভয় সে নাহি ভাবিলে?

ষট্‌পদ মধুকর, নিরন্তর অন্যান্তর,
দ্বিপদ কি ষট্‌পদ স্বভাব পাইলে? ॥ ১ ॥

১৬৩. বাগেশ্বরী বাহার ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৪৩

নিশি না পোহাইতে কি চঞ্চল হইলে।
আমার কি নাহি লাজ লোকেতে দেখিলে?
শশীর কিরণ দেখি, চকোর কুমুদ সুখী।
অরুণ উদয় ভাব ইথে কি ভাবিলে? ॥ ১ ॥

১৬৪. হিন্দোল ॥ তাল ধামার ॥ গী. র. ৪৩

বসন্ত ঋতু আইল, হইল সুখ প্রবল, সব প্রফুল্ল ফুল কানন।
মন্দ মন্দ মলয় পবন বহে তায়।
পিকু করে কুহু, মধুকব আনন্দিত,
সদা গুঞ্জবে, হরিষান্বিত আনন ॥
কি কব সময়রঙ্গ, অনঙ্গ বিশেষে সাঙ্গ, সবাসনে কারছে সন্ধান।
বিবহিনী কাতব এমন হেবি,
যেমন শশী দেখি রাহু অতিশয় উল্লাসিত,
যত সংযোগী সহাস্য বদন ॥ ১ ॥

১৬৫. হিন্দোল ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৪৩

মিছে অনুযোগ সই লো করিছ কি কারণে।
কি করিতে পারে মন, মত্ত বারণে বারণে ॥
আমার বশ এখন,
নহে সে দুরন্ত মন,
বুঝালে যে নাহি বুঝে, তারে পারিবে কেমনে ॥ ১ ॥

মিলেছে সুখে থাকুক,
না শুনে, সেথা মরুক,
দুখবোধ হলে কেহ, কোথা থাকয়ে কখন ॥ ১

১৬৬. হিন্দোল বেহাগ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৪৪

সুরস রুচির কুসুমে কণ্টক কে করিল ?
জগ আরাধিত মণি কেন ফণীরে সঁপিল ?
যেরূপ খেদ ইহাতে, কিরূপে পারি বুঝিতে ?
পুর আলো করে শশী, তাহে কলঙ্ক বচিল ॥ ১ ॥
অতএব এই মনে, মিলিব তাহার সনে,
দুঃখ নাহি সুখ যথা, সেথা বহিতে হইল ॥ ২ ॥

১৬৭. ললিত ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৪

পিরীতি পরম সুখ সেই সে জানে।
বিরহে না বহে নীর যাহার নয়নে ॥
থাকিতে বাসনা যার, চন্দন বনে।
ভুজঙ্গের ভয় সেহ করে কি কখনে ॥ ১ ॥

১৬৮. ললিত ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৪-৪৫

যতন করিহে যাহারে থাকে সে অন্তরে।
যাহারে না চাহি আমি, ত্যজে না আমারে ॥
বিচ্ছেদেরে সতত করি হে অনাদর,
মিলনের প্রাণ ভাবি চাতুরী সে করে ॥ ১ ॥

১৬৯. ললিত ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৫

আর কারে ভয় আমার, প্রাণ, ভয় হে তোমারে।
লোক লাজ ভয়, সে ভয় কি হয়, বুঝেছি বিচারে ॥

তব দুঃখে আমি দুঃখী,
তব সুখে হই সুখী।
তব মতে মত জেনো প্রাণনাথ অধিনী জনেরে ॥ ১ ॥

১৭০. ললিত ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৫

নয়ন সজল, হৃদয়ে উদয় অনল।
যেবা করে প্রাণ, যান (জান) সেই জন, কে করে শীতল ॥
কহিতে দুঃখ সাগর অধিক প্রবল।
হইলে নীরব, কেমনে বাঁচিব, বিষম হইল ॥ ১ ॥

১৭১. ললিত ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৫

যাও সখি! বলো দেখি, এ কি মত তোমার?
বিচ্ছেদ তপন, করিছে দাহন, ইথে প্রাণলাভ, হবে কি আমার?
হরিয়ে লইয়ে মনঃ, করিছ ভাল যতন,
মনের সুখেতে, নয়ন হিংসাতে, লেগেছে কান্দিতে,
এই কি বিচার ॥ ১ ॥

১৭২. ললিত ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৬

আজু একি বাম আঁখি, সখী (সখি), নাচিছে আমার।
হতেছে যেমন, তার আগমন, হইবে এমন, করিলো (লো) বিচার ॥
হৃদয় কমল সুখী, বিরহ নিবহ দোখ।
বিধি অনুকূল, আমারে হইল, এমতি বুঝিল, মত কি তোমার ॥১॥

১৭৩. ললিত ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৬

এমন সময় সই আইল না কেন?
বুঝি করিয়াছে রোষ, বুঝায় এমন ॥

দেখিতে এত যতন, দেখিলে পাই রতন।
দেখা নাহি দেয় কেন করে জ্বালাতন ॥ ১ ॥

১৭৪. ললিত ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৬

কি কহিব জামিনী (যামিনী) পোহায়।
এখন না আইল, রহিল কোথায় ॥
তাহারে ভাবিয়ে নিশি, জাগিয়াছিলাম বসি,
নিশির যে সুখ তাহা দিবসে কি পায় ?
শরীর আপন নহে, অন্যেবে আপন কহে, এ ত বড় দায় ॥
সে কেন বুঝিবে দুখ, তবু তার তরে দুখ,
করিয়ে এখন দেখ, প্রাণ বাহিরায় ॥ ১ ॥

১৭৫. ললিত ভৈরব ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৬

সুধাংশু অধিক প্রাণ, সুন্দর তব বদন কমল ধনি।
জন্ম পূর্ণ শশধর,
এখন হ্রাস তাহার, তোমারে সুন্দর জানি ॥
এবে ক্রম পূর্ণ হয়,
তব মুখ সম নয়।
লাজ পেয়ে হয় হ্রাস,
দেহেরে কর যে নাশ, মনে অভিমান গুণি ॥ ১ ॥
বড়র নিকটে ছোট,
গেলে হয় মাথা হেঁট,
এক পদ আগু করে,
এক পদ পিছে ধরে, বুঝিবে রীত এমনি ॥ ২ ॥

১৭৬. ললিত ভৈরব ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৭

তরুণ অরুণোদয় এখন আইলে শশী।
চকোরিনা এ যামিনা, আছয়ে উপসী ॥
অমিয় কোথায় তব, কোথা গেল নিশি ? ॥ ১ ॥

বিধু কি বিতরে সুধা, দিবসে প্রকাশি ?
তবে কেন দেহ দুখ অসময়ে আসি ॥ ২ ॥

১৭৭. ললিত ভৈরব ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র.৪৭

জলে কি শীতল হয় কখন বিরহানল।
নয়নের নীরে যদি নাহিক নিবিল,
মকর পুরেতে গেলে কি হইবে বল ॥ ১ ॥
কাননে প্রবেশি যদি হয় দাবানল।
মিলন সলিল বিনে, না হয় শীতল ॥ ২ ॥

১৭৮. ললিত ভৈরব ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৭

এখানে কি কাজ তোমার, যাও হে প্রাণ,
প্রাণ সঁপিলে যথা ॥
ভস্ম আচ্ছাদিত অনল, করিবারে উজ্জ্বল,
বুঝি এসেছ হেথা ॥ ১ ॥

১৭৯. রামকেলী ললিত ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৭

আর কারো নহি প্রাণ, তোরি রে,
তিলেক না হেরি যদি, বোধ হয় মরিরে ॥
বিরূপ আমারে তুমি, ভেবো না কখন।
স্বরূপে এই জানিবে, তব বশ মন ॥
আর কিসে হবে সুখী, বল না তা করি রে ॥ ১ ॥

১৮০. রামকেলী ললিত ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৮

রাগে অনুরাগ নাহি রহে রে।
বিরাগ সুখের লাগি, কার প্রাণ দহে রে ॥

মান উপজিলে মনে, মরণের ভয়,
না থাকয়ে অনুচিত, করিবারে হয় ॥
যে হয় আপন জন, সেই সে তা সহেরে ॥ ১

১৮১. পূরবী ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ৪৮

চল সখি যাই যমুনাতীরে, ঘনবরণ ঘন উদয় মনেতে।
না দেখিয়ে নয়ন, করিছে রোদন, কি করে এখন,
লোক লাজেতে ॥
অজ্ঞান কলঙ্ক যার, দেখিলে কি থাকে তার,
লোক কলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে, মন যে সঁপিলে,
সেই রূপেতে ॥ ১ ॥

১৮২. পূরবী ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ৪৮

ঘন ঘন ঘন বরণ ধ্যানে, মম মনের তমো, রহিল দূরেতে।
আর অন্যরূপে, মজিব কি রূপে, মজেছি স্বরূপে,
সেই রূপেতে ॥
দেখিতে বরণ কাল, অন্তর করয়ে আলো।
ঘুচাইয়ে ভ্রমে, কেহ ক্রমে ক্রমে, মজে তার প্রেমে,
পারে বুঝিতে ॥ ১ ॥

১৮৩. পূরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৮

দিবা অবসানে আসি রসরাজ বিরস কেনে ?
আছে যতক্ষণ, হরিষ বদন, দেখিতে বাসনা মনে ॥
সময়ে না এলে প্রাণ,
অসময়ে আগমন।
তোমার কি দোষ, অনেকের বশ, সহিল আমার প্রাণে ॥১॥

১৮৪. পূরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৮-৪৯

কি সুখ পিরীতে, শুন প্রাণ সই, না হলে মিলন।
সে জন আমারে, না হেরে যাহারে, সদত করি যতন ॥
তৃষিত চাতকী যেন, আশায়ে প্রাণ ধারণ,
তেমতি তাহারে, ভাবি হে অন্তরে,
তথাপি না রাখে মান ॥ ১ ॥

১৮৫. পূরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৯

কমলিনা অধিনা তোমার, শুন অলিরাজ।
সদত তোমারে, ভাবি হে অন্তরে, এই মোর কাজ।
সদয় থাক হে নাথ, এই হয় মম মত।
নিদয় কখন, হইও না হে প্রাণ, সুখেতে বিরাজ ॥ ১ ॥

১৮৬. পূরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৯

পিরীতি তোমার সনে রহিল মনে।
কখন না পাসরিব জীবন মরণে ॥
কি জানি কি গুণে প্রাণ,
রাখিয়াছ মোর মন
থাকিবে সে চিরদিন, রাখিব যতনে ॥ ১ ॥

১৮৭. পূরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৪৯

সেই সোহাগিনী লো, যারে প্রিয় সতত চাহে।
দুঃখিত কখন, নহে সেই জন, না বিরহে দহে ॥
মদন দাহন তারে, করিতে নাহিক পারে।
সুখের সাগরে, সদা বিহরে, না যাতনা সহে ॥ ১ ॥

১৮৮. পূরবী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫০

যতনে সে ধন সদা করে উপার্জ্জন
কে কোথা তুঃখেতে ত্যজে, না দেখি কখন ॥
অনেক যতনে ফণি (ফণী) মণিরে পাইয়ে,
শিরেতে ধারণ করি, মনে নিরখিয়ে,
বিহনে এমন ধন বাঁচে কি জীবন ॥ ১ ॥

১৮৯. পূরবী ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ৫০

আসিবে,—এ রবে প্রাণ কি রবে ? (সই)
বাসনা আমার নিকটে তাহার প্রাণ যায় এবে ॥
প্রাণ যায়, নাহি রয়,
প্রাণাধিক করে তায় ।
এমন হইবে সে জন আসিবে, দেখা কি হবে ?

১৯০. দেওগিরি ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫০

অনেকের প্রাণ তুমি রে ! এখন আমারে মনে কেন করিবে (হে)
প্রথমে না জানি অনেকের প্রাণ, আমার প্রাণ, মরি হে,
দেখ না এবে ॥
তোমার আছে অনেক, আমার তুমি হে এক ।
ইহাতে উচিত যে হয় করিবে ।
কি কব আর ! বাসনা, সদয় রবে ॥ ১ ॥

১৯১. দেওগিরি ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫০

আমি কি করিব,
শুন সই, আমার মন বারণ না শুনে বারণ
এত যে জ্বলয় তবু,
না বুঝে বুঝালে নীত, বিপরীত করে জ্ঞান ॥ ১ ॥

১৯২. দেওগিরি ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫১

কিসের কারণে বিধুমুখি, করিয়াছ তুমি অরুণ আঁখি ?
তোমার বিরসে, আর কোন রসে, হৃদিপদ্ম হবে বল সুখী ?
তোমার চন্দ্রবদন, আমার চকোর মন,
ইহাতে অরুণ বরুণ নয়ন, করি কর কেন এত দুঃখি (দুঃখী) ॥১॥

১৯৩. দেওগিরী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫১

দেখ, পিরীতের সই দুই গুণ।
দিবাকর নিশাকর, দুইয়ের গুণ যেমন ॥
প্রচণ্ড তপনবত, বিরহে করে দাহন,
মিলন শশী স্বরূপ সুধাকরে বরিষণ ॥ ১ ॥

১৯৪. দেওগিরি ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫১

আপন রুচি, রুচির চির তার।
রবি কমলিনী, শশি (শশী) কুমুদিনী, বিদিত দেখ সংসার ॥
সলিল নিবাসি (সী) মীন, নাহি চাহে ধরাধর।
পতঙ্গ অনলে শীত, জ্ঞানে সঁপে কলেবর ॥ ১ ॥

১৯৫. দেওগিরি ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫১

বিরসবদন, শুন প্রাণ, করো না কখন কমলমুখী।
প্রফুল্ল বদন, হেরি ল (লো) যখন, হরষিত হয় মন আখি ॥
মনোমত্ত করীবর, বুঝে দেখ ভাব তার।
এবে মধুকর, বদন তোমার, অরবিন্দ সম রূপ দেখি ॥ ১ ॥

১৯৬. দেও গান্ধার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫১-৫২

না বুঝিয়ে প্রাণ কেন কর এত অভিমান ?
তোমার অধিক কারে করি হে যতন ॥

ভুলিয়ে জ্বলে আপনি, শীতল নহে সে জানি।
ঘুচাইয়ে ভ্রম দেখ, মনের সমান প্রাণ ॥ ১ ॥

১৯৭. দেও গান্ধার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫২

আমি হে তোমার প্রাণ বুঝেছি মনের মত।
নহে কি সকলাধিক, যতন কর কি এত?
না দেখিলে জ্বালাতন,
দেখিলে হরিষানন,
যেরূপ যতন কর, কথায় কহিব কত? ॥ ১ ॥
মন দিয়ে পেলে মন
হলো ইথে লাভ জ্ঞান।
এমন সুজন সনে থাকিতে সাধ সতত ॥ ২ ॥

১৯৮. দেও গান্ধার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫২

এ রসে বিবস কেন, সরস বসন্তে?
মানশর, কুসুম্বর, ভেদ কি কৃতান্তে?
মলয়া সমীর, বহে ধীর ধীর, জ্বলায় জ্বলন্তে।
ফুলবাস করায় রোষ মদন তুরন্তে ॥ ১ ॥
থাকিলে অন্তর, জ্বলিত অন্তর, কে বা কারে শান্তে
যামিনীর কামিনীর সুখ পায় কান্তে।

১৯৯. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫২-৫৩

অধরে মধুর হাসি, বচনে সুধা বরিষে।
নিন্দি ইন্দিবর, নয়নে কি শোভা,
মুখ সরোজ সদৃশ, দ্বিজরাজ আভা,
নাসা তিলফুল জিনি, বুঝহ বিশেষে ॥
অতিশয় নিবিড়, নীরদ নিন্দিত কেশ,
হেরিয়ে চাতক, উল্লাসিত মন,

শিখী নৃত্য করে, করি সখা অনুমান,
শ্রবণে কুণ্ডল, দামিনী প্রকাশে ॥ ১ ॥

২০০. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৩

তারে কেন সাধিব, শুনরে সজনি।
আপনার দোষ, নাহি করে মনে, বুঝাইলে নাহি বুঝে,
কথা নাহি শুনি, জ্বলায় এমন করি, দিবসরজনী ॥
এত করি না হলো আপন মনের মত,
অনেক সাধনা, করিয়াছি জান, তথাচ তাহার আমি,
না পেলেম মনঃ, সাধনার বশ নহে, এই অনুমানি ॥ ১ ॥

২০১. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৩

মানেতে মন কে মিছে দাহন করিছ প্রাণ।
না দেখে কমলমুখী, অলির কমল আঁখি,
কমল জীবন মন তাহা তো শুনেছ প্রাণ ॥
যাহার যে যা স্বভাব, তাব কি হয় অভাব ?
বৃথায় ভাবিছ।
অন্য অন্য ফুলগণ, বলয়ে আমি রাজন।
সে অলি কমলাধীন, তুমি তো জেনেছ প্রাণ ॥ ১ ॥

২০২. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৩-৫৩

ভ্রমরারে! কি মনে করি আইলে প্রাণ নলিনী ভবনে।
একি অপরূপ, সবোজে সদয়, নিদয় কেতকী কাননে।
ত্যজিয়ে এমন সুখ, দুখে আগমন, বুঝিতে না পারি নাথ,
কহ কি কারণ ॥
অধিনীজনে কি পড়িয়াছে মনে, কি ভ্রমে আইলে এখানে ॥ ১ ॥

দেখহ তপন সখা জগতে বিদিত, হেরি হই বিকসিত,
থাকিলে মুদিত।
তাহার কিরণ, শেষে দহে প্রাণ, না হয় শীতল জীবনে ॥ ২ ॥

২০৩. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৪

অনেক দিবস পর মিলন হইল।
বিরহ বিষ অনল, ছিল অধিক প্রবল, তাহা যে শীতল হবে
মনেতে না ছিল ॥
মিলন আশয়ে প্রাণ, ছিল যেঞি, তেঁই প্রাণ, তোমারে পাইল ॥
কত সুখ হল লাভ, কথায় কত কহিব, আনন্দ সাগরে মনঃ,
নয়ন সজল ॥ ১ ॥

২০৪. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৪

অধিনীজনে প্রাণনাথ! নিদয় হয়্যা (হয়ে) ছিলে হে কেমনে?
ও বিধুবদন, না হেরিয়ে প্রাণ, জ্বলিত জীবন সঘনে ॥
শয়নে স্বপনে প্রাণ, কখন কি চিতে?
অধিনী বলিয়া মনে নাহি কি করিতে?
একাকিনী নারী, থাকে কেমন করি, নিবারি দুরন্ত মদনে ॥ ১ ॥
এতদিন পর মোরে পড়েছে মনে!
তেঞি প্রাণনাথ বুঝি এসেছ এখানে?
ছিল হে জীবন, শুভ দরশন, হইল নাথ তব সনে ॥ ২ ॥

২০৫. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৪-৫৫

সখি! কোথারে পাব তারে, যারে প্রাণ সঁপিলেম।
যাহার কারণে আমি কলঙ্কী হইলেম ॥
পরাণ কেমন করে, রহিতে না পারি ঘরে।
সুখ আশে দুঃখ নীরে এবে যে ডুবিলেম ॥ ১ ॥

আগেতে না জানি এত, এমন করিবে নাথ,
জানিলে কি করি প্রীত, না জেনে করিলেম ॥ ২ ॥

২০৬. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৫

সে জানে না আমার মনঃ, যেমন তার তরে,
জানিয়ে বুঝ না কেন, বিচ্ছেদের হুতাশন, দাহন করিবে মোরে ॥
তারে জেনে এই হোলো, নয়ন সদা সজল, কহিব কারে ?
যারে কব সেই জন, সুখদুঃখের কারণ,
সে বিনে সুখী কে করে ? ॥ ১ ॥

২০৭. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৫

ওষ্ঠাগত প্রাণনাথ, না দেখে তোমারে।
স্বস্থানে যাবে, কি বাহির হইবে, বল না আমারে ॥
অধীনে সদয়, হলে ক্ষতি হয়, বুঝেছ অন্তরে।
ইহাতে কেমনে প্রবোধিয়ে মনে, থাকি কি প্রকারে ॥ ১ ॥
অনুকূলে বিধি, যদি প্রাণনিধি, দিলে হে আমারে।
করিতে যতন, সংশয় জীবন, বলিব কাহারে ॥ ২ ॥

২০৮. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৫

পিরীতি কখন পারে কি প্রাণ করিতে গোপন ?
মুদিত কমল, দেখিলে কেবল, যখন উদয় অরুণ ॥
তিমির আলয় দীপ, দেখায়, দেখ কি রূপ,
তিমির কখন, উজ্জ্বলে বারণ, করয়ে কে জান, বল না এখন ॥১॥

২০৯. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৬

তারে বারণ কর সই, আসিতে এখানে এমন সময়।
যদি কোন জন, কহে কুবচন, জ্বলিবে জ্বলিব তায় ॥

উভয়ের ভয় যায়, সে সময় আসিতে হয়,
আমার এমত, হউক সম্মত, ভয়েরো কি থাকে ভয় ? ॥ ১ ॥

২১০. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৬

কহিও সই ! এই বিবরণ মোর প্রাণনাথে ।
নয়নের বশ আমি, করি কি ইহাতে ॥
নয়নের বশ তুমি নহ কদাচিতে ।
বশ হলে তবে কেন হইবে কান্দিতে ॥ ১ ॥
ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়, তোমারে দেখিতে ।
গেলে কি হইবে ভাল, হয় কি মতেতে ॥ ২ ॥

২১১. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৬

ভ্রমরারে ! কেন মিছে লাজ করিলে কি হবে ?
কখন না হয় মনে স্বভাব ত্যজিবে ॥
অনেকের প্রাণ তুমি, দুঃখ কি বুঝিবে ।
হইলে আমার মত জানিতে হে তবে ॥ ১ ॥

২১২. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৬

আমার মনের দুঃখ আমি কারে কহিব ?
ইহার উপায় কি ? বিষ খাইব ?
কি, মকরপুরে গিয়ে শীতল হইব ? ॥ ১ ॥

২১৩. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৬

নয়ন প্রবোধ মানে কি প্রাণ, না দেখে তোমারে ?
একে ত নয়ন, তাহাতে শ্রবণ, অমিয় বচন চাহে শুনিবারে ॥
রসের রসনা আশ, পরশ চাহে পরশ ।
নাসিকা সুবাস, সদা অভিলাষ,
বলিলেম বিশেষ, বুঝ না বিচারে ॥ ১ ॥

২১৪. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৭

অনর্থ চিন্তার্ণবে ডুবিলে।
পরের আপন ভাবি, পরাণ সঁপিলে ॥
নিত্য নিত্য করি মনে, মিলিব তাহার সনে,
নিকটের দূর বোধ, কাহারে করিলে ॥ ১ ॥

২১৫. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৭

চঞ্চল চিত্ত কেন লো তোমার চিত্রাণি !
মৃগ অন্বেষণ, করিবারে মন, বুঝিলো মৃগনয়নি ॥
ইহা বিনে প্রাণসখি, আর কিছু নাহি দেখি।
না দেখে সে রূপ, থাক লো যে রূপ দেখে ভয় হয় ধনী (ধনি)
॥ ১ ॥

২১৬. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৭

খঞ্জন নেত্র হেরি লো তোমার বদন কমলে।
আমি সুখী অতি, হলেম ভূপতি, বলিবে লোকে শুনিলে ॥
রাজার মত সম্মান, করিতে হবে এখন,
হয় বিধিমত, করিতে এমত, কব যা হয় বুঝিলে ॥ ১ ॥

২১৭. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৭-৫৮

নিত্য নিত্য করি মনে, বলি খেদের কারণে,
তারে আর সাধিব না।
প্রভাত হইলে পুনঃ, কেমন করয়ে প্রাণ,
আর সে ভাব থাকে না ॥
হইয়ে আপন মন, হইল তার অধীন, কি করি বল না।
ইহাতে উপায় আর, থাকিলে দেখ আমার,
না হতো এত যাতনা ॥ ১ ।

২১৮. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৮

পিরীতি করি প্রাণ এই লাভ হলো আমার।
দেখাইয়ে সুখমুখ দিলে দুখভার।
অবলা সরলা আগে, না করি বিচার।
মজিল দেখ বিনয় ছলেতে তোমার ॥ ১ ॥

২১৯. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৮

এই কি মনে প্রাণ করিয়াছিলে, জ্বলাবে বিরহানলে ?
সাধের পিরীতি, তোমার সহিত, করিয়ে ভাসি নয়ন সলিলে ॥
নয়ন নিকটে রাখি, সাধ দিবানিশি দেখি,
নয়ন অন্তর, থাকি নিরন্তর, তোমার মতে বিচার করিলে ॥ ১ ॥

২২০. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৮

আইলে হে অধিনীজন সদনে।
তোমার বিরহে প্রাণ, আছে কিনা আছে প্রাণ,
এই বুঝি দেখিবারে হয়েছে মনে ?
মনের মানস বিধি, পূরাইবে পাব নিধি, হলে এতদিনে।
ভাগ্যগুণে যদি পুনঃ, হইল সুখমিলন,
বিচ্ছেদ হয় না যেন, সাধ এক্ষণে ॥ ১ ॥

২২১. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৮-৫৯

বিরহ যাতনা, শুন রে সজনি, সহে না। (আর)
মন অতি চঞ্চল, নয়ন সজল, তথাপি অনল, নিবে না ॥
হইবে কবে মিলন, হেরিব বিধুবদন, ঘুচিবে যন্ত্রণা।
উদয় হইবে সুখ, রবে না অসুখ, এ কি হবে, পূরিবে বাসনা ॥১॥

২২২. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৯

আমি কি তোমার কেনা, কেনা ?
এই জনরব, ঘরে ঘরে সব, করিছে কে না ?
এ রবে নীরব আমি, মনে বুঝে দেখ তুমি ।
তুমি যদি জান কেনা, আমার নাহি ভাবনা, বলিছে কি না ? ॥১॥

২২৩. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৯

চন্দ্রাননে কি শোভা, কমল নয়ন ।
ভুরু ভৃঙ্গ ভঙ্গী করি, করে মধুপান ॥
কেশ বেশ কি তাহার, কি বা নীরদ আকার ।
মন শিখী তাহা দেখি, হরিষে অজ্ঞান ॥ ১ ॥
শ্রবণে শোভে কুণ্ডল, চমকে অতি চঞ্চল ।
কিরণ ঝলকে তার দামিনী সমান ॥ ২ ॥

২২৪. বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৫৯

আমারে কি তার আছয়ে মনে ?
মনেতে করিত যদি তবে কি মরি হে কাঁদি ?
নিরখিয়ে থাকি পথ পানে ॥
তাহারে না দেখে প্রাণ যেমন করে ।
এ কথা কে বুঝিবে, কহিব কারে ?
কিবা রাত্রি দিন, তার প্রতি মন,
আমি যে কাতর, সে কি জানে ? ॥ ১ ॥

২২৫. বেহাগ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৬০

অহঙ্কার কারোপর করিব, কে সহে ?
যে করিল সোহাগিনী, সেই বিনে, আর কেহ নহে ॥
আপন নহে যে জন, তারে কিবা প্রয়োজন ?
সেই জন প্রিয় জন, সুখে সুখী, দুঃখে দহে ॥ ১ ॥

২২৬. বেহাগ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৬০

ভাবনা রহিল যদি, সেখানে ভাবনা রহিত না হই কেনে,
আর লোকে বলে ঐ ভাবনা।
তবে বুঝি এ ভাবনা, ভাবনা কেবল ভাবনা, সই ভাবনা,
ভবে ভাবনা অভাব, তবু না যায় ভাবনা, এ কি ভাবনা ॥ ১ ॥

২২৭. বেহাগ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৬০

তোমারে কে জানে, যে জানে প্রাণ সেই সে সুখী।
তোমারে জানিতে, সাধ যার চিতে,
কদাচিতে নহে সে দুখী ॥
তোমারে যে নাহি জানে, তারে কেহ নাহি জানে।
জেনেছে যে জন, ভুলিতে কখন, সে কি পারে ?
নাহিক দেখি ॥ ১ ।

২২৮. বেহাগ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৬০

কোথারে চলিলে হে প্রাণ ! মন মান ভরে।
দুঃখের উপরে সুখ, দুখ দিয়ে মোরে ॥
যদি অনেক দিনান্তে, পাইলেম প্রাণকান্তে,
প্রাণ গেলে নাহি কয়, বল না কে কারে ॥ ১ ॥
আপনি ভাবিয়ে নাথ, অভিমানে কহি কত।
ইথে এত বিপরীত, ভাবিলে অন্তরে ॥ ২ ॥

২২৯. বেহাগ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৬১

কি সন্দেহ কর প্রাণ নিঃসন্দে (নিঃসন্দেহ) রহ।
আর কাহারো পর আমার নাহি মোহ ॥
মোহরে করিয়ে দূর, নির্মোহী নাম মোর।
দয়ার অধিক দয়া, তোমারে বুঝে লহ ॥ ১ ॥

২৩০. বেহাগ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৬১

গঞ্জনে নিরঞ্জন হয়েছে নয়নে।

সেই নীর হার হতো, যদি হিংসা না করিত, কোন জনে ॥

করিতে প্রেম ভঞ্জন,

আছে কত শত জন।

ত্যজিতে অসত জন, বলে বিনে প্রয়োজন, প্রিয়জনে ॥

২৩১. বেহাগ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৬১

কখন যামিনী কামিনী মুখ চাহি কি রহে?

আমার যেমন, তোমার কারণ, পথ চাহি পরাণ দহে ॥

যামিনী থাকিতে কেন, আসিতে সে দিবে প্রাণ?

তুমি জান ভাল, আমার সকল, দুখ সহে, তারে না সহে ॥ ১ ॥

২৩২. বেহাগ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৬১

এমন সুখ বসেতে হে প্রাণনাথ বিবস করো না।

অদর্শনে যে দর্শন নয়ন মানে না ॥

কবিতে বনিতে লতা,

বিনাশ্রয়ে থাকে কোথা?

নিরাশ্রয়ে কত সুখ, তুমি কি জান না ॥ ১ ॥

২৩৩. বেহাগ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৬১

কি করিব রে মন (মনঃ) মোর বশ (সব শ) (স্ব বশ) নহে।

যাবত তাহারে হেরিলাম, হারাইলাম লাজ ভয়,

বিরহে শেষে দহে ॥ ১ ॥

২৩৪. বেহাগ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৬২

জানি তোরে, যা, যারে, যাহারে প্রাণ সঁপিলে।

সকল রজনী কামিনী বাসে রঙ্গরসে ভোর করিলে ॥ ১ ॥

২৩৫. বেহাগ ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৬২

একবার দেখিবার সাধ কি আর নাহি রে ?
বিরহে স঳পিয়ে গেলে, পুন না আইলে ॥
বিরহে কি বাঁচে, কি মরে ॥ ১ ॥

২৩৬. বেহাগ ॥ কাওয়ালী ॥ গী. র. ৬২

কেমন করি মোরে ভুলি রহিলে একেবারে ?
তুমি কি তা নাহি জান, যেমন আমার মনঃ, তোমার তরে ?
দিবানিশি ভাসি আমি নয়ন নীরে।
তুমি নাহি মনে কর, আমি হে অতি কাতর, বিরহ শরে ॥ ১ ॥

২৩৭. বিহঙ্গ বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬২

আর কি প্রাণনাথ যাইতে পারে লো সখি !
বান্ধিয়াছি প্রেম ডোরে, রক্ষক তায় আঁখি ॥
হৃদি সরোজ ভিতরে, লুকায়ে রেখেছি তারে।
বাহির কি করি আর ? বুঝে দেখ দেখি ॥ ১ ॥

২৩৮. বিহঙ্গ বেহাগ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬২-৬৩

তুমি মোরে ভুলিলে ভ্রমরা রে, কি রসে মজিয়ে।
বিরহ আগুন, দিয়ে এই ধন, রয়েছে প্রাণ প্রবোধিয়ে ॥
নানা ফুলবনে ভ্রম,
সকলের সনে প্রেম।
নলিনী নীরেতে, তাহারে দেখিতে, কদাচ মনে নাহি হয়ে ॥ ১ ॥

২৩৯. বেহাগ সরফরদা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬৩

অনেকের প্রিয় সে, আমারে প্রিয় বলিবে কেন ?
এমন বাসনা কেবল যন্ত্রণা, সদা জ্বালাতন ॥

নয়ন নীরেতে ভাসি, ভাবি তারে দিবানিশি।
আমার এ কাজ, সে তো অলিরাজ, তার কি এখন ॥ ১

২৪০. বাহার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬৩

কুসুম সময় বিষম বিরহী জনে।
মধুপানে মত্ত অলিকুল ফুলবনে ॥
বহে মন্দ সমীরণ কোকিলের গানে।
অঙ্গ জর জর হয় জীবন মরণে ॥ ১ ॥
অনুপায় দেখি অতি খেদান্বিত মনে।
রতিকান্ত শান্ত নহে প্রাণকান্ত বিনে ॥ ২ ॥

২৪১. বাহার ॥ জলদ তেতালা গী. র. ৬৩-৬৪

বিরস ত্যজিয়ে ওলো হরিষ হাসনা।
গলিত কেশ নীরদ, তাহার আড়েতে চাঁদ,
লুকায়ে কেন বল না ॥
ত্যজনা বিষম বেশ,
করহ স্বভাব বেশ।
ঈষদ হাসিয়ে প্রিয়ে, অভিমান বিনাশিয়ে, প্রাণ!
সরসে মজ না ॥ ১ ॥

২৪২. সোঘ্রাই বাহার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬৪

মান ভরে ভর করিছ কেমনে?
অমিয় সমান এমন বচন না যায় সহনে ॥
মানেতে মমেরে দহে, তাহাও তোমার সহে,
মিনতি আমার, বোধ হয় শর, বল কি কারণে ॥ ১ ॥

২৪৩. সোঘ্‌রাই বাহার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬৪

সুধামুখি ! মুখ বিরস করো্যা না ॥
বিরসবিষেতে, না পারি জ্বলিতে, তুমি তা বুঝ না ॥
অমিয় আসক্ত মন, গরল খাইবে কেন ?
সুধা কর দান, বাঁচাও জীবন, অধীনে বধো না ॥ ১ ॥

২৪৪. সোঘরাই বাহার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬৪

ওই দেখ না লো সই, আসিছে হাসিতে ২ মোর মনোরঞ্জন ।
দেখ, যাহার কারণ, ওষ্ঠাগত মোর প্রাণ ॥
তার দরশনে কি করিবে গঞ্জন ?
প্রতিপাদ অর্পণে, লোমাঞ্চ হরিষ মনে, দুখ হলো ভঞ্জন ॥
আলিঙ্গন করিবারে, কুচভুজ নৃত্য করে,
নয়ন রাখিতে চাহে করি অঞ্জন ॥ ১ ॥

২৪৫. সোঘ্‌রাই বাহার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬৪-৬৫

তোমার গুণের কথা কি কব ! কহিতে প্রফুল্ল বদন ।
উদয় যাহা মনেতে, শুনি তোমার মুখেতে,
আর ইহা হতে আশ্চর্য্য কেমন ॥
অতএব প্রিয়জন, তোমা বিনা আর কোন,
আছে মোর প্রয়োজন ॥
জনরবে কি বা ভয়, তুমি থাকহ সদয় ।
হয়ো না নিদয়, এই নিবেদন ॥ ১ ॥

২৪৬. সোঘ্‌রাই বাহার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬৫

তোমারে আমার এত সাধিতে হইল । (প্রাণ)
সাধিলে করিব মান, মোর মনে ছিল ॥
বাসনার বিপরীত আমার ঘটিল ।
তবু কি তোমার সাধ ইথে না পূরিল ? ॥ ১ ॥

২৪৮. সোঘ্রাই বাহার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬৫

হাস হাস হাস আলো (ওলো), ও বিধুবদনি ।
পরাণ কাতর হয় হেরিলে মানিনী ॥
কি দুঃখে দুঃখিত হয়ে, হেরিয়ে ধরণী ।
ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি ॥১॥

২৪৯. সোঘ্রাই বাহার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬৫

আমার নয়ন মানে না ।
চল ! বুঝালে কি হবে সই !
তুমি বল, সে আসিবে,
আমি বলি কই ?
বিলম্বের নাহি গুণ
করিতে হয় গমন ।
গিয়ে দেখি, তুমি বলো
তব প্রাণ ওই ॥ ১ ॥

২৫০. সোঘ্রাই বাহার ॥ একতালা ॥ গী. র. ৬৫-৬৬

গীরিষ্ম (গ্রীষ্ম) ঋতু কান্ত মোর পরদেশে ।
ত্রিতাপে তাপিত তনু অশেষ বিশেষে ॥
একে বিরহানল,
দ্বিতীয়, রবি প্রবল ।
তৃতীয়, আপনি ঋতু অনল বরিষে ॥ ১ ॥

২৫১. সোঘ্রাই বাহার ॥ একতালা ॥ গী. র. ৬৬

আজু কি সুদিন, সুদীন জনে !
যেমন নিদয়, জানিতাম তায়, সদয় সেই ভবনে

৫

কত কি হইল লাভ,
কি করিব অনুভব,
আশা আগে প্রাণ,
শূন্য দেহে প্রাণ, আইল তারে দেখনে ॥১॥

২৫২. ভীম পলাশী বাহার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬৬

বসন্ত সমুদ্র সম, তার মুদ্র বুঝ অনুমানে।
ফুলতরী অলিগণ, নাবিক তাহে বাখান।
কর্ণধার রতিপতি, তরঙ্গ পবনে ॥
হিমাংশু পতাকা তায়,
কোকিলেতে সারি গায়,
অতি সুমধুর শুনিতে শ্রবণে ॥
সংযোগী সে তরি (তরী) পর,
অনায়াসে হয় পার,
অপার পাথার বোধ, বিরহী জনে ॥১॥

২৫৩. ভীম পলাশী বাহার ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৬৬-৬৭

বিরহী বাধিতে আইল প্রবল বসন্ত।
প্রাণ দহে, স্থির নহে, বিনে প্রাণকান্ত ॥
ফুল বিকসিত, কোকিল কূজিত, মলয়া দুরন্ত।
তাহাতে মদন আর নিদয় নিতান্ত ॥ ১ ॥
দহে অনিবার, জীবন আমার, নাহি হয় শান্ত।
উপায় ইহাতে দেখি, কান্ত, কি কৃতান্ত ॥ ২ ॥

২৫৪. ভীম পলাশী বাহার ॥ জদল তেতালা ॥ গী. র. ৬৭

আইল বসন্ত, সকলে উন্মত্ত, দুঃখী বিরহিণী।
বন আর উপবন, দেখ, কুসুম কানন,
ফলে ফুলে প্রফুল্লিত, বিনে কমলিনী ॥

মদনের পঞ্চশর, কোকিল পঞ্চমস্বর,
শরে শরে শরজাল, বুঝ অনুমানে ॥
সংযোগী কাতর নহে, পতিত রমণী দহে,
কান্ত, কান্ত, এই স্বর, তার মুখে শুনি ॥১॥

২৫৫. খাম্বাজ বাহার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬৭

বুঝায়ে দেখেছি মন প্রবোধ না মানে।
তবগুণ গান, করি ওহে প্রাণ, ভুলায়ে রেখেছি প্রাণে ॥
বিরহ জ্বালায় মন, পিরীতি সংশয় প্রাণ।
ইহাতে সদয়, হয়ে প্রাণ প্রিয়, কর, যে হয় বিধান ॥ ১ ॥

২৫৬. আড়ানা বাহার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬৭-৬৮

বিরহ যাতনা সখী (সখি) রে অতি বিষম হইল।
আইল বসন্ত।
কুসুম সৌরভ, কোকিলের রব সহেনা,
ওরব নিতান্ত ॥
দিবাকর সুধাকর সম মম মনে,
জ্বলায় জীবন মন্দ মলয়া পবনে।
উপায় ইহাতে, না পাই দেখিতে,
উপায় সেই প্রাণকান্ত ॥ ১ ॥

২৫৭. আড়ানা বাহার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৬৮

আইল বসন্ত সখীরে (সখিরে) সঙ্গে লইয়ে আপন সকল সামন্ত।
একে একশত, সৈন্যগণ যত, কহিব যে কত, দুরন্ত ॥
দ্বিজরাজ অলিরাজ, সিতা শীতরূপে।
শশধর বিষধর, বুঝহ স্বরূপে ॥
ভ্রমরগুঞ্জর, হলাহল শর, কুটিল কোকিল কৃতান্ত ॥ ১ ॥

২৫৮. আড়ানা বাহার ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৬৮

কৃতান্তাধিক দুরন্ত বসন্ত।
জীবন বিয়োগ পরে শমন প্রহারে,
বসন্ত জীয়ন্ত জ্বলায়, এমন অশান্ত ॥
উপায় নাহিক আর পলাবার পথ,
অনঙ্গ যাহার দূত আঁখি অগোচর।
কিরূপে তাহারে নিবারি, বিনে প্রাণকান্ত ॥ ১ ॥

২৫৯. আড়ানা বাহার ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৬৮-৬৯

বিচ্ছেদ অসির চ্ছেদ প্রবল বসন্তে।
অন্য অসির চ্ছেদনে, হয় খণ্ড খণ্ড।
এ অসির চ্ছেদে অখণ্ড মরণ জীয়ন্তে ॥
মদনের শর আর কোকিল স্বরেতে,
শরে শরে তনু মোর অতি জরজর,
ভ্রমর গুঞ্জর তাহাতে, ভেদ কি শেলেতে ॥ ১ ॥

২৬০. আড়ানা বাহার ॥ তাল হরি ॥ (মূলতান বাহার ॥ তাল হরি ॥)
॥ গী. র. ॥ ৩য় সং। ৬৯

ঋতুবর আইল, কোকিল পঞ্চম স্বরে মঙ্গল গাইল ॥
মদন হইয়ে মত্ত, নাচিতে লাগিল ॥
বিরহী কম্পিত অতি প্রমাদ গণিল।
মন্দ মলয়া মারুত বহিতে লাগিল ॥
বিকস কুসুমবন, সুখি (সুখী) অলিকুল।
সুখের সাগরে ভাসে সংযোগী সকল ॥ ১ ॥

২৬১. মূলতানী বাহার ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৬৯

উপায় কি আছে আর এরূপ খেদেতে ?
জগত জীবন, এমন পবন, করয়ে দহন, বসন্ত কালেতে ॥

অতি শীত শশধর, দহে তাতে কলেবর, খেদিত নহি ইহাতে।
কলঙ্কী যে জন, নিজে জ্বালাতন, ভাল কি কখন,
পারয়ে করিতে ॥ ১ ॥
চন্দন শীতল জ্ঞান, করিয়ে করি লেপন,
দ্বিগুণ দহে তাহাতে।
সহ বিষধর, বাস নিরন্তর, দোষ তো তাহার,
না পারি কহিতে ॥ ২ ॥
মদনের গুণাগুণ, কহিবারে নাহিগুণ, বিদিত আছে জগতে।
হরের নয়ন, অনলে দাহন, হ'য়ে এবে জান, অনঙ্গ রূপেতে ॥৩॥

২৬২. মূলতানী বাহার ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৬৯-৭০

দেখ না লো সই! এমন সুদিন, ডাকিছে কোকিল, মত্ত অলিকুল,
বিকসিত ফুল, মলয়া পবন।
মিলন শশী উদিত, বিচ্ছেদ তপন গত, সুখী হৃদি পদ্মানন ॥
সহ প্রাণ কান্ত, যামিনীর কান্ত, হইল উপনীত, বসন্ত রাজন ॥১॥

২৬৩. মূলতানী বাহার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭০

সদয় নিদয় নাথ মধুর বসন্তে।
কোকিল আলাপে বীণা বাজায় মারুতে ॥
রতিপতি নৃত্যকারী, ফুলগণ তাল ধারী,
শশধর শোভাকারী, বেষ্টিত তারাতে ॥১॥

২৬৪. মূলতানী বাহার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭০ (তাল হরি ॥
গী. র. ॥ ৩য় সং। ৭০)

এমন সময় নাথ রহিল কোথারে।
ভ্রমরাঝঙ্কার শুনি পরাণ বিদরে ॥
আইল ঋতু রাজন, লয়ে নিজ সৈন্যগণ,
কে রাখে তার সম্মান, বিরহে কে পারে? ॥ ১ ॥

২৬৫. ইমন ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭০

কত বা মিনতি করিয়ে আমারে ভুলালে।
এবে অপরূপ দেখ, দেখা না দেয় সাধিলে॥
এমন হইবে আগে, কেমনে জানিব।
জানিলে আপম মন, কেন বা সঁপিব॥
না জেনে এই সে হলো, ভাসি হে দুঃখ সলিলে॥১॥

২৬৬. ইমন ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭০-৭১

জগতে জানিল আমারে তোমার কারণে।
ত্যজিয়ে কুল ব্যাকুল, ভাসি অকূল জীবনে॥
তুমি কুল নাহি দিলে, কুল কোথা পাব?
অকূল পাথার হতে কেমনে তরিব?
উচিত সদয় হ'তে অবলা সরলা জনে॥ ১ ॥

২৬৭. ইমন ॥ জলদ তেতাল ॥ গী. র. ৭১

বল দেখি, কি তার ক্ষতি ইথে হবে? অধীনে সদয় হলে?
এক দিবা সহস্র, সহস্র এক রাতি, বিরহ গণনা ছলে।
সসর্পেচ গৃহে বাস, বিরহ দেহে তাদৃশ।
বিনে মিলন অমিয় জীবনের সংশয় যায় সখী (সখি)
কি করিলে?॥১॥

২৬৮. ইমন ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭১

আমি কি জানি প্রাণ অন্তর অন্তরে।
কি আর নাহিক জানি তোমার অন্তরে॥
দিবানিশি আছ তুমি আমার অন্তরে।
অন্তর অন্তর হলে জানিতে অন্তরে॥ ১ ॥

২৬৯. ইমন ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭১

না দেখে হয় প্রাণ কত কি মনেতে।
অনেক জনের আশা, আছয়ে তোমাতে ॥
তিলেক তোমার রোষে মরি হে ভয়েতে।
কি জানি, নিদয় হও, না পাই দেখিতে ॥ ১ ॥

২৭০. ইমন ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭১--২

ছাড় মোর হাত নাথ, লোকে দেখে পাছে। (প্রাণ)
আমার কি আছে লাজ তোমার কাছে ?
সময়ে ধরিলে পায়, তাহা প্রাণ শোভা পায়,
অসময়ে হাত ধরা কি সুখ আছে ? ॥ ১ ॥

২৭১. ইমন পুরিয়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭২

বুঝাও, যাও, কহিও আমি তোমার জানি।
এই সে কারণ, সঁপিলেম প্রাণ, তুমি আমার জানি ॥
কায় প্রাণেতে অন্তর,
সুখ দুঃখ কি কাহার।
আমার শরীর, কেমন প্রকার, সদা কাতর জানি ॥ ১ ॥

২৭২. ইমন পুরিয়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭২

সদয় রহিও, শুন প্রাণপ্রিয়,
নিদয় না হয়ো নাথ !
প্রথমে যে রীতে, মজালে পিরীতে,
সেই রীতে রেখ চিত ॥
ধনপ্রাণ আর মন, আমার নহে এখন।
সঁপেছি তোমারে, তোমার বিচারে
কর, যা হয় উচিত ।

২৭৩. ইমন পুরিয়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭২

মন! তোর মোর একই স্বভাব, কি লাভ আর।
তুই মন এক মনঃ হওয়া অতি ভার ॥
উভয়ের প্রেম গুণে জানিবে এ সার।
রীতে রীতে, চিতে চিতে, সুখ হে আপার ॥ ১ ॥

২৭৪. ইমন পুরিয়া ॥ কাওয়ালি ॥ গী. র. ৭২-৭৩

অন্তর মোর কেমন করে না দেখে তারে।
বাক্যহীন মন হয়, কহিতে না পারে ॥
যেরূপ যাতনা তাহা কহি কি প্রকারে
নয়ন কাতর অতি ভাসে সদা নীরে ॥ ১ ॥

২৭৫. ইমন কল্যাণ ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ৭৩

কি কারণে এত অভিমান, প্রাণ, কিছুই না জানি।
বিরস কমলানন, কাতর ভ্রমর মনঃ, হাস লো মৃগনয়নী
(মৃগনয়নি) ॥
অনুগত জনে মান, করি কেন বধ প্রাণ, বচন শুন লো ধনি ॥১॥

২৭৬. ইমন কল্যাণ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৩

আর আমারে এত সাধিতেছ কেন। (প্রাণ)
ত্যজিয়ে আমারে সঁপিলে যাহারে, আপন পরাণ,
সেথা করহ গমন ॥
আমি হে তোমার মত, না হলেম কদাচিত ;
করিয়ে অনেক সাধন।
এবে কি মনে বুঝিয়ে নিদয় সদয় হয়ে,
আইলে এখন বুঝি
দেখিতে রোদন ॥১॥

২৭৭. ইমন কল্যাণ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৩

তুমি কি জানিবে আমার মন।
মন আপনারে আপনি জানেনা ॥
জানহ যেমন, করহ রোদন,
ইহাতে হে প্রাণ! আন কোরো না ॥
যাহার যেমন ভাব
তাহার তেমন লাভ,
পিরীতের পথ, সুগম যেমত
বুঝেছ তুমি তো, কার বলো না ॥ ১ ॥

২৭৮. ইমন কল্যাণ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৪

জনরব কি রবে নীরব হবে।
সদা এই রব, কবে লোক সব, কি করিব, কে পারিবে ॥
দেখিয়ে মত্ত মনেরে,
লাজ ভয় ভয় করে
বারণে বারণ, নাহি নিবারণ, বিনে জ্ঞান কে শুনিবে ॥ ১ ॥

২৭৯. ইমন কল্যাণ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৪

জানিহে নাথ! তোমার যে মত
পিরীতে হে কত মত ব্যবহার।
ভুলায়ে নয়ন, হরে লয় মন,
হলে হে এমন, দেখা পাওয়া ভার ॥
না দেখিলে তব মুখ, জীবন সংশয় দেখ,
দিয়ে দরশন, দিলে প্রাণ দান,
ইহাতে হে প্রাণ, ক্ষতি কি তোমার ॥ ১ ॥

২৮০. ইমন কল্যাণ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৪

মনে নাহি ছিল প্রাণনাথ! পাইব তোমারে।
সদয় হইবে শশী কাতর চকোরে ॥

পুনঃ অনুকূল নাথ হইবে অধীনে।
হেরিব ও বিধুমুখ তৃষিত নয়নে॥
পূরিবে মনের আশা দুঃখ যাবে দূরে॥ ১॥
যখন মদন মোরে করিত দাহন।
কোথা গেলে প্রাণনাথ, বাঁচাও জীবন॥
এই চিন্তা বিনে আর, না হতো অন্তরে॥ ২॥

২৮১. ইমন ভূপালি॥ তাল হরি॥ গী. র. ৭৪-৭৫
প্রাণ যেমন করে, কহিব কারে?
কে কবে তারে?
দিবে নিশি ভাসি আমি
নয়ন নীরে॥
পিরীতি অমিয় যদি জেনেছি অন্তরে।
বিষ কি করিল দোষ, বল না মোরে॥ ১॥
কেমনে সরলা অতি বলে অবলারে।
পাষাণ বরং ভাল মম বিচারে॥ ২॥

২৮২. ইমন ভূপালি॥ তাল হরি॥ গী. র. ৭৫
বুঝিলাম এতদিনে প্রাণ, বুঝেছ আমার মন
কি পরমাধিক সুখ হইল এখন॥
জানাইতে মোর মনঃ, করেছিলাম প্রাণ পণ,
তুমি তো বুঝিলে এবে, পূরিল সাধন॥ ১॥

২৮৩. ঝিঁঝিট॥ তাল হরি॥ গী. র. ৭৫
না দেখিলে বল না সই বাঁচিব কেমনে।
দিবানিশি সেই রূপ সদা পড়ে মনে॥
সতত কাতর প্রাণ, বারি সহিত নয়ন।
বিনা সে বিধুবদন প্রবোধ না মানে॥ ১॥

পিরীতি অমিয়াধিক, সকলে বলয়ে দেখ।
বিষম হইল মোর করমের গুণে ॥ ২ ॥

২৮৪. ঝিঁঝিট ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৭৫-৭৬

নয়ন পাগল সই করিল আমারে।
যত দেখি, তথাপিহ আশা নাহি পূরে ॥
যদি বিনয়েতে মনঃ, স্থির হয় কদাচন,
নয়ন মন্ত্রণা দিয়া ভুলায়ে তাহারে ॥ ১ ॥
পলকে প্রলয় হয়, প্রাণ মোর সংশয়।
বল ইহার উপায়, বাঁচি কি প্রকারে ॥ ২ ॥

২৮৫. ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৬

পিরীতে সখি এই সে হইল।
লাজ ভয় কুলশীল সকলি মজিল ॥
না করিলে গুণাগুণ, বোধ নহে কদাচন।
করিয়ে মরি এখন, দেখ তার ফল ॥ ১ ॥
পিরীতি রতন নিধি, যতনে মিলাল বিধি,
পাইয়ে এমন নিধি, দুঃখ নাহি গেল ॥ ২ ॥

২৮৬. ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৬

কেন লো প্রিয়ে ! কি লাগি মানিনী ?
ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি ॥
হরি হরি, মরি মরি, মানভরে ভর করি,
নয়ন সহিত বারি, হেরিয়ে ধরণী ॥ ১ ॥
আলুয়ে পড়েছে কেশ, বিষাদিনী হীন বেশ।
তোমার বিরস শেষ, দংশে মোরে ধনি ॥ ২ ॥
মলিন বদন শশী, তাহে নাহি হেরি হাসি।
চকোর কাতর আসি, ও বিধুবদনি ॥ ৩ ॥

২৮৭. ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৬-৭৭

পিরীতের গুণাগুণ, যদি জান সই, কারেও বলো না।
ত্যজিতে না পারি যাহা, তাহার কি সো(শো)চনা।
ক্ষণেক সুধা সাগর, ক্ষণে হলাহল শর,
যত দুঃখ, তত সুখ, মনে কেন বুঝ না ॥ ১ ॥
দেখি, পিরীতি রতন, পাইয়াছে যেই জন।
ত্যজিতে সংশয় প্রাণ, ফণী মণি দেখ না ॥ ২ ॥
চক্রবাক চক্রবাকী, দিবসে দোঁহেতে সুখী।
নিশিতে বিচ্ছেদ দুঃখে, তথাপিও ত্যজে না ॥ ৩ ॥

২৮৮. ঝিঁঝিট । জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৭

পিরীতি না জানে সখী (সখি), সে জন সুখী কেমনে ?
যেমন তিমিরালয় দেখ দীপ বিহনে ॥
প্রেমরস সুধাপান, নাহি করিল যে জন,
বৃথায় তার জীবন, পশু সম গণনে ॥ ১ ॥

২৮৯. ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৭

অনেক সাধের সুখে প্রাণ ! দুঃখ পাছে হয়,
কুজনের কথা শুন, সদা ওই ভয় ॥
আমার যে নহে মত, যদি তাতে হও রত।
তবে বুঝ দেখ দেখি, কিসের প্রণয় ॥ ১ ॥

২৯০. ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৭

কত ভালবাসি তারে, সই ! কেমনে বুঝাব।
দরশনে পুলকিত মম অঙ্গ সব ॥
যতক্ষণ নাহি দেখি রোদন করয়ে আঁখি।
দেখিলে কি নিধি পাই, কোথায় রাখিব ॥ ১ ॥

২৯১. ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৭-৭৮

নিতান্ত অধীনী জনে প্রাণ! লোকে জানে, মনে রাখিও।
প্রবোধের ঘরে মোর মনেরে দেখিও ॥
আশার দয়ার হাতে হাতে সঁপিও ॥ ১ ॥
আমারে নয়ন নীরে নাহি ভাসাইও।
তব দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী জানিও ॥ ২ ॥

২৯২. ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৮

রাহুর আহার শশী যে বিধি করয়।
পিরীতে বিচ্ছেদ বুঝি তাহা হতে হয় ॥
এই খেদ হয়, প্রেম সুখে তায়,
বিচ্ছেদ মিলায়!
চমকেতে প্রাণ যায় সদা ওই ভয় ॥

২৮৩ ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৮

নয়ন অন্তর তোরে, প্রাণ! বলনারে, করিব কেমনে ?
যদি নিরন্তর তুমি আছ মোর মনে ॥
বাহিরে না হেরি বারি, বহে নয়নে।
তোমারে পেয়েছি আমি অনেক যতনে।
তিলেক বিচ্ছেদ কি আর সহে এখনে ॥ ১ ॥

২৯৪. ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৮

পিরীতের রীত এ কি প্রাণ!
অন্তরে থাকিয়ে কেন জ্বলাও অন্তর ?
এরূপ করিলে হয়, পরাণ কাতর ॥
তুমি কভু দুঃখী নহ, জান কি মন্তর ॥ ১ ॥

২৯৫. ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৮

কমলে কমল আঁখি প্রাণ ! হেরিয়ে সুখী মম হৃদয় কমল ।
অতি সুমধুর বাণী শুনি শ্রুতি সুখী ।
সহাস্য ও পদ্মমুখ, পদ্ম আঁখি দেখি ॥ ১ ॥

২৯৬. ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৯

উদয় ভূতলে একি অপরূপ শশী ।
শশধর শোভাকরে নিশিতে প্রকাশি ॥
ইহার কীরণ (কিরণ) দেখ সম দিবানিশি ॥ ১ ॥

২৯৭. ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৯

ভাল তো ভুলালে প্রাণ বিনয় ছলেতে ।
তোমার প্রেমের ডুরি হাসিতে হাসিতে ॥
অতি সাধ করে আমি দিলাম গলেতে ।
উচিত তোমার হয় চাতুরী ত্যজিতে ॥
অবলা সরলা অতি বুঝ হে মনেতে ॥ ১ ॥

২৯৮. ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৯

শুন, শুন, শুন রে প্রাণ ! অধীনী জনেরে নিদয় হইও না ।
বিরহ যন্ত্রণা বুঝি তুমি জান না ॥
জানিলে জ্বালাতনে জ্বলাইতে না ।
কবিতা, বনিতা, লতা,—বুঝে দেখ না ॥
নিরাশ্রয়ে কদাচিত শোভা থাকে না ॥ ১ ॥

২৯৯. ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৯

নয়নে নয়নে রাখি । (প্রাণ)
অনিমিখ হয় আঁখি, বাসনা মনেতে ।
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুঃখি । (দুঃখী) ।
কি জানি, অন্তর হও, অই ভয় দেখি ॥ ১ ॥

৩০০. ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৭৯-৮০

হলো, হলো, হলো রে প্রাণ ! পূরিল মনের সাধ আমার।
কলঙ্কিনী হইলাম প্রেমেতে তোমার ॥
এই তো হইল লাভ, রোদন সার।
যে নহে আমার, আমি হইলে তাহার,
সে কেন বুঝিবে দুঃখ, নহে ত বিচার ॥ ১ ॥

৩০১. ঝিঁঝিট ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৮০

রতন অধিক তোরে প্রাণ ! করিরে যতন।
বুঝা নাহি যায় ভাব তোমার কেমন ॥
কখন থাক সদয়, কখন অতি নিদয়।
অবলা সরলা, জ্বালা দিও না কখন ॥ ১ ॥

৩০২. ঝিঁঝিট ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৮০

অবোলা, শরলা (অবলা, সরলা) অতি প্রাণ ! শঠতা কি সহে।
তপন কিরণ দেখ, কমলে না দহে ॥
সুজনের এই রীত, তোষে তারে যে যেমত
বিশেষ অধীনে কেহ বিরূপ না কহে ॥ ১ ॥

৩০৩. ঝিঁঝিট ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৮০

এই মনে প্রাণ তোমার ছিল হে নাথ !
সদাই চাতুরী করি জ্বালাইবে চিত ॥
মনেরে ভুলাইয়ে লইবে প্রাণ।
যতনে রাখিতে তারে হয় তো বিধান ॥
তা না করে বধিবারে হলো হে মত ॥ ১ ॥

৩০৪. ঝিঁঝিট ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৮০-৮১

কেমনে তোমার আশা পূরাইব মন।
একে তুমি, তাহে আর কান্দিছে নয়ন ॥

অতএব এই কর, নিজ আশা পরিহর।
নয়নেরে শান্ত কর, এই সে বিধান॥ ১ ॥

৩০৫. ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৮১

বিরহ অনল শীতল হলো এত দিনে।
অনেক দিবসের পর, হেরিয়ে মুখ তোমার, রয়েছে অনন্দনীর,
আমার নয়নে ॥
মনেতে না ছিল নাথ তোমারে পাইব।
দুঃখসিন্ধু হতে পুনঃ কূলেতে আসিব।
বিনে অনুকূল বিধি, কোথায় মিলয়ে নিধি,
সুদীনের সুদিন, হইবে কে জানে॥ ১ ॥

৩০৬. ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৮১

আমি কি কখন তোমারে
ওরে, না দেখে থাকিতে পারি?
বিনা দরশনে প্রাণ, শূন্য দেহ হয় প্রাণ,
সচেতন হয় পুনঃ, তব মুখ হেরি॥
প্রথম মিলনাবধি বুঝিয়াঝি মনে।
কদাচিত নহি সুখী তোমার বিহনে॥
এবে এই নিবেদন, বিচ্ছেদ না হয় যেন,
নয়ন নিকটে থাক, সদা সাধ করি॥ ১ ॥

৩০৭, ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৮১-৮২

কেন এত নিদয় হইলে অধীনী জনে,
দিবে নিশি হৃদি পরে, সোহাগে রাখিতে যারে
এবে তারে ভুলিলে কেমনে?

তোমার প্রতি মোর মন, প্রথমাবধি এখন,
ভিন্ন ভাব নহে কখন,
তোমার কেমন ভাব, নাহি হয় অনুভব
এবে লাভ সলিল নয়নে ॥ ১ ॥

৩০৮. ঝিঁঝিট ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৮২

প্রাণ তুমি জাননা যেমন আমার মন।
রতি নিজ পতি প্রতি, যেমন তাহার মতি,
তব প্রতি আমার তেমন ॥
চকোরি (চকোরী) চাতকী যেন, হেরিবারে শশী ঘন,
চঞ্চলিত থাকে যেমন।
মণির কারণে ফণি, যেরূপ কাতর জানি,
ততোধিক তোমার কারণ ॥১॥

৩০৯. ঝিঁঝিট ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৮২

হায়! কি বিপরীত বিধির ঘটন।
কহিতে উপজে দুঃখ আইসে রোদন ॥
সুখেতে করিলে তুমি নিশি জাগরণ।
আমার হইল দেখ অরুণ নয়ন ॥ ১ ॥
তুমি হে করিলে চুরি পরের রতন।
মদন প্রহারে মোরে বিচার এখন ॥ ২ ॥

৩১০. ঝিঁঝিট ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ৮২-৮৩

যাও! তারে কহিও, সখি, আমারে কি ভুলালে। হে।
বিরহে তব প্রাণ সংশয়, ভাসি আমি নয়ন সলিলে ॥
আসিবে আশয়ে, পথ নিরখিয়ে, আছি প্রাণ!
তোমার মনে প্রাণ! জানি, কি আছে প্রাণ!
গেলে কি হইবে আইলে ॥ ১ ॥

৩১১. ঝিঁঝিট ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ৮৩

আর আলে না প্রাণ ! মান করে যে গেলে ।
মনে করি প্রাণ নাথ ! এই সে করিলে,
কেবল অবলা মজালে ॥
আমার নাহিক দোষ, না বুঝি করিলে রোষ ।
তবে দোষ থাকে যদি, যায় তো বুঝালে, না করি,
মানেতে রহিলে ॥১॥

৩১২. পাহাড়ী ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৮৩

কেতকী এতকি প্রিয়সি (প্রেয়সী) তব মধুকর ।
নলিনী নিরাশ্রয়ে দহে নিরন্তর ॥
নাম তব বসরাজ, রাজার উচিত কায (কাজ) ।
এই কি তোমার অন্যেরে আপন জ্ঞান, আপন অন্তর ॥১॥

৩১৩. পাহাড়ী ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৮৩

মনের বাসনা সই, সেই সে জানে ।
কাহারে কহিব আর, কেহ নাহি জানে ॥
আপন নয়ন হয়ে প্রবোধ না মানে ।
বিরহ অনল অতি বাড়য়ে রোদনে ॥১॥
অনল শীতল হয়, তার দরশনে ।
সেই নয়নের নীরে, সময়ের গুণে ॥২॥

৩১৪. পাহাড়ী ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৮৪

এতদিনে মন বশ হইল নয়ন ।
তার সে রূপ হৃদয়ে করেছে ধ্যান ॥
বাহ্যে অদর্শনে দুঃখী নহে কদাচন ।
সদা মন যোগে তায় করি দরশন ॥১॥

৩১৫. পাহাড়ী ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৮৪

মনেতে বুঝিয়ে দেখ, না দেখিলে তব মুখ,
রহা যাবে কেন। (প্রাণ)
দেখনা, কান্দিতে হয় হলে অদর্শন ॥
দরশনে পুলকিত প্রফুল্ল বদন।
সকল রতন হতে মন অতি ধন ॥
যে ধন তোমার কাছে তুমিও তা জান ॥১॥

৩১৬. পাহাড়ী ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৮৪

নয়নের বাণ, কে বলিলে প্রাণ, দেখ নলিনীদল।
বলিতে পারিবে বটে, স্বভাব অনল ॥
তেজেতে উৎপত্তি যাব, দাহিকে (দাহিকা) শক্তি তাহার,
তপনেরে সখী বলে অধিক প্রবল ॥১॥
আর অপরূপ গুণ, কেহ যান (জান) কিনা যান (জান),
কটাক্ষে বিরহানল করয়ে শীতল ॥২॥

৩১৭. পাহাড়ী ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ॥ ৮৪

কলঙ্ক শশাঙ্ক হেরিলে কলঙ্ক হয়, খেদ কি ত ত?
অকলঙ্ক শশী হেরি, কলঙ্ক কুলেতে ॥
চতুর্থী ভাদ্র মাসেতে, নিষেধ শশী হেরিতে।
কখন বারণ নহে, এ শশী দেখিতে ॥১॥

৩১৮. পাহাড়ী ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ॥ ৮৫

বারে বাবে এবারে, আর আমি তারে, সাধিব না। সই।
কতবার মনে করি, মনেতে থাকে না ॥
এতদিনে না বুঝিলেম, তাহার মন্ত্রণা ॥
সে কি আমার হইবে, করিলে সাধনা ॥১॥

৩১৯. পাহাড়ী ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৮৫

রীতে রীতে চিতে চিতে মিলিলে সে সুখ হয়।
সুরীতে, কুরীতে মিত্র হয়েছে কোথায় ?
স্বভাবে অভাব ভাব,
ভাব দেখি সে কি ভাব ?
ছাগে বাঘে, সতাসতে, কিসের প্রণয় ? ॥১॥

৩২০. পাহাড়ী ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৮৫

বুঝিলাম এখন মনে, দুঃখিনীজনে, নিধিলাভ হবে কেনে। সই !
সতত রাখিয়েছিলাম নয়নে নয়নে ॥
তথাপি সে লুকাইল, করমের গুণে।
হৃদয়ে তাহার রূপ, হেরি লো মননে ॥
সুস্থির কি হয় প্রাণ চাক্ষুষ বিহনে ॥১॥

৩২১. পাহাড়ী ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৮৫

তোমারে নয়নে রাখি, কারেও না দেখি।
সাধ আমার মনেতে। (প্রাণ)।
অন্তরে থাকিলে হয় অন্তরে ভাবিতে ॥
নিকটে থাকিলে দুঃখে না হয় জ্বলিতে।
আসিবে আশায় পথ হেরিতে হেরিতে।
যেরূপ যাতনা তাহা না পারি বুঝাতে ॥১॥

৩২২. পাহাড়ী ঝিঁঝিট ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ৮৬

কেমনে আলে অলিরাজ ! এলে ত্যজিয়ে কেতকিনী ?
হইবে অনেক সুখ মনেতে বুঝিয়ে,
বুঝি প্রাণ সঁপিলে তাহারে ওরে, রোদিত কমলিনী ॥১॥
সব ফুলে সমভাব, তোমার বিচারে যদি (প্রাণ),
বৃথায় নলিনী ভাবে, আপনি সোহাগিনী ॥২॥

৩২৩. পাহাড়ী ঝিঁঝিট ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ৮৬

জানি, তুমি প্রাণ নিধি। হে।
বিরস দেখিলে মুখ কত মত সাধি ॥
সতত বাসনা মোর, কখন হয়োনা অন্তর ॥
অন্তরে হলে অন্তর, কেমনে প্রবোধি ॥১॥

৩২৪. পাহাড়ী ঝিঁঝিট ॥ তালহরি ॥ গী. র. ৮৬

ওই যায় সই! ডাক না উহারে! মোর প্রাণ যায়।
মানেতে কহেছি কত, ফিরে নাহি চায় ॥
কেন বা করিলেম মান, এখন যে যায় প্রাণ।
রতন যতন বিনে, থাকে কি কোথায় ॥১॥

৩২৫. এলাইয়া ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৮৬

নয়ন নিকটে থাক, অন্তর হইও না।
অন্তর হয়ে অন্তর আমার জ্বালাইও না ॥
আমার অন্তরে আছ, তুমি জান না।
জানিলে অন্তরে ভয় কখন হইত না ॥১॥

৩২৬. এলাইয়া ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ॥ ৮৭

যায়, যায়, যায় প্রাণ যায় রে।
নিষেধ না মানে, করি কি এখন?
আশা তাহার নিকটে, ঘরে নাহি মন ॥
যাহারে আপন জানি সঁপিলাম প্রাণ।
সে যদি না রাখে আর, পারে কোন জন ॥১॥

৩২৭. গারা ঝিঁঝিট ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৮৭

মননে নহে এত সুখ, যত বাহ্য দরশনে।
যদি ইহা হতো, নহে কদাচিত, বহিত সলিল নয়নে ॥

চাক্ষুষে হরিষ আঁখি, বচনে শ্রবণ সুখী,
পরশে পরশে, লাভ কি তাদৃশ,
কীদৃশ না যায় কহনে ॥১॥

৩২৮. গারা ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী.র. ৮৭

কে ও যায় চাহিতে চাহিতে ?
ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে ॥
যতক্ষণ যায় দেখা না পারি সরিতে।
আঁখি মোর অনিমিক্ (অনিমিখ্) হেরিতে হেরিতে ॥১॥

৩২৯. গারা ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৮৮

কে আপনি অধিক তোমার ?
বুঝাইলে নাহি বুঝ, খেদ হে আমার ॥
তোমার হইয়ে আমি হইব কাহার।
সুখ ত্যজি বিষ খায় হয় কি বিচার ॥১॥

৩৩০. গারা ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৮৮

আর আমারে কেন কর জ্বালাতন ?
এমন দরশন হতে ভাল অদর্শন।
যেমন তোমারে আমি করেছি সাধন।
তাহার উচিত ফল পাইলেম এখন ॥১॥

৩৩১. গারা ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৮৮

হউক আমারে যত করহ যতন।
তার সাক্ষী দিবানিশি দহে মোর মন ॥
তোমার গুণের কথা অকথ্য কথন।
অনিল অন্তরে মোর সজল নয়ন ॥১॥

৩৩২. গারা ঝিঁঝিট ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ৮৮

আমার কি অযতন, প্রাণ, তোমারে !
তুমি কি যতনাধিক করহে আমারে ॥
মুকুরে আপন মুখ, দেখায় যেমন দেখ
মনের মুকুর মন, নিরখ অন্তরে ॥১॥

৩৩৩. বেলওয়াল ঝিঁঝিট ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ৮৮

ভুলাইতে প্রাণ আছে কি মনে ?
প্রাণ সঁপিয়াছি তোরে প্রিয়বচনে ॥
হেরিয়ে তোমার মুখ,
নয়নে নাহি নিমিখ,
কেশপাশে বান্ধা মন সহ মদনে ॥১॥

৩৩৪. ভূপালী ঝিঁঝিট ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ৮৯

কবে তারে পাইব ? (সই) ॥
আমার মনের দুঃখ কহিব ॥
বিরহ অনলে আর কত বা দহিব ।
শীতল বল না কিসে হইব ॥১॥

৩৩৫. ভূপালী ঝিঁঝিট ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ৮৯

হাস হাস হেরি লো । (প্রাণ)
বিরস বদন দেখি মরি লো ॥
তোমার একপে মোর নয়ন সজল
দহিছে প্রাণ, আর কি করি লো ॥১॥

৩৩৬. জয়েজ ঝিঁঝিট ॥ তালহরি ॥ গী. র. ৮৯

ধীরে ধীরে যাও প্রাণ !
এত রোষ কেন ?

বলনা, কি দোষে !
সরসরমণী রস অভিলাষে ॥
অনঙ্গ ভুজঙ্গ সম বুঝহ বিশেষে ।
পরস (পরশ) বিনে পরস থাকে কিশে (কিসে) ? ॥১॥

৩৩৭. জয়েজ ঝিঁঝিট ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৮৯

থাক, থাক, সুখে থাক, যেখানে সুখাধিক,
কি কাজ কমলে ?
নিরন্তর নীরেতে দেহ জ্বলে ॥
নানা কুসুম কাননে, তুমি তো ফিরিলে ।
নলিনী সলিলবাসী, না হেরিলে ।

৩৩৮. ইমন ঝিঁঝিট ॥ একতালা ॥ গী. র. ৯০

আইলে প্রাণনাথ, প্রাণ ! কোথায় রাখি !
সরোজ সদনে শশী অপরূপ দেখি ॥
ধরাধর শূন্য পরে, গমন পবন ভরে,
শিলে ভাসিছে নীরে, বুঝে দেখ দেখি ॥১॥

৩৩৯ ইমন ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৯০

কেশ ফণি (ফণী) ময় প্রাণ মণি একমুখ ।
এক ফণি (ফণী) হতে মণি পাওয়া ভার দেখ ॥
কেশেরে করহ ঘন, দেখাও বিধুবদন,
অমিয় বচন দান, করে প্রাণ রাখ ॥১॥

৩৪০. ইমন ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৯০

তুমি মোর মত প্রাণ হইতেছে কেন ?
বিচ্ছেদে কাতর আমি, তুমিও তেমন

বুঝিয়ে তোমার দুঃখ, দুঃখের উপরে দুঃখ,
এরূপ হতেছে বোধ সংশয় জীবন ॥১॥

৩৪১. কাফি ঝিঁঝিট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৯০

কমলিনী (কমলিনি) হের না ভ্রমরে ।
অনুগত জনে মান, প্রাণ, সতত কে করে ॥
ধনী হইয়ে যদি অধীনে না হেরে ।
বল তবে প্রিয়ে, সে, ওলো, যাইবে কোথারে ? ॥১॥

৩৪২. বেহাগ ঝিঁঝিট ॥ তাল হবি ॥ গী. র. ৯১

ববিমুখি (খী) কুসুম সম ভাব, মোব সুধামুখি ।
দেখ দুই পাশে, উপবে বিশেষে, সমুখে নিবখি ॥
বিবস বিধু বদন,
দেখিতে না হয় যেন ।
বিরস দেখিলে হৃদয কমল পবাণ অসুখী ॥১॥

৩৪৩. বেহাগ ঝিঁঝিট ॥ তাল হবি ॥ গী. র. ৯১

তুমি তার তবে হ'লে সুধামুখি পাগলিনী ।
সেই ধ্যানজ্ঞান, তাব গুণ জ্ঞান (গান) দিবস বজনী ॥
অন্য অন্য বিষয়েতে,
থাক তুমি অন্য চিতে ।
তাহাব প্রসঙ্গ হলে নানারঙ্গ কুরঙ্গনয়নী ॥১॥

৩৪৪. বেহাগ ঝিঁঝাট ॥ তাল হবি ॥ গী. ব. ৯১

মানিনি ! মানেতে রহিলে তুমি প্রাণ !
চলিল মব মানমোচন ।
মানের যতন অধিক রতন,
হতেছে বুঝি এখন ॥

কি হইবে মান গেলে, এখন নাহি বুঝিলে।
তব দুঃখে দুখী, শুন বল সখি,
তেঁই সে বলি এখন ॥১॥

৩৪৫. বেহাগ ঝিঁঝিট ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৯১

সকল রতন অধিক যে মন, সই।
যতনে আমি দিলাম যাহারে।
বিহনে সে জন, আর প্রিয়জন,
বলিব বল কাহারে ॥
ইহার অধিক হিত,
হইবার আর মত,
অবুঝ বুঝিবে তাহারে ॥
যাহার কারণ, তৃষিত নয়ন,
অন্তর দহে অন্তরে ॥১॥

৩৪৬. বেহাগ ঝিঁঝিট ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ৯১-৯২

হউক বেনে সই কহিও নিদয়ে, সদয় হওনে কি ক্ষতি ?
দেখ, চাতকিনী তৃষায়ে ব্যাকুল নবঘন প্রতি ॥
চকোরী সুধার তরে দেখ অভিলাষ করে।
বিধু কি বঞ্চনা করয়ে তাহারে, হয় কি এমতি ॥১।

৩৪৭. কানাড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৯২

বরিষে ঘন ঘন ঘন কেন গরজে ঘন।
তৃষায় চাতকী মরে শুন শুন শুন ॥
মিলন সময় নিকট হইলে।
বিরহ অনল আর অধিক জ্বলে।
তৃষায় ডাকিছে, বারি আন আন আন ॥১॥

৩৪৮. কানড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৯২

দেখ দেখি, কি সুখ সখী (সখি) এমন পিরীতে।
লাজ ভয় সব গেল, কলঙ্ক কুলেতে ॥
দিবানিশি যদি তারে, রাখিলো হৃদয় 'পরে,
তিলেক বিচ্ছেদে হয় বিরহে জ্বলিতে ॥১॥
নয়ন শ্রবণ ত্বক্, নাসিকা রসনা দেখ।
পাঁচজন সুখ লোভে ডুবালে দুঃখেতে ॥২॥

৩৪৯. কানড়া। জলদ তেতালা। গী. র. ৯২

এসো রসরাজ! বিরাজ নলিনী ভবনে।
শুন ওহে প্রাণ! হারাইবে প্রাণ কেতকী কণ্টকে কেনে ?
যেমন যতন আমি করিতে তোমারে।
তেমতি আমারে তুমি না ভাব অন্তরে।
কেমন স্বভাব, নিজ লাভালাভ, বুঝিতে না পার মনে ॥১॥

৩৫০. কানড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ (বিহাগ ঝিঁঝিট। তাল ছবি।
গীতরত্ন ৩য় সং পৃষ্ঠা ৯২-৯৩

কেন কমলিনী মানিনী অধীন ভ্রমরে
শুন সরোজিনী, কভু নাহি শুনি, কেতকী গমন করে ॥
যখন তোমারে আমি না পাই দেখিতে।
বিরহ জ্বালায় হয় ভ্রমণ করি[illegible]
পাগল দেখিয়ে, শুন লো প্রিয়ে :
কেহ তোষে, কেহ মারে ॥১॥

৩৫১. মিশ্রার কানড়া ॥ জলদ তেতালা [illegible] ৯৩

ওই খানে রহিও প্রা[illegible]
প্রভাতে শশী কুমুদি (কুমুদী) ভবনে কেন ?
দেখনা কমল, হয়েছে প্রফুল্ল, নিরখি সখা আপন ॥

সময়ে সদয় নহ,
অসময়ে কেন দহ ?
এবে দরশন, সম অদর্শন, এমনি সময় গুণ ॥১॥

৩৫২. দরবারি কানড়া ॥ তালহরি ॥ গী. ব. ৯৩

প্রাণ ! কেন এত রোষ কর, অধীনী অবলা পর ।
তুমি ধন মান প্রাণ, এই ভাব রাত্রি দিন, অন্তরে হয় মোর ॥
তোমাবিনে থাকি আমি যেন শূন্যাকার ।
দরশনে সচেতন, নিঃসন্দেহ হই তখন, ভয় নাহি আর ॥১॥

৩৫৩. দরবারি কানড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. ব. ৯৩-৯৪

যে যারে ভালবাসে,
সে তারে ভালবাসে না, কে বলে ?
তার সাক্ষী চাতকিনী তৃষায় ব্যাকুল ।
নীরদ তেমনি তারে তোষে ধারাজলে ॥১॥

৩৫৪. দরবারি কানড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. ব. ৯৪

মন হরণ মন, করহ যতন, বলি হে তোমারে ।
নিলে এক গুণ, হইবে তা জান,
দিতে দুই গুণ, না ববে কথায় ॥
সকল ধন অধিক,
মন ধন প্রিয় দেখ ।
হেরিলে সে ধন, এই সে কারণ,
তোমার নয়ন, ছাড়িতে না চায় ॥১॥

৩৫৫. দরবারি কানড়া ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৯৪

কেন এমন মান করে তারে (মন) না করি বিচার ।
যাহার বদন, বিরস কখন, দেখি যদি প্রাণ, হয়লো বিদার ॥

প্রাণেরোধিক যারে, সতত যতন করে।
তারে করি মান, যত দুঃখ প্রাণ, তুমিও তো জান,
বুঝাব কি আর ॥১॥

৩৫৬. বারোঁয়া ॥ ঠুংরি ॥ গী. র. ৯৪

পিরীতের দুঃখ ভ্রম, জ্ঞান সুখময়।
যাহার যেমন মন, তাহার ফল তেমন, হয় হে উদয় ॥
প্রেম করি দুই জ্ঞান, থাকে যতদিন,
কখন সমূহ সুখী, কখন সুদিন (সুদীন)
এক জ্ঞান হলে চিত, দুখ হয় কদাচিত, সুখ অতিশয় ॥

৩৫৭. বারোঁয়া ॥ ঠুংরি ॥ গী. র. ৯৪-৯৫

আপনার মত বিনে সুখী কে কোথায় ?
মন মত হলে চিত, সুখ হয় কত মত, বলা নাহি যায় ॥
যে যার আপন হয়, সে হয় তাহার,
ভিন্ন ভাবে ভাব কোথা হয়েছে কাহার ?
স্বভাবে স্বভাব ভাব, সকলের এই রব, সন্দেহ কি তায় ॥ ১ ॥

৩৫৮. কামোদ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৯৫

প্রাণ ! জান তো তুমি পিরীতের রীত।
বিচ্ছেদ হইলে মন সুখেতে থাকয়ে যত ॥
সুখের আশয়ে মন, উভয়েতে সমর্পণ,
করিয়ে এখন কেন দুঃখেতে সঁপেছ চিত ? ॥ ১ ॥
সতত এই বাসনা, নয়ন অন্তর হইও না।
জ্বলালে জ্বলিতে হয় অধিক কহিব কত ? ॥ ২ ॥

৩৫৯. কামোদ ॥ তালহরি ॥ গী. র. ৯৫

পিরীতি (তে) কি সুখ সই, যে না পারে লাজ ত্যজিতে।
মনে উপজয় সুখ, লয় হে দুখেতে ॥

কখন বাসনা নহে তিলেক ত্যজিতে।
ক্ষণেকে কি সুখ হয় তার সহিতে ? ॥ ১ ॥

৩৬০. কামোদ ॥ তালহরি ॥ ৯৫-৯৬

প্রাণ ! কেমনে আইলে তারে ত্যজিয়ে।
কেতকী কত কি মনে করিছে না দেখিয়ে ॥
যাও যাও শীঘ্র গতি, কামিনী কাতর অতি, তোমারে ভাবিয়ে।
তার সুখে দুঃখ দিয়ে আইলে কি লাগিয়ে ॥ ১ ॥
শুন, অহে অলিরাজ
আসিতে না হলো লাজ, এখন ফিরিয়ে ॥
সখার উদয় দেখা নহিলে কভু কি হয়ে ॥ ২ ॥

৩৬১. কামোদ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৯৬

জানি রে প্রাণ যেমন, তোমারে আমার যতন।
কি দোষ তোমার, বিশেষ আমার কঠিন পরাণ ॥
দুখ বিনে সুখ নাহি হইতে পারে।
ইহা বুঝি প্রাণ ! তুমি বুঝেছ অন্তরে ?
যে হেতু অন্তর, থাক নিরন্তর, করেছ বিধান ॥ ১ ॥

৩৬২. কামোদ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. ব. ৯৬

বরিষে ঘন, চাতকী কত কি করিছে মনে।
তৃষায় অনল, করে জল জল, জলধর ! জল হর কেনে ?
শুনি গরজ গভীর, পুলক হয় শরীর
বিহনে জীবন, কেমনে জীবন,
আর বল কিসে বাঁচিবে প্রাণ ॥ ১ ॥

৩৬৩. কামোদ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৯৬

নিরখি ঘন, বরিষে নয়ন, বাহুলতামূলে।
বাহুলতা মূলে জল, বিরহ-লতা প্রবল, হয় সেই জলে ॥

শোকসিন্ধু প্রলাপিত, মনেরে ডুবালে ॥
দুঃখ তরু তাহে দেখ, উন্নত হল অধিক, শোভা ফলফুলে ॥ ১ ॥

৩৬৪. কামোদ গৌড় ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ২৭

নয়নে না দেখে যারে, মানেতে সেই মনেতে উদয় কেন ?
নয়নের বশ হলে তবে হে বাঁচে কি জীবন (সই)
অঙ্গ আপনার, বশ নহে মোর, করিবে ইহাতে কেমন ?
কেহ মান করে, কেহ কাতর তাহার কারণ ॥ ১ ॥

৩৬৫. কামোদ গৌড় ॥ তালহরি ॥ গী. র. ২৭

বরষা ঋতু আইল।
বিরহানল প্রবল হইল ॥
এমন সময়ে, আমারে ত্যজিয়ে নাথ কোথা রহিল ॥
ঘন গরজ সানেতে,
কামবাণ সানে তাতে।
হেন রূপ দেখি, সঙ্কেতে চাতকী পিউ রব করিল ॥ ১ ॥
নিরখিয়ে জলধর,
আঁখি মোর জলধর।
করে বরিষণ, নিশ্বাস পবন, অতিশয় বাড়ালি (বাড়িল) ॥ ২

৩৬৬. কামোদ গৌড় ॥ তালহরি ॥ গী. র. ২৭

যাবে কেমনে হে কান্ত এমন বরষাতে ?
দেখ, ঘন ঘন, বরিষে নয়ন, হইবে ভিজিতে ॥
নিশ্বাস প্রলয় বায়, স্থির কি হইবে তায় ?
খেদ সৌদামিনী, রাখি একাকিনী, শোকের পথেতে ॥ ১

৩৬৭. কামোদ গৌড় ॥ একতালা ॥ গী. র. ২৭-২৮

প্রাণনাথ আইল, সখী (সখি) দেখলো।
বিরহ অনল মোর হেরিয়ে নিবিল ॥

দিবানিশি বিরহেতে, রহিতে হ'তো জ্বলিতে,
এখন করিলে মান, প্রাণ কি বাঁচে লো ॥ ১ ॥

৩৬৮. (৩৬৭ সংখ্যক গানের শেষাংশ) গী. র. ৯৮

দুঃখেতে কহিতে আঁখি, আর না হেরিব সখী (সখি),
এখন নয়ন তার অধীন হইল ॥ ২ ॥
অঙ্গের অঙ্গ অবশ, কারে বলে করি রোষ,
সময় পাইলে দিব সমুচিত ফল ॥ ৩ ॥

৩৬৯. কামোদ খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ (গীতরত্ন । ২য় সং । ৯৮ পৃষ্ঠা) গী. র. ৯৮

নানান্ দেশে নানান্ ভাসা (ভাষা)
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা ?*
কত নদী সরোবর,
কি বা ফল চাতকীর ।
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি ত্রিষা (তৃষা) ?

৩৭০. কামোদ খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৯৮

ছাড়িলে তো ছাড়া নাহি যায় ।
ছাড়া হেন রব হলে প্রাণ বাহিরায় ॥
অতএব এই বিধি,
যাহা করিয়াছে বিধি,
ইহা কি অন্যথা হয় লোকের কথায় ? ॥ ১ ॥

* বিনে সদেশিয় ভাষে পুরে কি আশা ?=গীতরত্ন, প্রথম সং ।

৩৭১. কেদারা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৯৮

রাখে যেমন মন, তার মন সমান দেখ। (প্রাণ)
সে জন কখন, করে অযতন, তোমার এমন, বচন রাখ ॥
যদি সে নিদয় হয়,
তবে দুঃখ অতিশয়,
নিজে জ্বালাতন, নহিলে কখন, দেখায় আপন, বিরস মুখ ॥ ১ ॥

৩৭২. কেদারা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৯৯

মন পুর হতে আমার হারায়েছে মনঃ।
কাহারে কহিব, কারে দোষ দিব, নিলে কোন জন ॥
না বল্যে কেমনে রব, বল্যে বল কি করিব।
তোমা বিনে আর, সেখানে কাহার, গমনাগমন ॥ ১ ॥
অন্যের অগমনীয়, জান সে স্থান নিশ্চয়।
ইথে অনুমান, এই হয় প্রাণ, তুমি সে কারণ ॥ ২ ॥
যদি তাহে থাকে ফল, লয়েছ, করেছ ভাল।
নাহি চাহি আমি, যদি প্রাণ তুমি, করহ যতন ॥ ৩ ॥

৩৭৩. কেদারা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৯৯

প্রেমবাণ, প্রাণ! আমার প্রাণে হানিলে।
চিহ্ন নাহি তার, বেদনা অপার, বল কি করিলে ॥
বিস্ময় হইলেম নাথ, কথায় তা কব কত।
বিনে শরাসন, অপরূপ বাণ, নিক্ষেপ করিলে ॥ ১ ॥
এ কথা কাহারে কব, কেমনে তারে বুঝাব।
বিনে নিদর্শনে, কেহ নাহি মানে, কামিনী মজালে ॥ ২ ॥
কেমনে হইব স্থির, উপায় না দেখি আর।
এই হয় মনে, সুখ দরশনে, দুঃখ না দেখিলে ॥ ৩ ॥

৩৭৪. কেদারা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ৯৯

একেবারে এত অনুগ্রহ অধীনে !
এমন সময়, হইবে নিদয়, ছিল না মনে ॥
তোমারে হেরিয়ে প্রাণ,
শূন্য দেহে আল্যো প্রাণ, বারি ধারা বহে নয়নে ॥
বিরহ অনল, হইল শীতল, তব দরশনে ।। ১ ।।

৩৭৫. কেদারা ॥ জলদ তেতালা ।। গী. র. ১০০

সাধিলে করিব মান কত মনে করি ।
দেখিলে তাহার মুখ, আপনি পাসরি ।।
মম মানে কহে আখি, আর না হইব সুখী ।
দরশনে হয় পুনঃ, অধীন তাহারি ।। ১ ।।

৩৭৬. কেদারা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. ব. ১০০

জানিলেম তুমি প্রাণ রসিক হে যত ।
অনল শীতল হয় কথায় হে কত ।।
হেরি নয়ন যুড়ায় (জুড়ায়) শ্রবণ সুখী কথায় ।
মন আশা কে পূরায়, ভাবি হে সতত ।। ১ ।।

৩৭৭. কেদারা ॥ জলদ তেতাল ॥ গী. ব. ১০০

হিম শিশিরে নীরে,
কেন আসিবে হে মধুকর !
জীবন থাকিতে. সতত দেখিতে না পাই,
থাক অন্তরেতে নিরন্তর ॥
যতদিন আছে প্রাণ
দিও ওহে দরশন,
এই তো বাসনা মোর ॥

দিবা অবসান হইলে,
মিলন হবে তো হইলে,
কি গুণ জ্ঞান অন্তর ॥ ১ ॥

৩৭৮. কেদারা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০০

কহিও তারে, যারে সখি দেখি, সে কি আসিবে ?
বিরহ নিরহপায়ে (?) তব মুখ না দেখিয়ে,
রাত্রি দিন জ্বলায়, এ কি শীতল হইবে ?
মনের মানস এই, কহিবে তাহারে সই
যদি হয় অনুকূল, তবে থাকে কুলশীল,
লজ্জাভয় সকল রয়, নিতান্ত জানিবে ॥ ১ ॥

৩৭৯. কেদারা ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১০১

দিয়েছি যারে, তারে কি প্রকারে, কহিব দেহ। (প্রাণ)
করে সে যতন, তাহার রতন, কি কহিবে এখন, বিনে সেহ ॥
মিছে অনুযোগ কর, উপায় কি আছে আর।
দেখ, মত্ত মন, স্বভাব বারণ, না শুনে বারণ, বলি লহ ॥ ১ ॥

৩৮০. কেদারা ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ১০১

শরদ নিরদ (শারদ নীরদ) রবে প্রাণ কি রবে ?
প্রাণ কান্ত বিদেশে।
এমন মধুর স্বর, বোধ হয় বিষশর,
আমার পরশে ॥
এমন সুখ সময়, এক বিনে দুঃখ ময়,
বিষাদ হরিষে।
দামিনী কিরণ দেখি, শিহরে শরীর আঁখি,
দুঃখেতে বরিষে ॥ ১ ॥

৩৮১. কেদারা কামোদ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০১

অনিমিখে যারে নিরখে মৃগনয়নী।
নিশ্চিত এ জান, তাহার পরাণ, হরয়ে তখনি ॥
নীরদ নিন্দিত কেশী,
নিরমল মুখশশী।
সুধাভাষী, মৃদু মৃদু হাসি, মদন মোহিনী ॥ ১ ॥

৩৮২. কেদারা খাম্বাজ ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১০১-১০২

মন! তোরে মনে করে কি মনে করে।
রতন অধিক নিধি হলো কি বোধেরে ॥
কিবা প্রাণ সম নিধি ভাবয়ে অন্তরে ॥
শুনি অমিয় বচন, সুধাসিন্ধু করে জ্ঞান, বাঁচাতে প্রাণেরে ॥
কি মদন শান্ত কারী, বুঝিলো বিচারে।
কি মনোজে করে বৈরী, থাকিয়ে অন্তরে ॥ ১ ॥

৩৮৩. কেদারা খাম্বাজ ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১০২

প্রাণ! মান থাকে কিলো শশী দেখনে।
নিরন্তর শশধর বলিতে বচনে।
তপন সমান এবে করিছ কি মনে ॥
শশীরে তপন জ্ঞান,
করি সুখী হবে কেন?
এ হবে কেমনে?
জ্বালাতন শীতল কি হয় হুতাশনে?
ত্যজি এমন জীবন বাঁচাও জীবনে ॥ ১ ॥

৩৮৪. কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০২

এত কি চাতুরী সহে প্রাণ! তোমার পিরীতে দিবেনিশি
ঝুরে আঁখি।

এত যদি ছিল মনে, পিরীতি করিলে কেনে ?
শঠতা সরলা সনে উচিত হয় কি ?
কপট বিনয় ছলে, অবলারে ভুলাইলে,
এখন এমন হলে, দেখ না হে দেখি ॥ ১ ॥

৩৮৫. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০২-১০৩
দেখ না (সই) কত সুখী হই, দেখিলে তাহারে ।
অদর্শনে হুতাশন, জ্বলয়ে অন্তরে ॥
চক্রবাক চক্রবাকী, নিশিতে একত্র দেখি ।
তাহার অধিক সুখী, বুঝিলাম বিচারে ॥১॥

৩৮৬. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০৩
দেখ না সই, প্রাণ নাথ বই, করি কি এখন
প্রবল মদন মোরে কবিছে দাহন ॥
আমার দুঃখেতে দুঃখি (দুঃখী) নহে সে কখন
তাহার সুখেতে সুখী হই সদক্ষণ ।
রতি পতি কারে (করে) মোরে করি সমর্পণ
কামিনী সহিত সুখে মজিল সে জন ॥ ১ ॥

৩৮৭. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. ব. ১০৩
আমি জানি তোমার যতন ।
এমন কে জানে । (প্রাণ)
প্রাণ সঁপিলেম আমি এই সে কারণে ॥
তুমি মোর মনোমত, আমি তব মত মত ।
হয় কিহে আর মত লোকের বচনে ॥ ১ ॥

৩৮৮. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০৩
তুমি জান আমার যতন যেমন তোমারে ।
আপন জানিয়ে মন সঁপিলে আমারে ॥

প্রাণপণে তব মন, করি লো আমি যতন।
ইহাতে অন্যথা, প্রাণ, ভেবো না অন্তরে ॥ ১ ॥

৩৮৯. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০৩-১০৪

আসিব না—বলিলে কেন প্রাণ!
এখন বলিলে বটে, হরিয়াছ মন ॥
পাছে ফিরে দিতে হয়,
বুঝি হইয়াছে ভয়,
যায় যায় যাক প্রাণ বলো না এমন ॥ ১ ॥

৩৯০. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০৪

নয়ন ঘরে তোমারে রাখিব কেমনে।
বিষম বিরহানলে উব সে সঘনে ॥
হৃদয় কমলে থাক, দুঃখ মুখ নাহি দেখ।
অনলবেষ্টিত তাহে হয়েছে এখানে ॥ ১ ॥

৩৯১. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০৪

হের ভ্রমরে, ও কমলিনী (কমলিনি)
মধুকর কাতর প্রাণ হেরি বিষাদিনী ॥
দেখ না স্বভাব গুণে, ফিরে নানা ফুল বনে,
দিবানিশি তব ধ্যানে, থাকি বিনোদিনী (বিনোদিনি) ॥ ১ ॥

৩৯২. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০৪

জানি, যাও হে মধুকর।
যথা মধু মিলয়ে, প্রাণ, বশ হও তার ॥
অরুণ উদয় যদি, নাহি করিত বিধি,
তবে কি মরি হে কান্দি, অধীনী তোমার ॥ ১ ॥

৩৯৩. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০৪

কারে এত করিরে যতন, যেমন তাহারে ॥
তার এই রীতি সই, মনে নাহি করে ॥
আমি মরি তার তরে, সে নাহি হেরে আমারে।
নিরখিয়ে পথ আঁখি ভাসয়ে নীরে ॥
সে ভ্রমে এমত, কহিতে বুক বিদরে ॥ ১ ॥

৩৯৪. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০৫

তারে দেখিতে এত সাধ কেন ?
তিলেক না হেরি যদি সজল নয়ন ॥
আভরণ করিয়াছি লোকের গঞ্জন।
তাহার কারণে মরি, সে নহে আপন ॥ ১ ॥
তাহার রীতের কথা অকথ্য কথন।
তবে যে ভুলেছে মন, জানয়ে কি গুণ ॥ ২ ॥

৩৯৫. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০৫

কেন চঞ্চল বিধুমুখি !
থাক তুমি অন্য মনে তিলেক না দেখি ॥
সে তোমার মন বাঁশী, শুন প্রাণে সখি।
মনেরে অস্থির করি তারে কর দুঃখি (দুঃখী) ॥ ১ ॥
উভয় মিলন যথা সেথা বুঝ দেখি।
একের দুঃখেতে দুঃখি (দুঃখী), সুখে হয় সুখী ॥ ২ ॥

৩৯৬. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০৫

প্রাণ ! এমন মান কেহ করে কি কখন ?
সাধিতে সাধিতে ওলো গেল মোর মান ॥
রাখিতে যাহার মান, তার এবে অপমান।
তোমার কি ওই মান রবে চিরদিন ॥ ১ ॥

৩৯৭. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০৫

তোমার দেখা দিতে বল, এত ক্ষতি কি এখন।
কি লাভ ছিল যখন, প্রথম মিলন ॥
কতেক মিনতি করি, আমার হাতেতে ধরি, কহিতে তখন,
তিলেক না হেরি যদি, না বাঁচে জীবন ॥ ১ ॥

৩৯৮. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০৬

দেখ দেখি কত রূপ করিতে যতন ?
এখন কি রাজা হলে, ছিলে না তখন ?
লইয়ে আমার মন, দিলে হে আপন মন,
এবে সেই মন, চুরি করি কারে দিলে, কেথা মম মন ? ॥ ১ ॥

৩৯৯. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০৬

মিলনের সাধ বুঝি নাহিক আমার।
হইলে যাতনা কেন হইবে আমাব ?
তার প্রতি যত আশা আছয়ে আমার।
জানিয়ে অনুচিত কর রে ব্যাভার ॥ ১ ॥
বিচ্ছেদেতে প্রাণ মোর দহে আনিবার।
তার বোধ হবে কেন, অনেক যাহার ॥ ২ ॥

৪০০. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০৬

সে সাধ পূরিলে বল সাধনা কে করে।
যতন অধিক থাকে আশা নাহি পূরে ॥
তৃষায় ব্যাকুল জন জল জল করে।
তৃষাহীন জন নাহি যায় সরোবরে ॥ ১ ॥

৪০১. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০৬

এই কি তোমার প্রাণ ! করিতে উচিত ?
তারে কি জ্বালাতে হয়, যে নহে তোমার অমত ?

কি বা রাত্রি, কি বা দিন, যে তব আশ্রিত।
তার আশা পূরাইতে নিদয় কেন হে এত ? ॥ ১ ॥

৪০২. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ; গী. র. ১০৬-১০৭

কি তার অদিয় (অদেয়) আছে প্রাণ, তা দিতে নাহি কাতর।
তুমি কি তা নাহি জান, দিয়াছি আপন মনঃ,
থাকে যদি দিব আর ॥
তোমার মনের মত, মত হে আমার।
ইহাতে অন্যথা ভাব, কর কেন অনুভব,
ভাব যে যার, সে তার ॥ ১ ॥

৪০৩. সিন্ধু কাপী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১০৭

কি আর বলিব ওরে প্রাণ ! জান ত আমি যেমন।
মম এই অভিলাষ, হৃদয় মন্দিরে বাস কর এই নিবেদন ॥
ক্ষণেক না দেখি যদি তোমার বদন।
মন অতি চঞ্চল, নয়ন হয় সজল, মুখে না সরে বচন ॥ ১ ॥

৪০৪. সিন্ধু কাপী ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১০৭

মান মনে উপজিলে ভয়ে তা নিবারি। (সই)
মম বিরসে বিরস, পাছে তারে হেরি ॥
যেরূপ যতন তারে বুঝাতে না পারি।
মণির কারণে যেন, হরি হরি হরি ॥ ১ ॥

৪০৫. সিন্ধু কাপী ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১০৭

অতিশয় সাধ করি এই ত হইল। (সই)
সতত কাতর প্রাণ নয়ন সজল ॥
পিরীতি রতন লাভ হবে আশা ছিল।
তা না হয়ে মোর মন ধন হারাইল ॥ ১ ॥

৪০৬. সিন্ধু কাপী ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১০৮

অপরূপ শশধর প্রকাশে দামিনী। (ঐ)
দামিনী সদৃশ বটে হাসি অনুমানি ॥
শ্রবণে শোভে কুণ্ডল যেন দিনমণি
নিবিড় নীরদাধিক কেশেরে বাখানি ॥ ১ ॥

৪০৭, সিন্ধু কাপী ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১০৮

হেরিয়ে কমল কেন প্রকাশে কমল। (প্রাণ)
জানিতাম, তপন হেরি বিকসে কমল ॥
তার সাক্ষী দেখ তব বদন কমল।
হেবিলে প্রফুল্ল মন হৃদয় কমল ॥ ১ ॥

৪০৮. সিন্ধু কাপী ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১০৮

প্রবোধ কি মানে আঁখি না দেখি তাহারে।
বুঝালে বুঝিবে কেন, তার মত দেখ কারে?
মন নয়ন সংযোগ, তারে দেখিবারে,
নিবৃত্তিরে নাহি দেখে, থাকে প্রবৃত্তির ঘরে ॥ ১ ॥

৪০৯. সিন্ধু কাপী ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১০৮

আমি কিলো তারে সাধিতে যতন করি?
সব ধনাধিক মন করেছে চুবী (চুরি) ॥
মিছে অনুযোগ কর, সকলি বুঝিতে পার।
আপনার বশ নহে, ইথে কি করি ॥ ১ ॥

৪১০. সিন্ধু কাপী ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১০৮

তারে সাধি লো যত, তত জ্বলায় আমারে।
যেরূপ খেদ ইহাতে, কহিব কাহারে ॥
এত দুঃখে মন তবু ভুলিতে না পারে।
অবশ হইয়ে আশা মজালে আমারে ॥ ১ ॥

৪১১. সিন্ধু কাপী ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১০৯

তব পথ চাহিয়ে চিত অতি চঞ্চলিত। (প্রাণ)।
মণির কারণে ফণী কাতর কত ॥
তুমি জান না কি জান, যেমন আমার মন।
চাতকী কিঞ্চিত জানে, আপন মত ॥ ১ ॥

৪১২. সিন্ধু কাপী ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী র. ১০৯

পিরীতি কি হয় যায় কাহার কথায়।
উভয়ে মন সংযোগ, নয়ন কারণ তায় ॥
পিরীতের গুণাগুণ, করে যে, জানে সে জন।
অন্যজন বৃথা কেন তাহারে বুঝাতে চায় ॥ ১ ॥

৪১৩. সিন্ধু কাপী ॥ একতালা ॥ গী. র. ১০৯

ওরে তোরে দেখিতে নয়ন পাগল কেন। (প্রাণ)
এই বোধ হয় মোর জান কি গুণ।
যদি নিরন্তর দেখি, তৃষাহীন নহে আখি।
না দেখিলে দেখ দেখি, কি দুঃখী প্রাণ ॥ ১ ॥

৪১৪. সিন্ধু কাপী ॥ একতালা ॥ গী. র. ১০৯

সুধামুখি! তোমার নয়ন অমিয় বরিষে।
কটাক্ষে জীবন পায় বিরহ বিষে ॥
কেমন কুরঙ্গ আখি, কত রঙ্গ করে দেখি।
কখন হানয়ে বাণ, কখন তোষে ॥ ১ ॥

৪১৫. সিন্ধু কাপী ॥ একতালা ॥ গী. র. ১০৯-১১০

তুমি আর বোলো না আমারে,
তুমি লো আমার।
তোমাব হইলে তুমি,

হইতে আমার ॥
তবে নাহি জ্বলাইতে,
উচিত ইহার।
অধীনী জনের সহ,
এরূপ ব্যবহার।
কে কোথায় করে বল,
দেখহ কাহার ॥ ১ ॥

৪১৬. সিন্ধু কাপী ॥ একতালা ॥ গী. র. ১১০

আমি আর পারি না সাধিতে এমন করিয়ে।
কত মত কহিলেম মিনতি করিয়ে ॥
তাহার কি করি বল, না শুনে শুনিয়ে।
যত দুঃখ মোব সখি তাহার লাগিয়ে ॥
বৃথায় কি ফল বল সে কথা কহিয়ে ॥ ১ ॥

৪১৭. কাপী কোকব ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১১০

পিরীতে এই ত লাভ হইল আমারে।
নয়ন সহ জীবন অনল অন্তরে ॥
এমন হইবে আগে জানিলে কে করে ?
লোক লাজ কুলভয় রহিল কোথারে ?
নিদ্রা হিংসা করি গেল দেখিয়ে চিন্তারে ॥১॥

৪১৮. কাপী কোকব। গী. র. ১১০

তুমি কি আমারে ত্যজি পার হে রহিতে ?
ওষ্ঠাগত প্রাণ হয় যাহারে দেখিতে ॥
না দেখিয়ে মোর মুখ বাঁচিবে কেমতে ?
তব মন ধন প্রাণ আমার হাতেতে ॥
আমারে বিরস করি, রবে কি সুখেতে ? ॥১॥

৪১৯. গারা কাপী ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ১১১

প্রাণ সেই সে রসিক, যে সুখ সাগরে সদা বিহরে।
দুখ অভিমানী দেখ যার অনাদরে ॥
পিরীতি পরম সুখ যাহার বিচারে।
সদা সুধারস পান সেই জন করে ॥
বিরস কখন নহে, হরিষ অন্তরে ॥১॥

৪২০. গারা কাপী ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ১১১

প্রাণ ! চাহ লো প্রিয়সি, কমলনয়নে অধীন জনে।
মান ত্যজ ! হাস প্রাণ বিধুবদনে ॥
বিচ্ছেদ দুঃখেতে দুঃখী নাহি কদাচনে,
পলক হেরিলে পুনঃ সুখী হই মনে।
ইহাতে বিরস হলে বাঁচিব কেমনে ॥১॥

৪২১. কাপী জয়জয়ন্তী ॥ একতালা ॥ গী. র. ১১১

মধুকর তব প্রাণ কমলিনী (কমলিনি)
বিরস বদন, করো না কখন, শুন লো বচন।
প্রাণের অধিক তোমারে জানি ॥
হৃদয় কমল, নহে প্রফুল্ল,
নয়ন সজল, নিরখি ধনি ॥
এই রূপ দেখে, যদি হই সুখী, ইহাতে ক্ষতি কি ?
হরষিত হও, লো বিনোদিনি ॥ ১ ॥

৪২২. কাপী জয়জয়ন্তী ॥ একতালা ॥ গী. র. ১১১-১১২

কমলিনী (কমলিনি) তব প্রাণ মধুকর।
শুন হে ভ্রমর, এবে এই কর, নয়ন অন্তর,
হইও না, বাসনা এই মোর ॥

বিরহ অনল, না হেরি প্রবল,
ইহাতে হে বল, কে না কাতর ॥
মানেতে কত, কহি অনুচিত, হইও না ভাবিত।
চকোরি (চকোরী) কি ত্যজে শশধর ॥ ১ ॥

৪২৩. কাপী পলাশ ॥ তালহরি ॥ গী. র. ১১২

নয়নে নয়ন আলিঙ্গণ মনে মনে মিলিল।
দেখিতে অন্তর, নহে সে অন্তর, অন্তরে অন্তর পসিল।(পশিল) ॥
উভয়ের প্রেমাগুণে, বাঁধা গেল দুই জনে।
ভাবের অভাব, নাহি এত ভাব,
স্বভাবে সভাব (স্বভাব) মজিল ॥ ১ ॥

৪২৪. কাপী পলাশ ॥ তালহরি ॥ গী. র. ১১২

পিরীতি প্রতি রয় মতি অতিশয় বাসনা।
এ রতন নিধি, পাইলাম যদি, হে বিধি !
বিবাদি (বিবাদী) হৈও না ॥
লাজ ভয় ক্রোধ আদি, হয় নিবৃত্তির বাদি (বাদী)
দুই হয় এক, সদা দেখ এক, অধিক কি সুখ দেখ না ॥ ১ ॥

৪২৫. লুম কাপী ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী র ১১২-১১৩

হউক হে হউক, প্রাণ যায় যাউক, আমার খেদ নাহি তাহাতে।
তোমারে পাইলেম যদি, কি করি লাজেতে ?
লোকে বলে কলঙ্কিনী হইল কুলেতে।
আমি বলি, এত দিনে আইলেম কূলেতে ॥ ১ ॥

৪২৬. লুম ॥ তালহরি ॥ গী. র. ১১৩

জেনেছি সখি তাহারে, যেমন যতন তারো মোরে।
অঙ্গ জ্বর জ্বর, সদা কাতর, দেখিতে হইল সাধরে।
একথা কহিব কারে ॥ ১ ॥

৪২৭. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৩

প্রাণ তুমি বুঝিলে না আমার বাসনা।
ওই খেদে মরি আমি, তুমি তা বুঝ না ॥
হৃদয় সরোজে থাক, মোর দুঃখ নাহি দেখ।
প্রাণ গেলে সদয়েতে, কি গুণ বল না ॥ ১ ॥

৪২৮. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৩

হেরিতে হেরিতে পথ কাতর আঁখি। সই।
একবার এই হয়, চারিদিকে দেখি ॥
কবে হবে সে সুদিন, মন পুরে পাব মন,
আশা নিষেধ না মানে, ইহাতে অসুখী ॥ ১ ॥

৪২৯. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৩-১১৪

এই আসে আসে বলে যামিনী গেল।
দেখ, নলিনীর সখা উদয় হইল ॥
মনের বাসনা এক,
হলো আর বুঝে দেখ।
প্রভাতে চকোরী সুধা পাবে কেন বল ॥ ১ ॥

৪৩০ খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৪

যেন ঘন হতে বাহির হতেছে শশী।
নিরন্তর ওই রূপ দেখি দিবানিশি ॥
অমিয় সমান স্বর,
ইথে বুঝি শশধর,
মৃগআঁখি শোভা তায়, সৌদামিনী হাসি ॥ ১ ॥

৪৩১. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৪

কেশ ফাঁসি গলে দিলে, প্রাণ, হাসিতে হাসিতে
তোমার বদন শশী হেরিতে হেরিতে ॥

ভুরু শক্র শরাসন, অনঙ্গ হয়েছে গুণ,
অস্থির তব নয়ন বাণেতে বাণেতে ॥ ১ ॥

৪৩২. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৪

তুমি যারে জান লো আপন।
সে জেনো নিতান্ত তব, কভু নহে আন ॥
ইহাতে সন্দেহ তুমি করো না হে প্রাণ।
যে যারে যে মত ভাবে, সে ভাবে তেমন ॥ ১ ॥
সুজনে সুজনে সুখ হয়ত বিধান।
সুজনে কুজনে সুখ না হয় কথন ॥২॥

৪৩৩. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৪-১৫

প্রাণ! তোমার বিনয়ে কে আর ভুলিবে।
তোমার পিরীতে সদা জ্বলিতে হইবে।
তোমার এভাবে ভাব কেমনে রহিবে।
তুমি হে চঞ্চল অতি বুঝে না বুঝিবে ॥ ১ ॥

৪৩৪. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৫

আর আমি কাহারে কহিব আপন।
জানিয়া না জান যদি শুন হে প্রাণ ॥
যে রূপ যতন মোর তোমার কারণ,
কহিতে সে সব দুঃখ বিদরে পাষাণ ॥ ১ ॥
তোমার অধিক আর কি আছে রতন।
তোমারে ভুলিয়া তাতে মজাইব মন ॥ ২ ॥

৪৩৫. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৫

বলনা, কেমনে রহিব সই নাথ বিহনে।
রাত্রিদিন মোর, অন্তর নিরন্তর, কাতর তাহার কারণে ॥

অতি সুখ লাভে পিরীত করি,
দেখনা, এখন বিরহে মরি ॥
আগে কি জানিব, পরাণ হারাব, দহিব দুঃখ দহনে ॥২॥
যদি মনে করি, ত্যজিব তারে ।
বিরহে দ্বিগুণ দহন করে ॥
কামিনী সরলে, প্রেম রস ছলে, ভুলালে সুধা বচনে ॥৩॥

৪৩৬. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৫
পিরীতি এমন, কেমনে সই আগে জানিব ।
জানিলে এ প্রেম, নাহি করিতাম, পরাণ কেন হারাব ?
যতনে যাহারে সঁপিলাম প্রাণ,
দেখিতে তাহারে, হইল সাধেরে, কাহারে দুঃখ কহিব ? ১॥
যদি মনে ধৈরজ ধরিয়ে থাকি,
করয়ে রোদন সঘনে আখি ।
অঙ্গ আপনার বশ হলো তার, কাহার আমি হইব ॥২॥

৪৩৭. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৬
কে বলে সখী (সখি) সরোজে শশী নাহি পিরীত ?
তার চাঁদ মুখ নিরখিলে দেখ,
হৃদয় কমল হয় বিকসিত ॥
তপনে কমলে প্রীত, এ নিয়ম অনুচিত ।
অরুণ নয়ন, হেরে তবে কেন, হৃদয় কমল হয় মুদিত ? ১ ॥

৪৩৮. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৬
ওই দেখ সই, নাথ তোমার আছে দাঁড়াইয়ে ।
যাহার কারণ, কিবা রাত্রিদিন দহিতে, দেখ না আসিয়ে ॥
কই, কই বলে ধনি, (ধনী) বাহির হইল শুনি,
প্রফুল্ল বদন, হরষিত মন, অমিমিখে রহিল চাহিয়ে ॥১॥

৪৩৯ খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৬

শুনলো সই ! এখন কহিলে কি হবে ?
করেছি যে কাজ, তাহার উপায় কি হবে ?
বটে লো বিরহানলে জ্বলয়ে পরাণ।
দুঃখ ত্যজিবারে মন হয় লো কখন ॥
হেরি দুঃখ যায় সুখ, কে জানে ভুলাবে ? ১॥
লাজ ভয় সব যায় প্রথম মিলনে।
মিলিলে পিরীত হয় কত খেদ মনে ॥
ইথে যদি নাহি চেত তুমি কি করিবে ॥২॥

৪৪০. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৬-১৭

বিরহেতে মরি হে বিধি, অনুকূল হইও।
পঞ্চভূত পঞ্চস্থানে নিযুক্ত করিও ॥
যে আকাশে বাস তার, আকাশের ভাগ মোর
.এবে সে এই বাসনা, তাহাতে মিলায়ো ॥১॥
পবন তার ব্যজনে, তেজ মিশুক দর্পণে,
জলে সেই জলে রেখো তার ব্যাভারিত ॥২॥
পদ বিহরণ যথা, পৃথ্বী অংশ রেখো তথা।
ইহার অধিক আর যে হয় বুঝিও ॥৩॥

৪৪১. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৭

আমি দুঃখী হলে যদি তুমি সুখী হয়ো।
তথাপি আমা হইতে সুখের উদয়ো ॥
দুখের উপরে সুখ, যার দুঃখ তার সুখ।
একে দুঃখি (দুখী) আরে সুখী, কেমনে বুঝায়ো ॥১॥

৪৪২. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৭

সদা সুখে থাকহে প্রাণ আমার বাসনা।
আমার কারনে তুমি ভেবো না, ভেবো না॥
তোমরা কি ক্ষতি, আমি পাইলে যাতনা।
বুঝিলে আমার দুঃখ কখন হতো না॥১॥

৪৪৩. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৭

অতি সাধ ছিল হে প্রাণ আমার হইবে।
কে জানে, চাতুরী করি সতত জ্বালাবে?
আগে কি জানিব আমি এমন করিবে?
আমার হৃদয়ে থাকি আমারে ভুলাবে?॥১॥

৪৪৪. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৭-১১৮

মান তাপে তাপিত প্রাণ ছিলাম হে নাথ।
সমাদর কে করিবে, কুসঙ্গে মোহিত॥
মান ভরে কে কাহারে আদর করিত?
ইথে মন ভার এত করা কি উচিত?॥১॥

৪৪৫. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৮

জানিলাম, প্রেম প্রিয় আমার যেমন।
তোমার হে হয় তারে, কর সদা জ্বালাতন॥
নীর হুতাশনে তব আছে দুই গুণ।
আমি হুতাশনে জ্বলি, জল কোথা এখন॥১॥

৪৪৬. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৮

হইলাম তব বশ যা কর এখন।
বাঁচালে বাঁচাতে পার, বধ কে করে বারণ॥
আপনার বশ আমি নহি ত এখন।
যতন করিয়ে প্রেম করেছি এখন॥১॥

৪৪৭. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৮

তুমি যা বলিলে, তা না, না, না রে।
যেরূপ তোমারে আমি ভাবি হে অন্তরে,
তুমি তা জান না, না, না রে ॥
এমন বচন প্রাণ কখন বোলো না।
যেরূপ খেদ ইহাতে বুঝাতে না পারি।
বুঝিয়ে বুঝ না না রে ॥১॥

৪৪৮. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৮

একি ঝকঝকি রাত্রিদিন ! বুঝিলে বুঝে না।
তোমা হতে আর কারে আমার ভাবনা ॥
অমীয় (অমিয়) ত্যজিয়ে বিষ খায় কে বল না।
আমার অমীয় (অমিয়) পানে নাহি কি বাসনা ? ॥১॥

৪৪৯. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৯

গোস্যা করো নাহে প্রাণ, আমার কি দোষ ?
গুরুজন ভয়ে মরি, তুমি কর রোষ ॥
পরাণ কাতর হয় দেখিলে বিরস।
তুমি ইহা নাহি বুঝ, খেদ হে অশেষ ॥১॥

৪৫০. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৯

খেদ উপজে সই এই সে কারণে।
আশার ভরসা জন কথা নাহি শুনে ॥
কাতর্‌ কখন নহি লোকের বচনে
প্রাণ যায়, নাহি ভয়, বুঝে দেখ মনে ॥১॥

৪৫১. খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৯

যার রীতে রত আমি, আমার সে রীত ।।
ইহাতে সকল কেন ভাব বিপরীত ।।
সুজন কু সমিভ্যারে ।
নিজগুণ নাশকরে ।
বিষধরে সুধা বিষ, হয় নিয়মিত ।।১।।

৪৫২, জয়জয়ন্তী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৯

কহনে না যায় সখী (সখি) তার কত গুণ ।
রাত্রি দিন প্রাণ প্রাণ কবে যাবে মন ।।
হরিষে বিষাদে দুই বিচ্ছেদ মলিন ।
দুয়ের বাহিরে রাখে, সে জন এমন ।।১।।

৪৫৩. জয়জয়ন্তী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১১৯-১২০

আগে কি জানি সই এমন হবে ?
নয়নে নয়নে মিলে মনেরে মজাবে ?
আকিঞ্চার (আকাঙ্খার) ভার প্রাণ কতেক সহিবে
যাতনা পাইলে ওলো সেও ত ত্যজিবে ।।১।।

৪৫৪. জয়জয়ন্তী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২০

শয়নে শীতল থাকি শুন ওলো সখি ।
চেতনে সলিলে ভাসি, ঝুরে ওলো আঁখি ।।
পিরীতি করিলে লাভ হয় লো এই কি ।
সদা দুঃখে দহে মন, কদাচিতে সুখী ।।১।।

৪৫৫. জয়জয়ন্তী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২০

সতত যতন আমি করি হে যেমন। প্রাণ।
তুমি কি কখন ভাব আমার কারণ?
জীবন যৌবন সুখ, সব অকারণ।
বিনে দরশন তব ও বিধুবদন ॥১॥

৪৫৬. জয়জয়ন্তী ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২০

পিরীতি সুখের লোভে মজে হে যে জন (প্রাণ)
সে হয় কেবল দেখ দুখের ভাজন ॥
বিচ্ছেদ মিলন আশে থাকয়ে জীবন।
মিলনে ভাবনা পুনঃ বিচ্ছেদ কারণ ॥১॥

৪৫৭. পরজ ॥ তালহরি ॥ গী. র. ১২০-২১

পড়িলাম আমি তার নয়ন জালেতে।
কেশ শেষ ফাঁসি তাহে দিয়েছে গলেতে ॥
যদি প্রাণ পণ করি, চাহি পলাইতে।
যাইতে না দেয় তার ঈষদ হাসিতে ॥১॥

৪৫৮. পরজ তালহরি ॥ গী. র. ১২১

শুন সই মোর মন মজিল, এখন কি করি।
পশ্চিমে অরুণোদয়, (হ'লে) পাসরিতে নারি ॥
কুলশীল অভিমান, ত্যজিয়ে হলেম অধীন,
লোকের কথাতে, পারি কি ত্যজিতে, ত্যজিলে তখন মরি ॥১॥

৪৫৯. পরজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২১

কখন রে প্রাণ ভাব না আমি তোমার।
হৃদয় সরোজাসনে করিয়ে যতন,
তোমারে রেখেছি প্রাণ দেখি নিরন্তর ॥

দেখিতে দেখিতে দেখ, অনিমিখ হয় আঁখি, সুখ হে অপার।
পিরীতে মন মিশ্রিত, জানহ তাহা ত।
সে মান উদয় হলে উভয়ে কাতর ॥১॥

৪৬০. পরজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২১

কেমনে রে প্রাণ বুঝাব, যেমন আমার মন।
জেনে যদি না জানিবে, কে জানাতে পারে?
বিষম হইল মোরে, করি কি এখন?
মোর মনে নিরন্তর, প্রাণ তুমি বাস কর, না জান কেমন?
মন জ্বলয়ে যখন, তুমি নাহি জ্বল,
জ্বলিলে বুঝিতে তবে আমি হে যেমন ॥১॥

৪৬১. পরজ ॥ জলদ তেতালা (গীত রত্ন ॥ ২য় সং ॥ ১২২ পৃষ্ঠা।)

আমারে কিছু বল না সই।
মন মোর তার বশ হল ॥*
লোক লাজ, কুলভয় কোথায় রহিল ॥
পিরীতি সুখের নিধি, অনুকূলে দিল বিধি।
যে যতনে যায় প্রাণ, সেহ বরং ভাল ॥১॥

৪৬২. পরজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২২

কেন লো প্রাণ! নয়নে অরুণ উদয়?
তপন সবারে দহে, না দহে কমলে।
তব আঁখি রবি হৃদি কমলে জ্বলায় ॥
তব কেশ ঘন ঘন, শীতল করিত মন, এখন তা নয়।
আজু ফণি (ফণী) ময় হেরি, কাতর পরাণ,
নিকট না হতে পারি, দংশে পাছে ভয় ॥

* আমারে কিছু বল না সই (গী. র. ১ম এবং ৩য় সং, পৃঃ১১২)

৪৬৩. পরজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২২

দেখিবে আপন মত আপন জনে। প্রাণ।
না বুঝিলে তব মত, মতাধীন হবে কেনে ?
দৈবের ঘটনা যাহা, বল, কে খণ্ডিবে তাহা ?
কমলে কণ্টক আছে, মধুকর তা কি মানে ? ।।১।।

৪৬৪. পরজ ॥ জলদ তেতালা ॥ ১২২-২৩

দেখিতে দেখিতে কোথা লুকাইল ওলো সখী। (সখি)
আঁখি পালটীতে পুনঃ, তারে আর নাহি দেখি ।।
ক্ষণে দরশনে আঁখি, কদাচিত নহে সুখী,
তৃষা অতিশয় হয়, মনে বুঝে দেখ দেখি ।।১।।

৪৬৫. পরজ ।। জলদ তেতালা ।। গী. র. ১২২-২৩

দেখিতে দেখিতে তোরে অনিমিখ হয় আঁখি।
বুঝাতে না পারি দেখ, হই আমি কত সুখী ।।
ভাবনা রহিত মন, আমার হয় তখন।
মনপুরে মহানন্দ , আর কিছু নাহি দেখি ।।১।।

৪৬৬. পরজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২৩

এমন কোরো না প্রাণ অধিনী জনেব সহ।
নিতান্ত যে হোলো তব, তারে মিছে কেন দহ ॥
অধীনে সদয় থাক, নিদয় হইলে দুঃখ।
এ দুঃখ মোচন করে, কোন জন আছে কেহ ॥ ১ ॥

৪৬৭. হামির ।। তালহরি ।। গী. র. ১২৩

তাহারে কি ভুলিতে পারি ?
যারে আমি সঁপিলাম মনঃ !
দেখিতে যার বদন, অতি কাতর নয়ন।
শুনিতে বচন সুধা শ্রবণ তেমন ॥

দেখিলাম কত মত, নাহি দেখি তার মত, সে জন এমন।
যদি তার বিরহেতে, সতত হয় জ্বলিতে,
জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্ব্বাণ কখন ॥ ১ ॥

৪৬৮. হামির ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২৩-১২৪

কুরঙ্গ নয়ন কি রঙ্গ করিল।
সে রঙ্গ প্রসঙ্গে কত রঙ্গ উপজিল ॥
কখন খঞ্জন, কর দরশন, বদন কমল।
হেরিতে হৃদি পুলক, কহিতে অধিক সুখ।
কখন চকোর, সহ শশধর, কমলে কমল ॥১॥

৪৬৯. হামির-খাম্বাজ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২৪

নয়ন আপন যদি তবে আর কে ভিন?
না দেখিলে তার মুখ, নিজ জীবনে দহিছে মম জীবন ॥
তার সময় অসময়, বুঝিতে উচিত হয়,
মন বুঝাইলে বুঝে, আঁখি মরেন,
তিলেক না হলে লোকন।

৪৭০. ধানেশ্রী পূরিয়া ॥ জলদ তেতলা ॥ গী. র. ১২৪

আমারে বলে সই মোহিনী, আপনারে বলে না মোহন।
যদি কদাচিত, দেখয়ে ভাবিত, কহে কত মত, সাবধান মোর মন
হরিল আমার মন, নাহি কহে সে বচন, কেবল আপন।
তার সুখে সুখী, আমি দুঃখে দুঃখী, তাহা কখন কি,
শুনিতে পায় শ্রবণ? ॥১।

৪৭১. মোলতানি ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২৪-১২৫

আমি তো তাহারি সই, যে জানে আমার মন
অযতনে কে কোথায় কারে সঁপে প্রাণ ॥

মন রাখিবারে মন, করে এক মন,
মনেতে মনেতে তবে হয় লো মিলন ॥ ১ ॥

৪৭২. মোলতানি ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২৫

তাহার কারণে কেন দহে মোর মন।
যেরূপ তাহারে আমি করিহে যতন ॥
সতত চাতুরী সখী (সখি) করে সেই জন।
সে বরং ছিল ভাল, না ছিল মিলন ॥
মিলয়ে এই সে হলো, সদা জ্বালাতন ॥ ১ ॥

৪৭৩. মোলতানি ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২৫

অরুণ বরুণ (বরণ) আঁখি বিধুমুখি কেন ?
এ রূপ তোমার, হেরিয়ে চকোর করিছে রোদন ॥
এলায়েছ কেশ ঘন, বহে নিশ্বাস পবন।
বাক্য সুধাদান, করিয়ে এখন, বাঁচাও জীবন ॥১॥

৪৭৪. মোলতানি ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২৫

নয়ননীরে কি নিবে মনের অনল ?
সাগরে প্রবেশি যদি, না হয় শীতল ॥
তৃষায় চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি হেবে।
ধারাজল বিনে তার সকলি বিফল ॥ ১ ॥
যবে তারে হেরি সখী (সখি), হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিবে জানি অনল প্রবল ॥ ২ ॥

৪৭৫. মোলতানি ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৫৯-১২৬

পিরীতের গুণ কি কহিব তোমারে।
শুনিলে বিস্ময় হয় শরীর সিহরে (শিহরে) ॥
প্রেম ডোরে বদ্ধ জন ভ্রময়ে অন্তরে।
এ গুণে যে বান্ধা নহে, নহে সে অন্তরে ॥ ১ ॥

৪৭৬, মোলতানি ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২৬

আমার মন তোমার কারণ যেমন প্রাণ, সেই মন জানে।
দিবে নিশি থাকি আমি তোমার ধিয়ানে ।।
তুমি তাহা নাহি জান, এই খেদ মনে।
মনের আকার যদি না বুঝ বচনে।
আর কি সদৃশ আছে, বুঝাব সে গুণে ? ১'।

৪৭৭. মোলতানি ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২৬

মৃগময়নি ! তুমি ভাবিতেছ কেন এত ?
প্রফুল্লবদনি তুমি, আজি কেন বিষাদিত ?
হেরিয়ে তোমার মুখ, বিদরে আমার বুক।
বাঁচাও জীবন ওলো, হয়ে প্রাণ হরষিত ।।১।।

৪৭৮. মোলতানি ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১২৬

অনেকের প্রাণ হে তুমি মধুকর।
কেমনে বলিব তুমি কেবল আমার ?
আর কি বলিব প্রাণ, শরীর তোমার।
রাখিতে তোমার আছে, না রাখ তোমার ।।১।।

৪৭৯. মোলতানি ॥ তালহরি ॥ (গী. র. ৩য় সং। ১২৬-২৭)

তুমি কি রাজা হলে, প্রাণ, আমার দেশেতে ?
তব মতে মত কেন হয় হে করিতে ?
ভুলে যদি করি ক্রোধ, করিতে হয় অনুরোধ,
হইয়ে কাতর আর, হয় হে সাধিতে ।।১।।
খেদ উপজিলে মনে, হেরি না হে নয়নে।
দেখিলে নয়ন মন ভাসয়ে সুখেতে ।।২।।

৪৮০. মোলতানি ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১২৭

বোধ না হইলে ভ্রম ঘুচিবে কেমনে ?
করিছ ক্রোধ, অবোধ অবলা বচনে ।।
বারণে অজ্ঞানে ভেদ না হয় কখনে ।
অঙ্কুশে উচিত হয় সুচিত দুজনে ।।১।।

৪৮১. মোলতানি ॥ একতালা ॥ গী. র. ১২৭

আমি কি তোমার অবশ কখন রে প্রাণ !
তবে যে বিরস দেখ, দুঃখে উপজয়ে মান ।।
তোমার, অলির রীত—একই সমান ।
আমার ওই রীত হলে করিতে সুরীত জ্ঞান ।।১।।

৪৮২. মোলতানি ॥ একতালা ॥ গী. র. ১২৭

তুমি কি আমার মনের বাসনা জান না ?
দিবে নিশি তোমা বিনে করি কি আর সাধনা ।।
কে দিলে শিখায়ে প্রাণ এমন মন্ত্রণা ।
নিতান্ত অধীনী জনে দিতে হয় কি যন্ত্রণা ।।১।।

৪৮৩. মোলতানি ॥ আড়া চৌতাল ॥ গী. র. ১২৭ ২৮

নিদয় ঋতুরাজন বিরহি (বিরহী) জনে ।
দেশ ত্যাগিলে সুখ নাহি কাননে ।।
অন্য অন্য রাজা যত, সকলের এই মত ।।১।।
এ-রাজার দূতগণ, এক এক শতজন,
মলয়া, কোকিল, ফুল, বান্ধে তিনগুণে ।।২।।

৪৮৪. মোলতানি পলাশ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২৮

হৃদয় নিবাসি (নিবাসী) জনে, না হের নয়নে প্রাণ !
চঞ্চল চিত্ত কারণ, যাহার তরে উচিত হয়, অনুচিত মান

যে যারে আশ্রয় দেয়, সে তার সকলি সয়, এই ত বিধান।
আশ্রিত নির্দ্দোষ, তার প্রতি রোষ, এ কোন পৌরুষ, বল,
কর কি প্রমাণ? ১॥

৪৮৫. মোলতানি পলাশ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২৮

একের দুঃখ আরে বুঝিবে কেন। প্রাণ।
আপনার বশ যদি, না হলো আপন মন ।।
সাধ্য সাধকতা জ্ঞান আছে যত দিন।
দুই জ্ঞানে সুখ দুখ হয় হে নিতান্ত যেন ।।১॥

৪৮৬. গৌড় ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২৮-২৯

আমারে কি হল, সই, ওলো ধর ধর!
বিরহ বাতাসে, যখন হুতাশে, অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
পিরীতে বিমল সুখ, বিচ্ছেদে তেমতি দুঃখ ॥
সুখ আশ করি, এখন যে মরি।
তনু হলো জ্বর জ্বর ॥ ১

৪৮৭. গৌড় ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২৯

তুমি যা বুঝিলে প্রাণ সেই ভাল ভাল।
আমার বচন স্বরূপ কখন বোধ নাহি হ'ল হ'ল ॥
এতেক করি যতন, তবু না পাইলেম মন,
আপনারি মন, দিয়াছি যখন, উপায় কি বল বল ॥১

৪৮৮. গৌড় মল্লার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২৯

কিসুখ দেখ না ঘন গরজে বরষে।
শরীর উল্লাস মোর, পরশে পরশে ॥
ভেকে বাজাইছে ভেরি, (ভেরী), সমীরণ বীণাধারী,
চাতকী আলাপে পিউ মনের হরিষে ॥১॥

৪৮৯. ভূপালী কল্যাণ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১২৯

দেখ সখি ! আইল দহিতে প্রবল বসন্ত ।
বরিষে নয়ন, হৃদে হুতাশন, ঘন শ্বাস পবন, বিনে প্রাণকান্ত ॥
বিষম মলয়া বায়, কুসুম কুসুম তায়,
কুটিল কোকিল, কু রব করিল, কালবরণ এ কাল,
বুঝলো নিতান্ত ॥

৪৯০. ভূপালী কল্যাণ । জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩০

মনোরঞ্জনে হে বিধি সদা সুখে রাখ ।
কখন না হয়, জানিও নিশ্চয়, দেখিতে দুঃখের মুখ ॥
মন মোর তার বশ, হয় এই অভিলাষ ।
চিন্তানদী পার, বাস হয় মোর, কি সুখ ইহার অধিক ॥১

৪৯১. ভূপালী কল্যাণ ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩০

মনে করি, বারে বারে, নাহিক হেরিব তারে,
তার সনে আলাপের নাহি কোন গুণ ।
হেরিলে সে ভাব আর, না থাকে অন্তরে মোর,
পুলকে নয়ন, রসনা কহিতে চায়, শুনিতে শ্রবণ ॥
মম হৃদি কম্প হয়, মনেতে কত উদয়, না যায় কহনে ।
যদি কোন কথা কয়, উত্তর না করি তায়,
উপজয়ে মান, নয়নে অন্তরে হয় করিতে রোদন ॥১॥

৪৯২. দেশকার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩০

উদয় সুখতারা, আমার নয়ন তারা, তার পথ নিরখিয়ে ।
কারণ না জানি আমি, আছি কি রসে ভুলিয়ে ॥
নিশি হয় অবসান, যেরূপ করিছে প্রাণ ।
কাহারে কহিল বল, তাহারে কে কবে গিয়ে ॥১॥

৪৯৩. দেশকার ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩০-১৩১

আনন্দে ভর করি, দাঁড়াইয়ে সুন্দরী হেরিতে মনোরঞ্জনে।
নয়নে মন সংযোগ, নাহিক ভয় গঞ্জনে ॥
প্রতি অঙ্গ পুলকিত, মুখপদ্ম প্রফুল্লিত,
স্থির করি আছে দেখ, দুই নয়ন খঞ্জনে ॥,

৪৯৪. সুরট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩১

তব আগমন শুনি, হে প্রাণ ! নিরখিছিলাম পথ।
এই এসে এসে বলি, চিত অতি চঞ্চলিত।
তোমারে হেরিয়ে আমি, হইলেম সুখী এত।
শূন্য দেহে এল প্রাণ, অধিক কহিব কত ॥১॥

৪৯৫. সুরট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩১

কেবল আশয়ে আছে প্রাণ, না বহিত নহিলে। (রে)
প্রাণ গেলে ভাল হতো, নাহি গুণ থাকিলে ॥
বিচ্ছেদ শমন সম, তার ভয়ে প্রাণ মম।
কাতর হইয়ে ভ্রমে, হৃদয়, কমলে ॥১॥
যদি সে নিরাশা করে, তবে দুঃখ যায় দূরে।
যার প্রাণ, সেই ভাল, প্রাণ দান করিলে ॥২॥

৪৯৬. সুরট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩১

প্রিয় দরশন হইলে অধিক সুখ কি আর।
চকোরীর সুধালাভ, চাতকীর জলধর ॥
মণিরে পাইয়ে কত, সুখী হয় বিষধর।
যামিনীর অতি শোভা, উদয়েতে শশধর ॥১॥

৪৯৭. সুরট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩১-১৩২

প্রেম মোর অতি প্রিয় হে।
তুমি আমারে তেজোনা ॥

যদি রাত্রিদিন, কর জ্বালাতন, ভাল সে যাতনা ॥
সমুহ (সমূহ) যাহার গুণ, কিঞ্চিত অগুণ ।
কি দোষ বলিব তার, কিবা অপগুণ ॥
তব গুণ কথা, কহিতে সর্বথা, হতেছে বাসনা ॥১॥
অন্য অন্য চিন্তা যত আমার আছিল ।
তব হুতাশনে তারা শবদাহ হল ॥
ইহার অধিক, আর কিবা সুখ, মনেতে বুঝনা ॥২॥

৪৯৮. সুরট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩২

তুমি যে নিদয় হবে, প্রাণ, কি লাভ তাহাতে । (হে ।)
সদয় হওনে ক্ষতি, বাসনা শুনিতে ॥
তৃষায় চাতক দেখ, নিরখয়ে ঘনমুখ ।
বারিদান কি অগুণ, গুণ কি দানেতে ॥১॥

৪৯৯. সুরট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩২

ও বিধুবদনি ধনি হের না নয়নে । (ওলো)
বধিলে কি লাজ তব অনুগত জনে ?
অনায়াসে চকোরে তুষিতে সুধাদানে ।
আজু শশী মান-মেঘ কিসের কারণে ? ॥১॥

৫০০. সুরট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩২

মিলন কি সুখময় হৃদয়ে উদয় হল ।
ধরিয়ে দুঃখের হাত, বিচ্ছেদ চলিল ॥
পিরীতের মত সুখ, মনে মনে বুঝে দেখ,
অপার অতুল হয় প্রেমরস ফল ॥

৫০১. সুরট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩২-১৩৩

ঘুচিল বিচ্ছেদ দুঃখ, হল সুখমিলন।
প্রেমরস পানে চিত হইল চেতন ॥
বিচ্ছেদ-তিমিরে মন, করেছিল আচ্ছাদন।
মিলন অরুণোদয় হইল এখন ॥১॥

৫০২. সুরট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী র ১৩৩

নয়ন রূপেতে ভুলে, মনো ভুলে গুণে।
ইহার অধিক কেহ শুনেছে শ্রবণে ?
গুণের আদর যত, রূপের না হয় তত।
রূপেতে গুণ সংযোগ, রতনে কাঞ্চনে ॥

৫০৩. সুরট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩৩

এতেক যতন করি, ভয় হয় মনে।
কখন কি দোষে পাছে ত্যজহ সুদিনে।*(সুদীনে)
বিরহেতে প্রাণ অন্ত, হইলে সদয় কান্ত,
বিচ্ছেদ অসির ছেদ, সহা যাবে কেনে ॥১॥

৫০৪. সুরট ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩৩

তারে এই কথা কহিও, সই, মোরে যেমন দেখিলে।
সদা তব নাম মুখে, ভাসে নয়ন সলিলে ॥
যদি মোর দুখ যায়, একবার দেখা দিলে।
ক্ষতি কি তোমার ইথে, অধীনে সদয় হলে ॥১॥

৫০৫. সুরট। জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩৩

সে কি না জানে সই মনের বাসনা ?
জানিয়ে দেখ না মোরে, মনে নাহি করে,
সদা দিতেছে যাতনা

আমার মত এমন, আছে আর কত জন, কে করে গণনা ?
আমি মরি তার তরে, সে ত নাহি হেরে,
তবু মন তো মানেনা ॥১॥

৫০৬. সুরট ॥ তালহরি ॥ গী. র. ১৩৪
এ কেমন রীতি প্রাণ,
নয়ন অন্তরে হয় অন্তরে অন্তর।
এই আসি, বলে গেল,
আলে এত দিন পর ॥
আশায়ে আছিল প্রাণ,
তেঞিঃ হল দরশন।
তোমার সে আগমন,
মম মন আগোচর ॥১॥

৫০৭. সুরট ॥ তালহরি ॥ গী. র. ১৩৪
জানি নাথ, যাও হে, জানিলাম।
তোমার পিরীতে, নাথ, প্রাণ হারাইলাম ॥
অবলা সরল অতি, নাহি বুঝিলাম।
শঠের বিনয় বিষ পান করিলাম ॥১॥

৫০৮. সিন্ধু ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১৩৪
তব পথ চাহিয়ে চিত অতি চঞ্চলিত।
(৪১১ সংখ্যক গীত দ্রষ্টব্য) (গী. র. ১০৯)

৫০৯. সিন্ধু ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১৩৪-৩৫
তাহার কি দুঃখ সখী (সখি), যে দুঃখ আমার
যখন যেখানে থাকে, বোধ হয়, সেই তার ॥
আমি লো তাহার তরে যেরূপ কাতর।
সে যদি তেমন হত, কত সুখ মনে কর ॥১॥

২১০. সিন্ধু খাম্বাজ ॥ তলহরি ॥ গী. র. ১৩৫

আসিবে হে প্রাণ কেমনে এখানে।
ননদী দারুণ অতি, আছে সে সন্ধানে॥
রাখিতে পরাণ মোর, আমি নাহি পারি আর।
পিরীতে এই সে হ'লো সংশয় জীবনে ॥১॥
মদন বোদন করে, বিরস দেখিয়ে মোরে।
লাজ ভয় কাল সম দয়া নাহি জানে ॥২॥
নিদয় বিধাতা যারে, সদয় কে হয় তারে।
আমার উপায় ইথে হইবে কেমনে ॥৩॥
ধিক্ ধিক্ নারীগণে, মিলয়ে পুরুষ সনে।
কুল তেয়াগিতে নারে, মরে মন মানে ॥৪॥

২১১. সিন্ধু খাম্বাজ ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১৩৫

পিরীতি সমান নিধি কোথা আছে আর।
এ ধন যে পাইয়াছে, দুঃখ কি তাহার ?
লাজ ভয় কুল শীল, তাহার সকলি গেল।
মান অপমান সম ভাবে হে যাহার ॥১॥

২১২. সিন্ধু খাম্বাজ ॥ ঢিমে তেতালা ॥ গী. র. ১৩৫-৩৬

পিরীতি রতন নিধি পাইল যে জন।
তাহার মনের মত না হবে কখন ॥
দুঃখেরে করিয়ে কোলে, ভাসয়ে সুখ সলিলে ॥
অনল শীতল হয় তাহার তখন ॥১॥

২১৩. শঙ্করাভরণ ॥ তালহরি ॥ গী. র. ১৩৬

যে দিকে চাই, সেই দিকে পাই, দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে, ভুলালে নয়নে,
তোমার বিহনে, না দেখি কাহারে ॥

যখন থাকি শয়নে, তোমারে দেখি স্বপনে,
পুনঃ জাগরণে নয়নে নয়নে, থাকি সেই মনে,
কি হলো আমারে ॥১॥

৫১৪. শঙ্করাভরণ ॥ তালহরি ॥ গী. র. ১৩৬

শুন হে কহি, এই আমি চাহি, বলো না কাহারে।
আমার পরাণ, করিয়ে হরণ, রাখিয়াছে প্রাণ,
নয়ন ভিতরে ॥
যে যারে নয়নে রাখে, সে তারে সতত দেখে।
সন্দেহ ইহাতে, নাহি কদাচিতে, বুঝনা মনেতে
কি কব তোমারে ॥১।

৫১৫. আড়ানা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩৬-৩৭

চাতকীর তৃষা ঘন ঘন ঘন।
উচিত যে হয়, হইয়ে সদয়, কর বরিষণ ॥
আছয়ে কত জীবন, তাহাতে মম জীবন।
আমার জীবন, বিহনে জীবন, সুখী কি কখন ॥১॥

৫১৬. আড়ানা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩৭

বিচ্ছেদে যে ক্ষতি, তাহা অধিক মিলনে।
আখির কি আশা পূরে ক্ষণে দরশনে ?
প্রবল অনল দেখ, কিঞ্চিৎ জীবনে।
নির্ব্বাণ হইতে কেহ দেখেছ কখনে ॥১॥

৫১৭. আড়ানা ॥ জলদ তেতালা ॥ ১৩৭

হেরিলে চমক প্রাণ বিচ্ছেদ ভয়েতে।
না দেখিলে ঝুরে আখি মম বিরহেতে॥
বিষম হইল মোরে, একথা কহিব কারে।
ইহার উপায় বিধি বুঝ বিধিমতে ॥১॥

৫১৮. আড়ানা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩৭

নয়ন শীতল হয় দেখিলে যাহারে।
দেখ দেখি কত সাধ দেখিতে তাহারে ॥
চক্রবাক চক্রবাকী, দিবসে একত্র দেখি,
তাহার অধিক সুখী, বুঝিল (লো) বিচারে ॥১॥

৫১৯. আড়ানা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩৭

নলিনী হাসিয়ে কহিছে ভ্রমরে।
আমার যে ধন প্রাণ সঁপেছি তোমারে ॥
পলক যদি না দেখি, বিরহে ঝুরয়ে আঁখি,
দুঃখেতে উপজে মান, নহে সে অন্তরে ॥১॥

৫২০. আড়ানা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩৮

হে নাথ! মনের কথা তুমি জান।
যে হয় উচিত, করিবে তেমত,
তোমাতে বিদিত, আছয়ে কারণ ॥
মন সুখে থাকে যাতে, রাখ তারে সেই মতে,
এই নিবেদন।
গুণাগুণ মোর, করিলে বিচার,
তবে তো তোমার, হব মতাধীন ॥১॥

৫২১. আড়ানা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩৮

মেঘান্তে শশধর, মানান্তে তোমার বদন।
মেঘাচ্ছন্ন নিশাকর, হেরিলে চকোর,
কাতর যেমন সে, তব বিরসে মম মন ॥
তব অমিয় বচন, শুনিলে সুখী শ্রবণ
পুলকিত প্রাণ।

মানেতে মৌনা তুমি থাক লো যখন,
যেরূপ জ্বলয়ে প্রাণ, জানে প্রাণ,
সেই প্রাণ ॥১॥

৫২২. আড়ানা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩৮

প্রয়োজন তোমা ভিন্ন, আর প্রিয়োজন কোন ?
যাবৎ জীবন মোর, মন তাবৎ তোমার,
ধ্যান জ্ঞান যতন সাধন ॥
অধিক কহিব কত, আমি দেহ, তুমি প্রাণ,
তোমার সুখেতে সুখ প্রাণ ।
তোমার দুঃখেতে জ্বালাতন, সজল নয়ন ॥১॥

৫২৩. আড়ানা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৩৮-৩৯

জানি তোমার মুদ্রা,
হয় নয়, কর, নয় হয় ।
বল, আমি ভাল করি ॥
আইলে তোমারে দেখি, অরুণ করিয়ে আখি,
পোহাইয়ে বিভাবরী ॥
গণিতে গণিতে তারা, প্রকাশিল সুখ তারা,
আমার নয়ন তারা, সহিত বারি ।
প্রভাতে আসিয়ে কেন, করিতেছ জ্বালাতন,
যাও, ছিলে যার পুরী ॥১॥

৫২৪. আড়ানা ॥ তালহরি ॥ গী. র. ১৩৮

আগে কি জানি প্রাণ বিরহে যাবে । হে ।
জানিলে এমন পিরীতি করি কি তবে ॥
সুখের লাগিয়ে কুল মজিল, কলঙ্ক হ'লো ।
সে সব দূরেতে গেল, এ দুখে ডুবে ॥১॥

তাহার লাগিয়ে মরি, মিছে আপনার করি।
না হেরে নয়নে হেরি মনেতে এবে ॥২॥
পিরীতি সুখের নিধি করিয়ে এখন কাঁদি।
অবলা করেছে বিধি, সহিতে হবে ॥৩॥

৫২৫. আড়ানা ॥ তালহরি ॥ গী. র. ১৩৯

আমি কি তারে ত্যজিতে পারি?
দিবেনিশি সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান সেই ধন,
মন প্রাণ প্রাণ প্রাণ করি ॥
রোষান্বিত কদাচিত যদি তারে হেরি।
লোকের গঞ্জন ভয়, সে কি ভয় অতিশয়,
তার ভয়ে, ভয়ে ভয়ে ভয়ে মরি ॥১॥

৫২৬. আড়ানা ॥ তালহরি ॥ গী. র. ১৩৯-১৪০

তোমা বিনে কারে আর কহিব আপন দুঃখ। হে।
শুন শুন শুন প্রাণ, হেরিলে তব বদন,
প্রফুল্ল হয় তখন, মোর মুখ ॥
তুমি হে যেমন ভাব, আমি হে নিতান্ত তব,
কি কব, মনে বুঝে দেখ।
মোর চিত কদাচিত, কোথায় কি হয় রত,
তোমারে পাইলে যত হয় সুখ ॥১॥

৫২৭. আড়ানা ॥ তালহরি ॥ গী. র. ১৪০

অনেকেরে আশ্রয় দিয়াছ ও মৃগনয়নি।
রাহু ভয়ে মুখে শশী, ভালে দিনমণি ॥
আবার, খগবর ভয়ে ভীত হয়ে ফণী,
কেশে এসে হল বেণী ॥১॥

৫২৮. সাহানা-আড়ানা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র.১৪০

বিরহ যন্ত্রণা প্রাণ তুমি জানিবে কেমনে?
জানিলে কি আমি সদা থাকি হে রোদনে?
নানাস্থানী যেই জন, তার মন কি কখন, মজে কোন খানে?
তারে যে বা দেয় মন, সুখী কি কখনে ॥১॥

৫২৯. সাহানা-আড়ানা ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৪০

পিরীতি কি রীতি, প্রাণ, যে করেছে, সে জানে।
অরসিকে রসবোধ করিবে কি গুণে?
পরম সুখের নিধি, পিরীতি সৃজিল বিধি, জানিয়ে সুজনে।
এ রসে বিরস জনে, বুঝিবে কেমনে? ১ ॥

৫৩০. রাগসাগর ॥ জলদ তেতালা ॥ গী. র. ১৪১

এমন কল্যাণ কর বিধি,
প্রাণ নিধি না হয় নিদয় ॥
দিবেনিশি এই অভিলাষ,
থাকে সে সদয় ॥
কতমত যতনেতে, রতন পেলেম হাতে।
অতএব শুন, নয়নের অন্তর না হয় ॥১॥

টপ্পা সমাপ্ত ॥ গীতরত্ন ॥ ৩য় সং। ১৪০ পৃষ্ঠা ॥

গীতরত্ন, প্রথম সংস্করণ (১২৪৪) ১৪১ পৃষ্ঠাতে শেষ হয়েছে। শেষ গীত,—"এমন কল্যাণ কর বিধি প্রাণ নিধি না হয় নিদয়"—ইত্যাদি।

(**গীতরত্ন। ২য়, ৩য় সং**)

৫৩১. আখড়াই সঙ্গীত। প্রথম পাঠ। ভবানী বিষয়। বাগেশ্বরী ॥
গী. র. ১৪১

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরি, সদাশিবে শুভঙ্করি
নিরানন্দে আনন্দ দায়িনী। মা।
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা, অজ্ঞান বোধ সাকারা,
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্য রূপিনী ॥

প্রণতে প্রসন্না ভব, ভীম তব ভবার্ণব, ভয়ে ভীত,

ভবামি ভবানি।

কৃপাবোলকন করি, তরিবারে ভববারি,

পদতরি দেহি গো তারিণি ॥১॥

৫৩২. আখড়াই। প্রথম পাঠ। খেউড়। (বেহাগ) গী. র. ১৪১

মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল। (দেওরা রে)

তোমার সাধনা করি সাধ না পূরিল ॥

সাধিয়ে আপন কায, এখন বাড়িল লাজ।

আমার গেল সে লাজ, বিষাদ হইল ॥১॥

৫৩৩ আখড়াই। প্রথম পাঠ। প্রভাতী। ললিত ॥ গী. র. ১৪১

জামিনী কামিনী বশ হয় কি কখন। (দেওরা ওরে)

হ'লে কি ও বিধুমুখ হেরি হে মলিন ॥

নলিনী হাসিবে কেন, কুমুদী বিরসানন,

এ সুখে অসুখ তবে করে কি অরুণ ॥১॥

৫৩৪. আখড়াই। দ্বিতীয় পাঠ। ভবানী বিষয়। কামোদ।

গী. র. ১৪২

অপার মহিমা তব, উপমা কেমনে দিব,

নিরুপমা ত্রিকালবর্ত্তিনি। মা।

যক্ষরক্ষ সুরাসুর, গন্ধর্ব নর কিন্নর, চরাচর সর্ব্ব সচেতনি ॥

প্রকৃতি চতুর্বিংশতি, ভূতাশ্রমে অবস্থিতি,

মন যথা নিও গো আপনি।

এমন দুর্গম পার, তরিবারে শক্তি কার, নগরাজ কুলকুণ্ডলিনি ॥১॥

৫৩৫. আখড়াই। দ্বিতীয় পাঠ। খেউড়। বেহাগ ॥ গী. র. ১৪২

সাধের পিরিতি সুখে দুঃখ পাছে হয়। (দেওরা ওরে)

তুমি হে চঞ্চল অতি, সদা ওই ভয় ॥

গোপনে যতেক সুখ, প্রকাশে তত অসুখ।
ননদী দেখিলে পরে প্রণয় কি রয় ॥১॥

৫৩৬. আখড়াই। দ্বিতীয় পাঠ। প্রভাতী। ভৈরবী॥ গী. র. ১৪২
ছিল না মনেতে নিশি প্রভাত হইবে। (দেওরা ওরে।)
অরুণ কিরণ হৃদি কমল দহিবে॥
করিয়ে অতি যতন, যদি বা হ'ল মিলন,
চাহিয়ে কামিনী মুখ যামিনী কি রবে ॥১॥

৫৩৭. আখড়াই। তৃতীয় পাঠ। ভবানী বিষয়। মল্লার॥ গী. র. ১৪৩
শঙ্করি শৈলেন্দ্র সুতে, শশাঙ্ক শিখরাশ্চিতে,
সদাশিবে শিব প্রদায়িনী (নি)। মা।
ত্রৈলোক্য ত্রিতাপ হরা, তুমি আদ্যা পরাৎপরা,
তপনজ ভয় নিবারিণি॥
সৃজন পালন ক্ষয়, কটাক্ষেতে তব হয়, তত্ত্বময়ী ত্রিগুণ ধারিণি।
তোমা বিনে ত্রিভুবনে, কে আর তাপিত জনে,
ত্রাণ কর ওগো ত্রিনয়নি ॥১॥

৫৩৮. আখড়াই। তৃতীয় পাঠ। খেউড়। পরজ। গী র. ১৪৩
পিরীতি করিলে হয় এই কি করিতে। (দেওরা রে।)
ভুলায়ে বিনয়ছলে না হয় হেরিতে॥
চাঁদের পিরীতি দেখ কুমুদী সহিতে।
বিধু আসি দেখা দেয় না পারে রহিতে ॥১॥

৫৩৯. আখড়াই। তৃতীয় পাঠ। প্রভাতী খট্॥ গী. র. ১৪৩
অরুণ সহিত শশী আইলে প্রভাতে। (দেওরা ওরে)
অমিয় কোথায় তব চকোরী তুষিতে?
কি ভাবে মনে ভাবিয়ে, দেখা দিলে প্রাণ আসিয়ে,
আশায় নিরাশ হল তোমার আশাতে ॥১॥

৫৪০. আখড়াই। চতুর্থ পাঠ। ভবানীবিষয়। বাগেশ্বরী। গী. র. ১৪৪

অচিন্ত্যা চিন্তারূপিনী চিন্তাময়ী শবাসনী।
বিঘ্নরূপা চরমে তারিণী। মা।
সত্বরজতমগুণ, গুণত্রয় তব গুণ, গুণময়ী, গুণপ্রসবিনী॥
অনুপমা রূপ তব, সেরূপ স্বরূপ রূপ,
কোনরূপে সাদৃশ্য না জানি।
নখরে নিশাকর, পদতলে দিবাকর,
জ্ঞানরূপা আনন্দরূপিণি॥১॥

৫৪১. আখড়াই। চতুর্থ পাঠ। খেউড। খাম্বাজ॥ গী. র. ১৪৪

হইবে অনেক সুখ ছিল হে মনেতে। (দেওরা ওরে)
এখন সেরূপ ভাব না পাই দেখিতে॥
মন মত তব মন, জানিয়ে সঁপেছি মন।
সে মন এমন হয়, খেদ হে ইহাতে॥১॥

৫৪২. আখডাই চতুর্থ পাঠ। প্রভাতী॥ কালাংড়া॥ গী. ব. ১৪৪

সুখে দুঃখ দিয়ে নিশি প্রভাত হইল। (দেওরা ওরে)
অরুণ উদয়ে দহে হৃদয় কমল॥
কামিনী মুখ না চেয়ে, যামিনী শশীরে লয়ে,
দেখিতে দেখিতে দেখ, গমন কবিল॥১॥

৫৪৩. আখড়াই। পঞ্চম পাঠ। ভবানী বিষয়। বেহাগ॥ গী. ব. ১৪৫

পরমারাধিত দেব, দেবদেব মহাদেব,
দেবদেব মানব বন্দিনি। মা।
প্রণবা অজপা অনাহত, ক খ ভূ তেজো মরুত,
চরাচর সৃজন কারিনি॥
নিরাকারাকারাত্বয়ী, গুণাতীত গুণময়ী,
জ্ঞানরূপা গণেশ জননি।

অনাদি আনন্দময়ী, ত্বমেকা ত্রিগুণাশ্রয়ী,
সদানন্দে চৈতন্য দায়িনী ॥১॥

৫৪৪. আখড়াই। পঞ্চম পাঠ ॥ খেউড ॥ সুরট ॥ গী. র. ১৪৫

সাধে কি বারণ করি সতত আসিতে। (দেওরা ওরে)
কি করি, স্ববশ নহি ননদী ভয়েতে ॥
যত সুখ উপজয়ে গোপন পিরীতে।
জনরবে ততোধিক অসুখ মনেতে ॥ ১॥

৫৪৫. আখড়াই। পঞ্চম পাঠ। ॥ প্রভাতী ললিত ॥ গী. র. ১৪৫

আশা না পূরিতে কেন নিশি পোহাইল। (দেওরা ওরে)
কামিনী বধিতে ওই অরুণ আইল ॥
একে ত কুলের ভয়, যামিনী স্ববশ নয়,
সাধের মিলনে কেন বিষাদ হইল ॥১॥

৫৪৬. আখড়াই। ষষ্ঠ পাঠ। ভবানী বিষয় ॥ বাগেশ্বরী ॥ গী. র ১৪৬

শৈলেন্দ্রতনয়া শিবে, সদাশিবে প্রদাভবে,
সুধাংশুশেখর সীমন্তিনি। মা।
বিকল পতিত জনে, ত্রাহি তারা নিজগুণে,
দয়াময়ী প্রণতপালিনি ॥
আপনি কর্ম্মানুসারে, ভবে ভ্রমি বারে বারে,
শ্রমভবে কাতর তারিণি।
শিবদা অশিব হরা, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা,
সদানন্দে সুখপ্রদায়িনী ॥১॥

৫৪৭. আখড়াই। ষষ্ঠ পাঠ। খেউড ॥ খাম্বাজ ॥ গী. র. ১৪৬

অনেক যতনে হয় ক্ষণেক মিলন। (দেওরা ওরে)
ইথে কি মনের সাধ পূরয়ে কখন।

অতএব বলি আমি, হৃদয় নিবাসী তুমি,
নয়নে নয়নে থাক একান্ত মনন ॥১॥

৫৪৮. আখড়াই। ষষ্ঠ পাঠ। প্রভাতী ॥ ললিত ভৈরব ॥ গী. র. ১৪৬

যামিনী যে যায় প্রাণ রাখিব কেমনে ? (দেওরা ওরে)
হেরিয়ে অরুণ তব কমল নয়নে ॥
সে কামিনী কুমুদিনী, সুখে পোহালো রজনী,
আমি কমলিনী বুঝি করিলে না মনে ॥১॥

৫৪৯. আখড়াই। সপ্তম পাঠ। ভবানী বিষয় ॥ মালেশ্রী ॥ গী. র. ১৪৭

গিরি কি অচল হলে আনিতে উমারে ?
না হেরি তনয়ামুখ হৃদয় বিদরে ॥
ত্বরান্বিত হও গিরি, তোমার করেতে ধরি।
উমা, ও মা, বলে দেখ ডাকিছে আমারে ॥১॥

৫৫০. আখড়াই। সপ্তম পাঠ। খেউড ॥ খাম্বাজ ॥ গী. র. ১৪৭

এসুখে অসুখ কেন চাহবে করিতে ? (দেওরা ওরে)
মিলন হয়েছে দেখ কত যতনেতে ॥
বুঝিতে না পারি ভাব, মনে হয় কত ভাব,
সে ভাব হলো অভাব, ভাবিতে ভাবিতে ॥১॥

৫৫১, আখড়াই ॥ সপ্তম পাঠ। প্রভাতী ॥ ভৈরবী ॥ গী. র. ১১৭

ওই রে অরুণ এল কামিনী দহিতে। (দেওরা ওরে)
নিবারি শশীর শোভা কুমুদী সহিতে ॥
না হতে সুখের লেশ, রজনী হইল শেষ,
চকোরী চাঁদের আশা, ত্যজিল দুঃখেতে ॥১॥

৫৫২. ব্রহ্ম সঙ্গীত। বেহাগ ॥ তাল আড়া ॥ গী. র. ১৪৮

পরমব্রহ্ম ত্বং পরাৎপর পরমেশ্বর।

নিরঞ্জন নিরাময়, নির্বিশেষ সদাশ্রয়, আপনা আপনি হেতু,
বিভু বিশ্বধর ॥

সমুদয় পঞ্চ কোষ, জ্ঞানাজ্ঞান যথাবাস, প্রপঞ্চভূতাধিকার।

অন্নময় প্রাণময়, মানসবিজ্ঞানময়, শেষেতে আনন্দময়,
প্রাপ্ত সিদ্ধ নর ॥১॥

৫৫৩. শ্যামা বিষয়। ভৈরবী ॥ তাল হরি ॥ গী. র. ১৪৯

ক কারে আকার জ্বর, ছাড়ি লয়ে দীর্ঘীকার বল।

বিষয় জ্বরেতে, লেগেছে জ্বলিতে, ঔষধ ইহাতে এই হইল ॥

এ জ্বরে অরুচি হয়, ইহার এই উপায়, রুচি করি জ্ঞান কর।

মধুপান শিবের বচন এই ছিল ॥

আনন্দের নিবেদন, মন দিয়ে শুন মন, ভব নদী পার যদি হবে,
সার জ্ঞান কর,—হর যা বলিল ॥১॥

৫৫৪. শারদা। মাল কোষ বাহার ॥ তাল আড়া ॥ গী. র. ১৪৮-৪৯

শারদে বাণি ত্রিনয়নী বাক বাদিনী। এ মা।

শোভিত সরোজাসনে চরণ সরোজ,
নখচন্দ্র পদতলে হেরি দিনমণি

তিন গুণে যত্রেদেব, সহিত অমর সব, সদেবস্থ সদা বন্দিনি।

কুন্দ কুসুম গলে, অর্দ্ধ ইন্দু ভালে, বীণা করে,
ব্রহ্মময়ী বিদ্যা প্রদায়িনী ॥১॥

তেয়াগিয়ে পীতাম্বর, পরিধানা শ্বেতাম্বর, বরদা জড়তা হারিণি।

ঈশ্বরচন্দ্রে ঈশ্বরী, কৃপাবলোকন কুরু মাতা,
নিজগুণে শুন নারায়ণি ॥২॥

॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

॥ পরিশিষ্ট ॥

॥ রামনিধি গুপ্তের রচনা রূপে বিভিন্ন গীত সংকলনে উদ্ধৃত গীত সংগ্রহ ॥

১. সঙ্গীত কোষ ১৭ পৃ। প্রেমগাথা ও আদিরস সঙ্গীত। ২১ পৃ। ** রচয়িতা অজ্ঞাত ॥

অনুগত জনেরে প্রিয়ে কেন এত প্রবঞ্চনা ?
মারিলে মারিতে পার, কাটিলে কে করে মানা ?
অপরাধে করি পায়, যা কর, তা শোভা পায়,
বিনা অপরাধে বধ, এই কি তোমার বিবেচনা ?

২. গীতাবলী ১৩২ পৃঃ। সঙ্গীত মুক্তাবলী—দ্বিতীয় ভাগ। ৪৩ পৃঃ।

অনুগত দোষী হলে তার দোষ নাহি লয়।
মহতেরি এই রীত, আপন করিয়া লয় ॥
দেখ, মলয়াগিরি বেষ্টিত ভুজঙ্গ।
গরল সরল হয় মহতেরি সঙ্গে ॥
চাঁদে যে কলঙ্ক আছে, ছেড়ে কি উদয় হয় ॥

৩. গীতাবলী—১২৯ পৃঃ। সঙ্গীত কোষ—৩৩ পৃঃ। সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডার। ২১১ পৃঃ

অমর করেছ রে প্রাণ প্রেম সুধাদানে।
আর কি বধিতে পারে বিচ্ছেদেরি বাণে ?
যে করেছে প্রাণ অমৃত,
তার কি আর আছে মৃত ?
রাহু কেতু শীর্ণীকৃত, বেঁচে আছে প্রাণে প্রাণে।*

* সঙ্গীত কোষ, ৩৩ পৃষ্ঠাতে এই গীতটির নিম্ন লিখিত পাঠান্তর দৃষ্ট হয়

৪. পাঠান্তর, যথা : সিন্ধু ভৈরবী। মধ্যমান।

অমর করেছ আগে প্রেম সুধা দানে।
এখন কি বধিতে পার বিচ্ছেদের বাণে ?
পান করে যে প্রেমামৃত, তার কি আছয়ে মৃত ?
বহে কেতু চ্ছিনামৃত বেঁচে আছে প্রাণে প্রাণে ॥

৫. সঙ্গীত কোষ ॥ ৩৮ পৃঃ

আগে ভালবাসা জানাইলে প্রিয় বলে,
শেষে ছলনা করিয়া আমার মন নিলে ॥
প্রথম মিলন কালে করিলে যতন,
শেষে আকুল পাথারে আমায় ভাসাইলে।

৬. সঙ্গীত কোষ ॥ ১১৬ পৃঃ

আজি ধনি কেন, কেন অধোবদনে ?
কথায় কথায় অভিমান, প্রাণে বাঁচিনে ॥
কি দোষে করেছ মান, বসনে ঢেকে বয়ান,
নিরাসনে বসে আদরিনী প্রায় !
মান ত্যজ ! ও সুন্দরি !
আমি তোমার করে ধরি,
তোমা বিনে অন্য নারী, না হেরি নয়নে ॥

৭. প্রীতিগীতি। ১২২ ** রচয়িতা অজ্ঞাতনামা। বাঙ্গালীর গান। ৯৬ পৃঃ গীতাবলী। ১৪৭ পৃঃ সঙ্গীতসার সংগ্রহ—৮৬৮ পৃঃ। সঙ্গীত মুক্তাবলী—দ্বিতীয় ভাগ—৪২ পৃঃ ॥

আগে তারে দিও না রে মন।
পরে জানিবে পর যে কেমন ॥
সখি ! সে নহে আপন ॥

সে শঠের শিরোমণি, আমি তারে ভাল জানি,
শঠের পিরীতি, যেমন জলের লিখন ॥

৭. প্রেম গাথা ও আদিরস সঙ্গীত। ১৩ পৃঃ। সুর—কাফি সিন্ধু।
আড়াঠেকা ॥

আজি প্রেম অভিমন্যে সপ্তরথী ঘিরেছে।
এ প্রেমে ভরসা নাই হে, আশা কর মিছে ॥
কর্ণ, কুল, কৃপা, শীল ;
ভয়, দ্রোণ, লজ্জা, শৈল।
ধর্ম্ম, অশ্বত্থামা বীর, মনোরথে চড়েছে ॥
ক্ষমা, দুঃশাসন রথী, শান্তি, দুর্যোধন ভূপতি,
জয়দ্রথ রথীপতি, ব্যূহ দ্বারে রয়েছে ॥

৮. প্রীতি গীতি। ৫২৫ পৃঃ। * রচয়িতা অজ্ঞাতনামা। সঙ্গীত
কোষ। ১৫৫ পৃঃ ॥

আমারি মনের দুঃখ চিরদিন মনে রহিল ॥
ফুকারে কাঁদিতে নারি, বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল ॥
একবার ভাবি সখি, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
প্রবোধ না মানে আঁখি, সদা করে ছল ছল ॥

৯. সঙ্গীতরাগ কল্পদ্রুম। তৃতীয় খণ্ড। প্রথম সংস্করণ। ১২৫২ সাল। ২৩৬ পৃষ্ঠার পরে, ৩-৪ পৃ.। তদেব। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৯৬-৯৭, পৃ.। গীতাবলী, ৪৪-৪৫ পৃ.। সঙ্গীতরাগ কল্পদ্রুম, প্রথম সংস্করণের পাঠ।

আঙ্গুর গাছের কিছু করি বিবরণ।
মাচা বিনে তরুবর বাড়েনা কখন ॥
ফুল ফল সুমধুর কিছুই ধরে না।
অল্প দিনান্তে বৃক্ষের প্রাণও থাকে না ॥

কিন্তু এক মঞ্চ যদি পায় সে আশ্রয়।
সখা পল্লব প্রতিদিন উন্নত হয় ॥
ফুলে ফলে তারান্বিত হয় সুসজ্জিত।
হেরিলে জগজনের হয় মন্মোহিত ॥
ঐরূপ মানব তরু আশ্রয় পাইলে।
উন্নত হইতে পরে সকল সকালে ॥
বিনাশায়ে সন (শুন) কই না পারে বাড়িতে।
অবশেষে মরে জায় ভাবিতে ভাবিতে ॥

১০. গীতাবলী—১৩০ পৃ. সঙ্গীত সারসংগ্রহ, ৮৫৮ পৃঃ ; সঙ্গীত মুক্তাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, ৪১ পৃঃ প্রেমগাথা ও আদিরস সঙ্গীত, ৬৩ পৃঃ * * রচয়িতা অজ্ঞাত ; বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ১৫৪৪ (২২)।

আমার নয়ন লয়ে হেরে যদি তারে।
মমাধিক সুখী হতে অবশ্য সে পারে ॥
সবে বলে নহে ভাল,
সেই সে আমার ভাল।
সে মুখ হেরিলে দুঃখ যায় দূরে ॥

১১. শিশির স্বরলিপি। সঙ্গীত সংখ্যা—২৪। বাঙ্গালী রাগিনী। আড়াঠেকা। সঙ্গীত কোষ। ৬৯ পৃঃ * * রচয়িতা অজ্ঞাত নামা।

আদরে আদরে ভাল তো আছিলে বঁধু।
(সঙ্গীত কোষের পাঠান্তর : ভাল ত ছিলে আদরে)
যে তোমার অনুগত (সঙ্গীত কোষের পাঠান্তর =
যে তোমার করে আশা), তার দশা কি করিলে ॥
সজল জলদ তুমি, তৃষিত চাতকি (চাতক) আমি,
কোথা তুমি, কোথা আমি (আমারে বঞ্চনা করে),
কোথা বিন্দু বরিষিলে (বরষিলে)

১২. সঙ্গীত কোষ। ১২৬ পৃ. ; প্রীতি গীতি। ৪১৫-১৬ পৃঃ ; সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডার-৬১০ পৃঃ।

আমার কথা কসনে তারে দেখা হলে তার সনে।
জিজ্ঞাসিলে বলিস না হয় বেঁচে আছে প্রাণে প্রাণে ॥
যে দিয়েছে মর্মব্যথা, মরমে রয়েছে গাঁথা,
মনে হলে সে সব কথা, প্রাণ আর থাকে না প্রাণে ॥

১৩. সঙ্গীত কোষ। ৭৮ পৃঃ। প্রীতি গীতি। ৪৪৪ পৃঃ * রচয়িতা অজ্ঞাতনামা।

আমি জানিতাম যদি নিরবধি কাঁদাবে আমায়।
তবে কি রে মন প্রাণ সঁপিতাম তোমায় ?
আগে না বুঝিয়ে মনে, মজেছি তোমার সনে
এখন দুকূল গিয়াছে আমার, এবার বুঝি প্রাণ যায় ॥
ভেবেছিলাম পরেশ পাথর, কপাল গুণে হল পাথর।
এখন আমার নিশার স্বপন প্রকাশ করা দায় ॥

১৪. সঙ্গীতরাগ কল্পদ্রুম। প্রথম সংস্করণ। তৃতীয় খণ্ড। ২৩৬ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা-২। তদেব। দ্বিতীয় সংস্করণ। ২৯৬ পৃঃ। গীতাবলী—৪১ পৃ. ; সঙ্গীত কোষ—১১১৫ পৃঃ, রসগ্রন্থাবলী, ৮৯ পৃ. ; প্রভাতী। ভৈরবী। পিড়েবন্দী।

সঙ্গীতরাগ কল্পদ্রুমের প্রথম সংস্করণের পাঠ ॥

ধুয়া। উদয় হইল আসি নিদয় অরুণ। দেওরা ওরে। চিতেন।
শুখে দুখ হবে মনে ছিল না এমন ॥ দেওরা ওরে। অন্তরা।
প্রভাত হইল আসি, কুমুদি সজল আখি।
দেওরা ওরে। পরচিতেন।
মলিন কমল হৃদি প্রকাশ নলিনী ॥ দেওরা ওরে ॥

১৫. গীতাবলী-১৩০ পৃ. । বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় । পৃ. ১৫৪৪ (২৩) ; প্রীতি-গীতি-৪৪১ পৃ. * প্রেমগাথা ও আদিরস সঙ্গীত । ২৬ পৃ. * রচয়িতা অজ্ঞাতনামা ॥

এত ভালবাসরে প্রাণ, ভুলেছ কি একেবারে ?
বোঝা গেল রীতি তব বিশেষ প্রকারে ॥
এত যে বাসিতে ভাল, ভালবাসা জানা গেল,
পেতেছিলে মায়াজাল, অবলা বধিবার তরে ॥

১৬. গীতাবলী-১৫৯ পৃ. । প্রীতিগীতি । ৫০২ পৃ. ।

একবার দেখিবার সাধ কি আর নাহিরে ?
বিরহে সঁপিয়ে গেলে পুন না আইলে,
বিরহে (কি) বাঁচে কি মরে ॥

১৭. সঙ্গীত কোষ । ১৪৭ পৃষ্ঠা ।

এত হবে, তাত' জানিনে ।
না বুঝে পীরিতে মজে, এখন প্রাণে বাঁচিনে ॥
তাহারি বিহনে, জীবনে কেমনে,
সই রে ! অবলা বালা এত সবে পরাণে ॥

১৮. এই গীতটির প্রীতিগীতি-৩৭০ পৃষ্ঠায় পাঠান্তর (শেষ দুই চরণ)

তাহারি বিহনে, বাঁচিব কেমনে,
সই রে অবলা বালা কত সবে পরাণে ॥

প্রীতিগীতিতে রচয়িতার নাম দেওয়া হয় নি ।

১৯. সঙ্গীত কোষ । ২৮ পৃঃ ; প্রীতিগীতি-৬৬৪-৬৫ পৃ. । * রচয়িতা অজ্ঞাতনামা ॥

এবার মিলন হলে তারি সনে,
সই ! কখন বিচ্ছেদ আর করিব না জেনে ॥

অনুকূল হয়ে বিধি, যদি দেয় সে গুণনিধি,
মন সূতা দিয়ে বাঁধি, অতি যতনে ॥
মনে মনে মিলাইয়া, রাখিব তায় ভুলাইয়া,
অন্যস্থানে যেতে তারে নাহি দিব প্রাণ পণে ॥

২০. প্রেম গাথা ও আদিরস সঙ্গীত। ১৬ পৃ.। সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডার। পৃ. ৬০৬।

এবার প্রাণান্ত হলে রমণী হব।
পুরুষের যত দুখ, নারী হয়ে জানাব ॥
মান বসে রব, সাধিলে না কথা কব।
অপমান তার ফিরে দিব।
পায়ে ধরে সাধাব ॥

২১. সঙ্গীত কোষ। ১৬ পৃঃ। সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডার। প্রথম সংস্করণ-২৮১, পৃ.।

কি আছে তোমার মনে, তাহা জানিব কেমনে।
ভালবাসি, তাই আসি, দেখা নয়নে নয়নে ॥
আশা না পূরাতে পার, যন্ত্রণা দিও না আর,
পায়ে ধরি, ক্ষমা কর, বলে যাও মানে মানে ॥

২২. সঙ্গীত কোষ। ৮০ পৃ.। প্রীতি গীতি। ৫১, পৃ. * রচয়িতা অজ্ঞাত নামা।

কি কুক্ষণে তারি সনে হল প্রেম আলাপন।
প্রেম গেছে, সে ভুলেছে, ভুলে না ত পোড়া মন ॥
ঘুমায়ে দেখি স্বপন, যেন সেই চন্দ্রাননে,
আসি সহাস্য বদনে, বলে, উঠ প্রাণধন ॥

২৩. সঙ্গীত কোষ। ১১৪ পৃ.। প্রীতিগীতি। ৪৪০ পৃ. *। রচয়িতা অজ্ঞাত নামা ॥

কেন মন সঁপেছিলাম নিদয় জনে।
সে যে নিদারুণ অতি, তা ত জানিনে ॥

আগে ভেবেছিলাম সার, সে আমার, আমি তার।
এখন সে বল কার, বাঁচিনে মিলন বিনে॥

২৪. সঙ্গীত কোষ-১০৭ পৃ. । সঙ্গীত মুক্তাবলী। দ্বিতীয় ভাগ। ৪৩ পৃ.। সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডার। ১৯৭ পৃ.।

কেন প্রাণ হারাবি ভেবে।
হস নে রে ব্যাকুল, যাবে তোর দুকূল, প্রেমনদী অকূল,
মরবি ডুবে॥
প্রেমনদী অতি তরঙ্গ তুফান,
আগে যেতে যায় কুল শীল মান।
অপমানকে ধরে, সাঁতার দিলে পর,
কলঙ্ক সাগরে ডুবতে হবে॥

২৫. সঙ্গীত কোষ-১১৬ পৃঃ প্রীতি গীতি-৬৪১-৪২ পৃ. *
রচয়িতা অজ্ঞাত নামা।

জুরাইব বলে যারে হেরিতে হয় বাসনা।
হেরিলে হয় মানের উদয়, দ্বিগুণ বাড়ে যাতনা॥
অদর্শনে ভাবি যাকে,
মনে করি বকব তাকে,
দৃষ্টি হলে চখে চখে, তখন সে ভাব থাকে না॥

২৬. গীতাবলী-১০৯ পৃ. । বিশ্ব সঙ্গীত-৪৪৭ পৃ.। বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়। ১৫৪৩ (১৮) পৃ. ; বঙ্গালীর গান—৮৩ পৃ. ; সঙ্গীত সার সংগ্রহ—৮৫১ পৃ. ; প্রেমগাথা ও আদিরস সঙ্গীত। ৩২ পৃ. * রচয়িতা অজ্ঞাত নামা। সঙ্গীত চন্দ্রিকা। দ্বিতীয় খণ্ড। ৫৬১ পৃ.। রস গ্রন্থাবলী-৯৪ পৃ.।

তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ ! এ মহীমণ্ডলে।
আকাশর পূর্ণ শশী, সেও কাঁদে কলঙ্কচ্ছলে॥
সৌরভে গৌরবে, কে তব তুলনা হবে
আপনি আপন সম্ভবে, যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে॥

২৭. গীতটির পাঠান্তর প্রীতিগীতি ১২৭ পৃঃ সঙ্গীতকোষ ৯৩ পৃষ্ঠা, এবং সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডার ৬০ পৃষ্ঠা

তোমার তুলনা তুমিই প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।
গগনে শারদ শশী জিনেছ কলঙ্ক ছলে॥
সৌরভে আর গৌরবে, কে তব তুলনা হবে, (সদৃশ হবে)
[অন্যেরে] অন্যের কি সম্ভব, যেমন গঙ্গাপূজা (পূজে) গঙ্গাজলে॥

২৮. গীতাবলী-১৭২ পৃ.। বঙ্গসাহিত্য পরিচয়-১৫৪৬ পৃ.। প্রীতিগীতি-৩৭৬ পৃ. বাঙ্গালীর গান-৯৯ পৃ.। সঙ্গীত সার সংগ্রহ-৮৮৩ পৃ.। সঙ্গীতকোষ-১১২০ পৃ.। সঙ্গীত মুক্তাবলী-দ্বিতীয় খণ্ড-২ পৃ.।

তবে প্রেমে কি সুখ হত।
আমি যাবে ভালবাসি, সে যদি ভালবাসিত॥
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টকহীনে
ফুল ফুটিতে চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত॥
প্রেম সাগরের জল, তবে হইত শীতল,
বিচ্ছেদ বাড়বানল, তাহে যদি না থাকিত॥

২৯. গীতাবলী-১৪৩ পৃ. সঙ্গীত সার সংগ্রহ, ৮৬৭পৃ. সঙ্গীত মুক্তাবলী, দ্বিতীয় ভাগ ৪৪ পৃ. , প্রীতি গীতি-৬৪৫ পৃ. * প্রেম গাথা ও আদিবস সঙ্গীত-৩৩ পৃ. * * রচয়িতা অজ্ঞাত নামা।

তাই কি মনে করে, মানভরে অভিমানে আছ।
জ্বালিয়ে বিবহানল দহন হতেছ ?
পীরিতে যতেক হয়, সকলি কি মনে বয়,
তা হলে কি বিচ্ছেদ হয়, কার মুখে শুনেছ ?

৩০. সঙ্গীত কোষ-২৪ পৃ.। সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডার, ২৫০ পৃ। প্রীতিগীতি ২৬৬ পৃ.। * রচয়িতা অজ্ঞাত নামা।

তুমি যদি ভালবাস প্রাণ আমায় মনেতে।
তবে কি বিচ্ছেদ হয় এ প্রাণ থাকিতে॥

প্রতিবাদী হলে পরে, কি করিতে পারে পরে ?
ভানু থাকে লক্ষান্তরে, কমলিনী জলেতে ॥

৩১. সঙ্গীত কোষ। ১৪৮ পৃ.। প্রেম গাথা ও আদিরস সঙ্গীত। ২৬ পৃ. * রচয়িতা অজ্ঞাত নামা ॥

তারে এনে দে ওরে।
যারে না হেরিলে, পলকে প্রলয়,
ভাসি নয়নাগারে। (?)
একে একে দিন যায়, তবু সে না আসে হায় !
কে বুঝি ধ'রেছে তায় বধিতে আমারে ॥
করেছি কি অপরাধ, কে হেন সাধিল বাদ,
পাতিয়ে মন্ত্রের ফাঁদ, কাঁদালে আমায় ॥
জীবন আকুল হল, নয়নে ঝরিছে জল,
হতেছে মন চঞ্চল, কব বা কাহারে ॥

৩২. গীতাবলী-১৩২ পৃ.। সঙ্গীত সার সংগ্রহ, ৮৬১ পৃ.। ব'ঙ্গালীর গান-৯০ পৃ। প্রীতিগীতি-৯০ পৃ. *। সঙ্গীতকোষ। ৪৮ পৃ. * * রচয়িতা অজ্ঞাত নামা ॥

তবে তার কে করে যতন ?
বশীভূত হত যদি—আপনারি মন ॥
প্রথম মিলন কালে, হাতে চন্দ্র এনে দিলে,
প্রেম ফাঁসি গলে দিয়ে পলায় সে জন।

৩৩. প্রীতিগীতি-১১০ পৃঃ। * রচয়িতা অজ্ঞাত। সঙ্গীত রত্নভাণ্ডার। ২৬১ পৃ.; সঙ্গীত কোষ ১২৫ পৃ.।

দাসী বলে অভাগীরে আজও কি তার মনে আছে ?
তাহার যে আশাধীনী আশা নীরে ভাসিতেছে ?
বাসে, বা না বাসে ভাল, সে ভাল থাকিলে ভাল,
দেখা হলে সুধাস লো সই, সে ত আমার ভাল আছে ॥

৩৪. প্রীতি গীতি-১১১ পৃ. * রচয়িতা অজ্ঞাতনামা। সঙ্গীতকোষ ৪১ পৃ. সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডার-২০৩ পৃ. ২২৩ পৃ ; এবং ৩০৪ পৃ. প্রদত্ত পাঠান্তর।

দুঃখ হলো বলে কি প্রেম ত্যজিব।
দুঃখে সুখ বোধ করে সদা তারে তুষিব॥
না থাকে তাহার মন, না করিব আলাপন,
(তবু সে বিধুবদন, বিরলেতে হেরিব॥)

৩৫. সঙ্গীতরত্ন ভাণ্ডার-৩০৪ পৃ. প্রদত্ত পাঠান্তর। (রচয়িতা-প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়)।

তৃতীয় চরণ থেকে : সে যদি না ভালবাসে, নানামতে উপহাসে,
তবু তার প্রেম পাশে বদ্ধ হয়ে রহিব॥
বিরহ অনলে যদি, শুকায় বাসনা নদী,
তবু তারে নিরবধি ভালবাসিব॥
সে যদি না দেয় মন, নাহি করে আলাপন,
তবু সে বিধুবদন, হৃদয়েতে হেরিব॥

৩৬. সঙ্গীত কোষ-১২৭ পৃ.।

নয়নে লাগিল যারে।
বিধি কি সদয় হয়ে মিলাবে তারে?
সে জন বিনা প্রেমদান, নহে কখনো বিধান,
যে করে সই আমার প্রাণ, জানাব কারে॥

৩৭. সঙ্গীত কোষ। ১৫৫ পৃ.। সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডার। ২০৫ পৃ.। প্রেম গাথা ও আদিরস সঙ্গীত। *৩২ পৃ.। * প্রীতি গীতি-১৩৫ পৃ. * রচয়িতা অজ্ঞাত নামা॥

না হলে রসিকে, বয়োধিকে, প্রেম জানে না।
যেমন ভুজঙ্গ শিশু মন্ত্রৌষধি মানে না।
নবীনেরি অহঙ্কার, প্রবীনেরি প্রেমাধার।
এ রস রসিকে বিনে অরসিকে সম্ভবে না॥

৩৮. বাঙ্গালীর গান-৯০ পৃ.। গীতাবলী-১৩১ পৃ.। সঙ্গীত কোষ-৫৬ পৃ.। সঙ্গীত সার সংগ্রহ—৮৬০ পৃ.।

প্রাণ ! তুমি প্রেমসিন্ধু হয়ে বিন্দুদানে কৃপণ হলে ?
প্রেম পিপাসিত জনে, উপায় কি, দেহ বলে ॥
মহতের এই গুণ, আশ্রিতে নয় নিদারুণ,
আমি হে আশ্রিত জন, আমারে কেন বঞ্চিলে ॥

৩৯. সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম। তৃতীয় খণ্ড। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ, যথাক্রমে ২৩৬ পৃষ্ঠার পর ৩ পৃ. এবং ২৯৬ পৃ.। গীতাবলী। ৪২-৭৩, পৃ.

সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুমের প্রথম সংস্করণের পাঠ

ভবানি বিসয়। ইমন। তাল পিড়েবন্দি। প্রণত জন পালীনী প্রণবাদি প্রসবিনী পরতি পরা পতিতো পাবনি মা। চিতেন। ত্রিলোক তারিণী তারা কলুষ ত্রিমির হরা, ব্রহ্মমই মুক্তি প্রদাইনী মা ॥

৪০. গীতাবলী-১৩০ পৃ. প্রীতিগীতি ২১ * রচযিতা অজ্ঞাতনামা। সঙ্গীত সার সংগ্রহ ৮১৭ পৃ. সঙ্গীত মুক্তাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড। ১০১ পৃ.। প্রেম গাথা ও আদিরস সঙ্গীত। ৩৪ পৃ.। * রচয়িতা অজ্ঞাতনামা ॥ বাঙ্গালীর গান-৮৮ পৃ. ॥

পূজিব পিরীতি প্রেম প্রতিমা করে নির্মাণ।
অলঙ্কার দিব তাহে যত আছে অপমান।
যৌবন সাজায়ে ডালি, কলঙ্ক পূরি অঞ্জলি।
বিচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব এ প্রাণ ॥

৪১. সঙ্গীত কোষ। ৯০ পৃ.।

পোহালে সুখ যামিনী দিনকর উঠিল।
সোহাগিনী নলিনী নিজবাসে ফুটিল ॥
নিশানাথ জ্যোতি হীন, কুমুদিনী অতি দীন,
নানাজাতি ফুলকুল কাননেতে শোভিল ॥

কোকিল পঞ্চম স্বরে, ডাকে কুহুরব করে,
হেরি দিনমণি জগজন মজিল ॥

৪২. প্রীতিগীতি। ৩৯ পৃ. * রচয়িতা অজ্ঞাতনামা। সঙ্গীত কোষ-৪৬ পৃ.

প্রেমসিন্ধুনীরে বহে নানা তরঙ্গ।
রসিকে পার হতে পারে, আরসিকে আতঙ্ক ॥
চাতুর্য তরী তায়, আর মান ভুজঙ্গ।
প্রবল বিচ্ছেদ বায়, কখন ঘটায় কি রঙ্গ ॥

৪৩. সঙ্গীত কোষ। ৮০ পৃ.। সঙ্গীত মুক্তাবলী। দ্বিতীয় ভাগ। ৪১ পৃ.। প্রীতি গীতি। ৬৪৩ পৃ. * রচয়িতা অজ্ঞাতনামা।

বদন সরোজ আবরি (কেন ঢাকয়ে) (কেন ঢাকিয়ে) বসনে।
কি কারণে ম্রিয়মান আছ অধোবদনে ॥
সশৈবাল নলিনীর যেমন (যেবা) শোভা জীবনে।
তেমতি সুন্দরী আমি হেরিতেছি নয়নে ॥

৪৪. সঙ্গীত কোষ-৮ পৃ.। সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডার-২৮২ পৃ.।

বসন্ত নিতান্ত সখি সুখকর সে জনে।
যে যুবতী পতি সহ আছে সুখ মিলনে ॥
পতি যার পর বাসে, কে তাহারে ভাল বাসে !
সদা নেত্রনীরে ভাসে মদনেরি তাড়নে ॥
প্রফুল্ল কুসুমচয়, জ্ঞান হয় বিষময়,
বিরহিনী কত সয়, প্রাণ পতি বিহনে ॥

৪৫. প্রীতিগীতি-৫৮০ পৃ.

বহুদিন পরে আঁখি আমার সে ধন হেরিল।
পিপাসী চাতক যেন বারি পান করিল ॥
প্রেয়সী বদন শশী, তাহে পূর্ণ সুধারাশি,
বিচ্ছেদ তিমির রাশি, হেরি লাজে লুকাইল ॥

৪৬. প্রীতিগীতি ৩৬৬-৬৭ পৃ. ; প্রেম গাথা ও আদিরস সঙ্গীত * রচয়িতা অজ্ঞাত ; সঙ্গীত সার সংগ্রহ-৮৬৭ পৃ.। সঙ্গীত কোষ-১৭৪ পৃ.। সঙ্গীত মুক্তাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড-২৩ পৃ.। সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডার। ২০৪ পৃ.।

বিধি দিলে যদি বিরহ যাতনা।
প্রেম গেল, কেন প্রাণ গেল না॥
হইয়ে বহিয়ে গেছে, প্রেম ফুরাইছে,
রহিলে কেবল প্রেমের নিশানা॥

৪৭. প্রীতিগীতি। ৬৫৭ পৃ.।

ভুলে যদি করি ক্রোধ, করিতে হয় অনুরোধ,
হইয়ে কাতর আর হয় হে সাধিতে।
খেদ উপজিলে মনে, হেরিব না হে নয়নে,
দেখিলে নয়ন ভাসয়ে সুখেতে॥

৪৮. সঙ্গীত কোষ। ৬৫ পৃ.। সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডার-২২৫ পৃ.।

ভাল ভালবাসা জানালে।
হাসি হাসি প্রেম ফাঁসি নাশিবারে পরালে॥
পরেতে বিরহাগুণ, রেখেছ হতে দাহন,
কটুবাক্য তৃণ সম, দিতেছ নির্বাণ কালে॥

৪৯. সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম। তৃতীয় খণ্ড। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ। যথাক্রমে, ২৩৬ পৃষ্ঠার পরে ৩ পৃ. এবং ২৯৬ পৃ.। গীতাবলী। ৪২ পৃ.।

সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুমের প্রথম সংস্করণের পাঠ॥

ইমন তাল পিড়ে বন্দি॥

ভুবন মাছনী মায়ে ভবনিসী ভবজায়ে,
ভবভয়ে অভয়দাইনী। মা। ধুয়া।

(পাঠান্তর) ভুবন মোহিনী মায়ে,
ভবনাশী ভবজায়ে, (গীতাবলী ৪২ পৃঃ)

৫০. সঙ্গীত মুক্তাবলী। দ্বিতীয়ভাগ। ৪৩ পৃ. সঙ্গীত কোষ, ১৬৯ পৃ.

মরি হায়, প্রাণ যায়, তার বিরহ বাণে।
সে আমার, আমি তার, জানিতাম মনে॥
সদা অন্তর অন্তরে, যতনে রেখেছি যারে,
কে জানে, বিচ্ছেদ হবে, তাহারি সনে॥

৫১. শিশির স্বরলিপি। সঙ্গীত সংখ্যা-১৪৩।

মরি, যে যাতনা অযতনে, মনে মনে মন জানে।
পাছে শত্রু হাঁসে লোকে, লাজে প্রকাশ করিনে॥
প্রথম মিলনাবধি, যেন কত অপরাধি,
নিরবধি সাধি প্রাণ পণে।
তবু তো সে নাহি তোষে, আর দোষে অকারণে॥

৫২. সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডার-২৬২ পৃ.। সঙ্গীত কোষ-১০১ পৃ. * প্রীতি গীতি-২৬২ পৃ. * * রচয়িতা অজ্ঞাত নামা।

মনে মনে তোমায় যে ভালবাসি।
লোক লাজ ভয়ে নাহি প্রকাশি॥
হলে অদর্শন,
হু হু করে মন,
পলকে প্রলয় জ্ঞান হয় লো রূপসী॥

৫৩. বাঙ্গালীর গান-৬৯ পৃ.।

মান অপমান জ্ঞান নাহি করি কদাচন।
করিলে দেখনা, আপন যাতনা, তবে কি পারি বাঁচিতে?
সুখদুখ সমভাব, না করিয়ে কি করিব।
হইয়ে অধীন, করিল অধীন নিধি উভয় মনেতে॥

(এই গীতটি, যে আমার মনোবাসি (মনোবাসী)। মন মোর তার হাতেতে' ভনিতা যুক্ত গীতের শেষাংশ। মূলের ৭৬ সংখ্যক গীত দ্রষ্টব্য॥)

৫৪. বাঙ্গালীর গান-১০২ পৃ.। গীতাবলী-১৭৭। সঙ্গীত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড। ৮৭৮ পৃ. সঙ্গীত কোষ-৪৭ পৃ.। প্রেম গাথা ও আদিরস সঙ্গীত। ৩৩ পৃ. * প্রীতি গীতি-৯০ পৃ. * * রচয়িতা অজ্ঞাত নামা॥

মন অভিলাষ যদি মনেতে নিবারিত,
অন্য পরের উপাসনা তবে কে করিত॥
করিতে পরের ধ্যান ওষ্ঠাগত হয় প্রাণ,
ঘরে পরে অপমান, সে সব যন্ত্রণা যেত॥

সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম। তৃতীয় খণ্ড। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ, যথাক্রমে ২৩৬ পৃষ্ঠার পর ৩ পৃ. এবং ২৯৬ পৃ.। গীতাবলী-৪৬ পৃ.।

৫৫. সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুমের প্রথম সংস্করণের পাঠ॥ ইমন। পিড়েবন্দি'

জোগেন্দু বন্দিনী জয়াঃ জ্ঞানরূপা মহামায়াঃ মানস তিমির
বিনাসিনীঃ। চিতান।
অনাদি আনন্দময়ীঃ ত্বমেকা ত্রিগুণাশ্রয়ীঃ সদানন্দ সুখ
প্রদায়িনি মা॥ অন্তরা॥

সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুমের দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ।

জোগেন্দু বন্দিনী জয়াঃ জ্ঞানরূপা মহামায়া,
(বিঘ্নরূপা মহামায়া—গীতাবলী, ৪২)
মানস তিমির বিনাশিনী।
আনাদি আনন্দময়ী, ত্বমেকা ত্রিগুণাশ্রয়ী,
সদানন্দা সুখ প্রদায়িনী মা॥

৫৬. শিশির স্বরলিপি—সঙ্গীত সংখ্যা ৮০॥ সঙ্গীত কোষ-১৩৮, রচয়িতা অজ্ঞাত নামা। ঝিঁঝিট। আড়াঠেকা॥

যখন প্রাণ ছিলে প্রাণে, কত মসলা দিতেম পানে।
এখন কাছে গেলে পরে, সদা কর পানে পানে॥
আর কি আমার সে দিন আছে, চূণের ভাড় শুখায়ে গেছে,
তালপুকুরের নাম রয়েছে, তীর উবু জল নাই মাঝ খানে॥

খয়ের কোরে কেয়া ফুলে, কাঁদি বসে ফুলে ফুলে,
ক্রমে অঙ্গ গেল ফুলে, মলেম বুঝি এতদিনে ॥
সুমনে সুপারি দিয়ে, সুখের তরণি ভাসাইয়ে,
প্রেমের বাদাম উড়াইয়ে, ডুবি বিচ্ছেদ তুফানে ॥
যতনে দিয়ে যোয়ান ধোনে, পেয়েছিলাম তোমা ধনে,
এখন এ নব যৌবনে, হান্‌চে মদন পঞ্চবাণে ॥
সেদিনে দিলাম দাল চিনি, সে হতে প্রাণ তোমায় চিনি,
এখন আমি বালি, তুমি চিনি, চেনা চিনি নাই দুজনে ॥
ছোট এলাচ লয়ে সুখে, দিতাম যাদু তোমার মুখে,
এখন দেখ না ত চেয়ে, ফিরে অধিনীর পানে ॥
শিশিভরা কর্পূর ছিল, কপাল ক্রমে উবে গেল,
লবন বিবর্ণ হল, গন্ধ হয়েছে জাফবাণে ॥
যখন আমার ছিল বাহার, দিয়ে থাকতাম কত বাহার,
গুণ গুণ করে গেয়ে বাহার, উড়ে ব'সতে মধুপানে ॥

৫৭. সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডার। ১৮৮ পৃ.।

যে জানে, সে জানে প্রেম উদ্ভব কেমনে
হয় মনে রহে মনে, পরে যায় মনে মনে ॥
নয়ন আদি কারণ, উৎপত্তি সংঘটন,
স্থিত হইয়ে মিলন, পরে লীন অযতনে ॥

৫৮. প্রেম গাথা ও আদিরস সঙ্গীত। ১৪৬ পৃ.। সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান)

যেও যেও প্রাণনাথ! প্রেম নিমন্ত্রণ।
নয়ন জলে স্নান করাব, কেশে মুছাব চরণ ॥
হৃদি মাঝে বসাইব, অধর সুধা পান করাব,
শেষেতে দক্ষিণা দিব, আমার এ নব যৌবন ॥

৫৯. শিশির স্বরলিপি। সঙ্গীত সংখ্যা-৪২৭

লুকিয়ে লুকিয়ে পোড়া পীরিত রাখব কত আর
পীরিত হলে প্রকাশ হতে বাকি থাকে কার॥
উভয়ের লুকচুরি, সাধ না মিটাতে পারি,
আতঙ্কতে প্রাণে মরি, প্রাণ বাঁচান হল ভার॥

৬০. সঙ্গীত কোষ-৩৯ পৃ.। সঙ্গীতসার সংগ্রহ-৮৬০ পৃ.। বাঙ্গালীর গান-৯০ পৃ.। সঙ্গীতরত্ন ভাণ্ডার। ১৯৭ পৃ.। প্রীতিগীতি-১২৭ পৃ. * রচয়িতা অজ্ঞাত নামা॥

সে কি আমার অযতনের ধন।
মন প্রাণ সুশীতল করে যেই জন॥
তবে যে অপ্রিয় বলি, যখন জ্বালাতে জ্বলি,
নতুবা তার সকলি, প্রেমের কারণ।

৬১. সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডার। পৃ.-৩১৯।

সুচারু হাসিনী।
অধরে অমৃত ধর, দিবা যামিনী॥
পল্লব মৃণালদল, নেত্রনীল উৎপল,
করতল শতদল চরণ তব নলিনী॥
হেন মুখে মাখা হাসি,
আমি বড় ভালবাসি,
হৃদয়ে রাখিব সদা মনোমোহিনী॥

৬২. সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডার। পৃ. ৬১০।

সদা প্রাণে কালী কে দিলে।
সত্য যদি থাকেন কালী,
সে যেন হয় এমনি কালী,
আমি যেমন সদা জ্বলি,
সে যেন সই এমনি জ্বলে॥

৬৩. সঙ্গীত সার সংগ্রহ। ৮৫৭ পৃ.।

প্রাণ! তুমি কার হবে, আমি যদি মুদি আঁখি।
অন্য জনার মন পেয়ে আমারে দিও না ফাঁকি॥
শুন, প্রাণ তোমারে কই, আমি বুঝি কেউ নই,
যদি দেশান্তরে রই, হৃদ কমলে তোমায় দেখি॥

সংক্ষিপ্ত সঙ্গীত গ্রন্থ-তালিকা—

অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়। গীতরত্নমালা। ১ম খণ্ড। ১৩০৩।

অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। প্রীতিগীতি। ১৩০৫।

অমরেন্দ্রনাথ রায়। শাক্ত পদাবলী। কলিঃ বিঃ। ১৯৬১।

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। গীতলহরী। ১৯০৪।

অমৃতলাল বসু। বীণার ঝঙ্কার। ২য় সং। ১৩২০।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীতকোষ। ২য় সং। ১৩০৬।

কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগর। সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম। ৩য় খণ্ড। ১২৫২, ১৯১৬।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। গীতসূত্রসার। ২য় খণ্ড। ৩য় সং। ১৯৩৪

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। সঙ্গীতসার। ২য় সং। ১২৮৬

গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়। গীতহার। ১৮৭৪

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। মনোমোহন গীতাবলী। ১৮৮৭

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতচন্দ্রিকা। ২য় খণ্ড। ১৩১৬

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। রসভাণ্ডার। বসুমতী। ১৩০৬

রসগ্রন্থাবলী। বসুমতী।

জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক। সঙ্গীতরসমাধুরী। ১২৫১

দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। বাঙ্গালীর গান। বঙ্গবাসী। ১৯০৫

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী। ২য় খণ্ড। ১৮৮৬

নবীনচন্দ্র দত্ত। গীতসার সংগ্রহ। ১২৮৩

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতদর্শিকা। ২য় খণ্ড। ২য় সং। ১৩৭৪

প্রিয়ব্রত চৌধুরী। রবীন্দ্রসঙ্গীত। ১৯৭০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান। বিশ্বভারতী। ১৩৫৭

রাজ্যেশ্বর মিত্র। বাংলার গীতকার। ১৩৬৩

রাধামোহন সেনদাস। সঙ্গীততরঙ্গ। ৩য় সং। বঙ্গবাসী। ১৩১০

রামনিধি গুপ্ত। গীতরত্ন। ১ম, ১২৪৪ ; ২য়, ১২৬৩ ; ৩য় ১২৭৫ সংস্করণ।

যদুনাথ ঘোষ। সঙ্গীত মনোরঞ্জন। ১২৬৮

বৈষ্ণবচরণ বসাক। গীতাবলী। ২য় সং। ১৩০৩। বিশ্বসঙ্গীত। ১৩শ সং।

মুন্সী এরাদাৎ। কুরঙ্গভানু। ১২৬৪।

হরিপদ চক্রবর্তী। দাশরথি রায়ের পাঁচালী। কলিঃ বিঃ। ১৯৬২

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীতসার সংগ্রহ। ২য় খণ্ড। ১৩০৬

গোপাল উড়ের টপ্পা। বঙ্গবাসী। ১৩১৭

হরিশ্চন্দ্র দত্ত। সঙ্গীত তানসেন। ১২৯৯

প্রেমহার। ১৮৮৬

প্রেমসঙ্গীত। ১২৯৪

প্রেমগাথা ও আদিরস সঙ্গীত। (তারিখ নেই)

মজলিসি সঙ্গীত। (তারিখ নেই)

শিশির স্বরলিপি। ১৩৩৩।

সঙ্গীত রত্নভাণ্ডার। শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী। (তারিখ নেই)

সংখ্যানুক্রমিক গীতসূচি

সংকলয়িতার নিবেদন

রচনাটির একটু ভূমিকা আবশ্যক।

১৯৩৬ সালে একটি বাঙালী যুবক লন্ডনে ব্যারিস্টরি পড়িতে যায়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে গাওয়ার স্ট্রীটের ভারতীয় আবাসটি জার্মান বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হইলে আত্মীয়বর্গের নির্বন্ধাতিশয্যে যুবকটি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের আলোচনার প্রাক্কালে বিলাতের একটি প্রাদেশিক পত্রিকা তাহাকে তাঁহাদের নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে পাঠান। লন্ডনে অবস্থানকালে ঐ পত্রিকায় সে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখিত।

দিল্লীতে যাইয়া যুবকটি তাহার এক বান্ধবীকে কতকগুলি পত্র লেখে। বর্তমান রচনাটি সেই পত্রগুলি হইতে সংকলিত। পত্রলেখক ও পত্রাধিকারিণীর একমাত্র একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রসঙ্গ ব্যতীত পত্রগুলির আর কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই, যদিও পত্রে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীদের যথার্থ পরিচয় গোপনের উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে নাম-ধামের পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়াছে।

এই স্বল্পপরিসর পত্ররচনার মধ্যে লেখকের যে সাহিত্যিক প্রতিভার আভাস আছে, হয়তো উত্তরকালে বিস্তৃততর সাহিত্যচর্চার মধ্যে একদা তাহা যথার্থ পরিণতি লাভ করিতে পারিত। গভীর পরিতাপের বিষয়, কিছুকাল পূর্বে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার অকালমৃত্যু সেই সম্ভাবনার উপরে নিশ্চিত যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।